বৈরী বসতি

শফীউদ্দীন সরদার

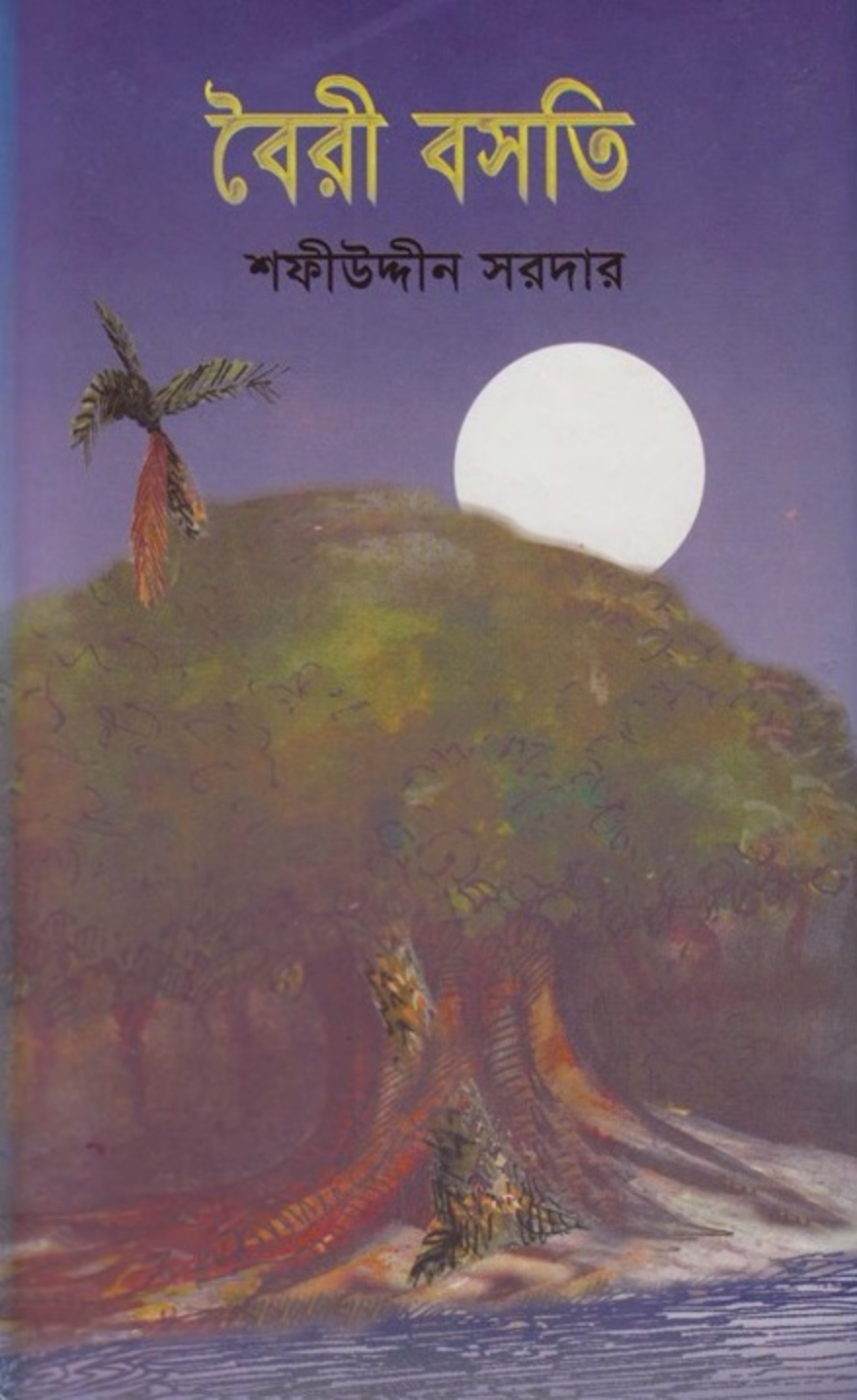

বৈরী বসতি

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৪৬

১ম সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪১৯
আষাঢ় ১৪০৫
জুলাই ১৯৯৮

বিনিময় ঃ ৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BAIRI BASATI by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 85.00 Only.

www.pathagar.com

দু'টি কথা

"বৈরী বসতি" আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের বার নম্বর উপন্যাস। একে সিরিজ বলা হলেও, আমার এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর কোনটাই কোনটার অবশিষ্ট অংশ নয়। প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ কম্‌প্লীট উপন্যাস। ঐতিহাসিক কাল অনুসারে বাংলার মুসলিম ইতিহাসের একটার পর একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে এক একটি উপন্যাস রচনা করা হয়েছে বলেই একে সিরিজ বলা যায়। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দ্বারা বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অদ্যতক্ বাংলার মুসলমান শাসন ও সমাজ কি পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছে, এর সুদিন-দুর্দিন ইতিহাস-ঐতিহ্য এই উপন্যাসগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। উপন্যাসগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনা বা সময়	প্রকাশক
১.	বখতিয়ারের তলোয়ার	বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়	মদীনা পাবলিকেশন্স
২.	গৌড় থেকে সোনার গাঁ	বাংলায় স্বাধীন সাল্‌তানত্ প্রতিষ্ঠা	আধুনিক প্রকাশনী
৩.	যায় বেলা অবেলায়	গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকাল	মদীনা পাবলিকেশন্স
৪.	বিদ্রোহী জাতক	রাজা গণেশের রাজত্বকাল	বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৫.	বার পাইকার দুর্গ	সুলতান বারবাক শাহ ও দরবেশ ইসমাইল গাজী	আধুনিক প্রকাশনী
৬.	রাজ বিহঙ্গ	আলাউদ্দীন হোসেন শাহর রাজত্বকাল	আধুনিক প্রকাশনী
৭.	শেষ প্রহরী	দাউদ খাঁন কাররানী ও কালাপাহাড়	মল্লিক ব্রাদার্স (কলিকাতা) (মদীনা পাবঃ ঢাকা)
৮.	প্রেম ও পূর্ণিমা	সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়	আধুনিক প্রকাশনী
৯.	বিপন্ন প্রহর	নবাব মুর্শিদকুলী ও সরফরাজ খান	আধুনিক প্রকাশনী
১০.	সূর্যাস্ত	পলাশীতে সূর্যাস্ত	বাংলাদেশ কো-পারেটিভ বুক সোসাইটি
১১.	পথহারা পাখী	পলাশীর পরে ফকির মজনুশাহ্	বার্ড পাবলিকেশন্স
১২.	বৈরী বসতি	সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর ইত্যাদি	আধুনিক প্রকাশনী
১৩.	অন্তরে প্রান্তরে	ফরায়েজী আন্দোলন--শরিয়তুল্লাহ দুদু মিয়া	যন্ত্রস্থ

www.pathagar.com

এই পর্যন্ত লেখা ও প্রকাশ পাওয়া শেষ হয়েছে। আর চার-পাঁচখানা উপন্যাসের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীকে কভার করার ইরাদা রাখি। সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

এ কাজে আমাকে যাঁরা উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে অধ্যাপক আবদুল গফুর, কথা শিল্পী ইউসুফ শরীফ, বন্ধুবর হাসিবুল হাসান এবং আমার এই উপন্যাস প্রকাশক জনাব আবদুল গাফ্ফার ও আধুনিক প্রকাশনীর অন্যান্য সবাইকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলেই আমার সার্থকতা।

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

১

বেজে উঠেছে বাঁশী। আবার আজও। একই সুরে, একই সময়ে, একই জায়গায়। নিশুতি রাত, নিস্তব্ধ জমিন, নির্মল আসমান। দিন বরাবর দশদিকে ঢেউ খেলছে চাঁদের আলো। থৈ থৈ জ্যোৎস্না। পূর্ণিমা সমাগত। সুবে সাদিকের আগে এ চাঁদের ঘুম নেই।

গৃহকর্ম চুকিয়ে শুয়ে পড়েছে সকলেই। ঢলে পড়েছে ঘুমের কোলে। এই ওয়াক্তে বেজে উঠেছে বাঁশী। এক বিবাগী বাঁশের বাঁশী। পর পর দু'রাত এ সময়েই বেজেছে। বেজে উঠেছে আজও। একই লয়ে ভেসে আসছে সুর। এক বিনীত আবেদন। মৃদুমন্দ সমীরণে মাখামাখি করা এক বিমোহিনী আহ্বান।

কোমল ও সুবিমল এ বিলাপ কারো বিরাগ পয়দা করছে না। তীব্রভাবে কানে বিঁধে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। এ নিয়ে তাই কারো কোন ওজর-অভিযোগ নেই। ঘুম যাদের ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে আপছে আপ। আরামে ও আলস্যে তারা চোখ মুজে পড়ে থাকছে বিছানায়। ঘুম পাড়ানী গানের মতো এ গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে আবার।

বয়স্করা তেমন একটা কান দিচ্ছেন না এদিকে। তরুণেরা কান দু'টো ক্ষণকাল খাড়া রেখে ঈষৎ ভ্রূকুটিসহ সরিয়ে নিচ্ছে মনোযোগ। পাশ ফিরে শুয়ে তারা চোখ মুজছে পুনরায়। বেরসিক বেরসিকারা কীট-পতঙ্গের তানের মতোই এ তানকে উপেক্ষা ভরে ঠেলে দিচ্ছে দূরে। তাদের কাছে এ বাঁশীর সুর স্থান করতে পারছে না।

কিন্তু রসিক ও অনুরাগী অন্তরে এ সুর সিঁদ কেটে পথ করে নিচ্ছে। হৃদয়ের নিবিড় দ্বার নীরবে ভেদ করে অন্তঃস্থলে পৌঁছছে। বিবাগী ও বিরহিণীর ঘুম কাড়ছে চোখের। তারা একান্তে কান পেতে পড়ে আছে বিছানায়।

বিবাগীও নয়, বিরহিণীও নয়, রোকসানা ফিরদৌস এক অনাঘ্রাতা তরুণী। স্থানীয় মক্তব পাস মেয়ে। সে জজ্বনামা পড়তে পারে সুর করে। পড়শীদের বাংলা চিঠি ছর ছর করে পড়ে দেয়। অবসরে আনমনে পদ্যের কলি আওড়ায়। কিছুটা কাব্যিক। বয়সে অষ্টাদশী।

এ সুরের ছোঁয়া লেগেছে তার উদ্ভিন্ন অন্তরে। বিকাশ-উন্মুখ দীলে। প্রথমে একটু একটু। এরপর নিবিড়ভাবে। কান পেতে সে অনুক্ষণ বিছানায় পড়ে রয়। যতক্ষণ বাঁশী বাজে, ঘুম আসে না চোখে তার। বড় মিষ্টি লাগে সুর। আবেশে অবশ হয় তনুমন। উষ্ণ হয় হিয়া। ঘুম আসে না বাঁশী থামার অনেকক্ষণ পরেও। শিহরিত তন্ত্রীগুলো টনটনে হয়ে থাকে। ঝিমিয়ে পড়তে চায় না। নেশা ধরে গেছে তার। এখন সে রাত লাগলেই ঐ বাঁশীর অপেক্ষা করে।

তার এ উন্মুখ অন্তরে আজও ঢেউ তুলেছে বাঁশী। সুরতো নয়, এক করুণ আবেদন। হৃদয় নিংড়ানো কোন এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা বাঁশীর সুরে ঝুরে ঝুরে পড়ছে। অন্তঃসলীলা নদীর মতো নিরন্তর এ সুর লহরী কাকে যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে।

www.pathagar.com

লাইলী-মজনু শিরি-ফরহাদের গল্প তার শোনা আছে। পড়েছেও অংশ বিশেষ। পরিশ্রান্ত আর্তির মতো এ তরঙ্গায়িত মৃদু সুর তেমনই যেন কোন্ জনকে তালাশ করছে চারদিকে। কেমন যেন চেনা চেনা এক সুর।

স্বপ্ন দেখা বয়স তার। স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে। ভাল লাগে ভাবতে। কাকে খোঁজে এ সুর? তাকেই কি? তাকেই কি তালাশ করে হয়রান হয়ে ফিরছে? নিজের কল্পনায় রোকসানা ফিরদৌস নিজে নিজেই লাল হয়ে উঠে।

গাঁয়ের নাম ইয়ারপুর। যশোর জেলার নড়াইলের বড়োসড়ো এক গাঁ। গাঁয়ের নীচেই ডহর। মানুষ-গরু চলাচলের প্রশস্ত কাঁচাপথ। এ ডহরের মাঝামাঝি স্থান থেকে আর একটা শাখা বেরিয়ে মাঠের মধ্যে গেছে। পশুপাল ও লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে কিষাণদের মাঠে যাওয়ার রাস্তা। এ শাখা ডহর বেয়ে বিঘে কয়েক সামনের দিকে এগুলেই ডহরের উপর বিশাল এক বটগাছ। বিঘে দেড়েক মাটি জুড়ে তার ব্যাপ্তি। কিষাণ-মজুর-রাখাল আর বাউরে বালকদের বালাখানা। সকাল থেকে সন্ধ্যেতক সরগরম থাকে বটতলা। কেউ বিরাম নেয়, কেউ গান গায়, কেউ বাঁশী বাজায় বসে বসে। ছেলে-পুলেরা দাগ কেটে গোল্লাছুট, বউচুরি আর হাডুডু খেলে।

সাঁঝের পর আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায় এ চাঁদের বাজার। কিষাণ-কামলা আর গোবাদি পশু মাঠ থেকে উঠে আসার পর বটতলা বিলকুল নির্জন হয়ে যায়। অধিক রাতের কথাই নেই, আঁধারটা ঘনিয়ে এলেই একা একা ঐ বটতলায় কেউ যায় না।

বটতলার খানিক দূরেই মস্তবড় এক মজাদিঘী। দিঘীর পাড়ে ঝাড় ঝাড় তালবন। এ তাল বন নিয়ে এখানে এক কিংবদন্তি আছে। ঐ তালবনে জ্বিন-পরীরা দল বেঁধে বাস করে। অনেক রাতে গাছের মাথায় আলো জ্বলতে কেউ কেউ নাকি দেখেছে। অনেক রাতে ওখানে মিহি সুরে কান্নার আওয়াজও গায়ের অনেকে শুনেছে। গরুর গা ধোয়াতে নেমে কিছুদিন আগে এক রাখাল বালকও ডুবে মরেছে ঐ দিঘীতে। কেউ কেউ বলে, ডুবে মরেনি, চুপিয়ে মেরেছে জ্বিনেরা।

তাই, ঐ তালবনে তো নয়ই, অনেক রাতে ঐ বটতলাতেও একা একা কেউ আসে না। বটতলা থেকে তালবাগান অধিক দূরে নয়। ঐ অশরীরী জীবগুলোরও হাত-পা নাকি খাটো নয়। ঠ্যাং মেলালেই এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ের মাথার উপর ঠ্যাং চলে যায় তাদের। এ বটগাছে আসা এমন কোন ব্যাপারই নয় তাদের কাছে। ওরে বাপরে বাপ!

সখ করে তাই অধিক রাতে এদিকে কেউ আসে না। যারা এসবে বিশ্বাসী নন, বিনে গরজে তারাও এদিকে আসেন না। আর না হোক, গাটা তো ছম ছম করে তাদেরও।

ঐ বাঁশীর আওয়াজ এখান থেকেই আসছে। কয়দিন ধরে অনেক রাতে এ বটতলা থেকেই ভেসে আসছে বাঁশীর সুর। গাঁয়ের সবাই শুয়ে পড়লে কে যেন বাঁশী বাজায় এ বটতলায় এসে।

কে এ লোক? মানুষ তো নিশ্চয়ই। জ্বিন-পরীরা বাঁশী বাজায়—এ বিশ্বাস কারো নেই। কিন্তু কে এ লোক, এটা দেখার গরজও তেমন কারো নেই। সবাই ভাবে, যে

www.pathagar.com

বাজায় বাজাকগে। কারো পাকা ধানে মইতো আর দিচ্ছে না। সেই সাথে ভাবে, ধন্যি লোক যা হোক। সাহস আছে।

কিন্তু বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। ক্ষতির কিছু না থাক, পুলক আর কৌতুহল তো কমবেশী সবার দীলেই আছে। বিশেষ করে, বঙ্গমাতার সন্তান বলে কথা। কাজ যাদের কম আর অবসরটা বেশী, পেটের ভাত হজম হওয়ার অবলম্বন তো জরুর একটা চাই তাদের? পর পর তিনরাত মাঠে ময়দানে বাঁশী বাজবে আর এটা তবু পেটে কারো বাজবে না, এটা কি কখনও হতে পারে? সকালেই শুরু হলো গুঞ্জরণ। হেথা হোথা কথাবার্তা, নানারকম সওয়াল জবাব আর উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা।

দক্ষিণ পাড়ার আদু শেখ প্রৌঢ় মানুষ। অবসর লোক। বেটা পুতেরা খাটে আর আদু শেখ বৈঠকখানার বাহির বারান্দায় বসে বসে হুঁকো টানে। হুঁশ জ্ঞানে কিছুটা খাটো হলেও, সে আলাপী লোক। রসের কথার সাথে মাঝে মাঝে বেশ দামী কথা বলে আর পাড়ার ছেলে বুড়ো সবার সাথেই কৌতুক আলাপ করে। এ কারণে তার বাহির আঙ্গিনায় সবসময়ই জনসমাগত হয়। অলস অবসর নবীণ প্রবীণ তো বটেই, কর্মব্যস্ত মানুষেরাও কাজের ফাঁকে এসে তার সাথে কিছুক্ষণ রস রঙ্গ করে যায়।

সেদিনও তাই এলো। সকালেই জনা দু'য়েক বৃদ্ধ আর জনা কয়েক তাগড়া তাজা নওজোয়ান এদিক ওদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে আদু শেখের বাহির আঙ্গিনায় জড়ো হলো। একে অপরের সাথে দু' চারটে খুচরো আলাপের পর নওজোয়ানদের একজন অন্যান্য নওজোয়ানদের উদ্দেশ করে বললো—ব্যাপারটা কিরে? কিছু আন্দাজ করতে পারছিস? এত রাতে ওখানে বসে, মানে এতবড় বুকের পাটা কার? পাগল ছাগল, না মতলববাজ কোন কেউ?

তরুণদের একজন পাল্টা প্রশ্ন করলো—কার কথা বলছিস? ঐ যে বাঁশী বাজায় বটতলা?

প্রথমজন বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোন চোর ডাকাতের দলের লোক নয়তো আবার? পানি নেড়ে জোঁকের খবর করছে।

ঃ মানে?

ঃ মানে, এই গাঁয়ের লোকজন কতটা সজাগ, তাই পরীক্ষা করে দেখছে!

ঃ কে? ঐ বাঁশীওয়ালা?

ঃ হ্যাঁ, বাঁশীওয়ালাই তো?

ঃ আরে দূর দূর! যার সখ সে ঘাটে মাঠে বাঁশী বাজাবে, গান গাইবে, গল্প করবে। এ নিয়ে এতো চিন্তার কি আছে!

ঃ তাই বলে এতরাতে আর ঐ রকম ভুতুড়ে জায়গায়?

ঃ আরে বাবা, এটা হলো সখের ব্যাপার। সখ চাপলে রাতদিন আর জায়গার হিসাব কে রাখে?

আগুন্তুক বৃদ্ধদের একজন প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন—উঁহুঁ উঁহুঁ, কথাটা উড়িয়ে দিও না এভাবে। জেকের আলী একেবারে ফালতু কথা বলেনি। শুধু লাঠি হাকিয়েই বেড়ায়না, গাঁয়ের ভাল মন্দের কথাটাও সে ভাবে।

www.pathagar.com

তরুণদের দ্বিতীয়জন ফের প্রশ্ন করলো—যেমন ?

বৃদ্ধটি বললেন—সাথে আরো লোক না থাকলে ঐ সময় কি এতক্ষণ ঐ বটতলায় বসে থাকা সম্ভব ?

প্রথম যুবক, অর্থাৎ জেকের আলী বললো—সেই কথাই তো বলছি। আলবত ঐ লোক একা নয় আর এ গাঁয়ের লোকও কেউ নয়। আমাদের গাঁয়ের লোক মোটামুটি সবাইকে চিনি। এতবড় সাহসী লোক কাউকে তো দেখিনে।

বৃদ্ধটি ফের বললো—প্যাঁচটা তো এখানেই। ওলোক বাইরের লোকই হবে। আর বাইরের লোক হলে, ব্যাপারটা জরুর ভেবে দেখার ব্যাপার।

তৃতীয় একজন বললো—কি রকম ?

ঃ আরে রকম আবার কি ? বিনে গরজে লোকে একখান খড় ভেঙ্গেও দুই টুকরা করে না, আর ঐ একটা বাইরের লোক বিনে উদ্দেশ্যে এসে দুপুররাতে বাঁশী বাজাচ্ছে ওখানে ? তাদের গাঁ কি বানের পানিতে ডুবে গেছে যে, বাঁশী বাজানোর জায়গা আর সে পায়নি ? কোন মতলব না থাকলে এমনটি কি হতে পারে কখনও ?

জেকের আলী বললো—ঠিক ঠিক। নির্ঘাত কোন বদমতলব তার আছেই। লোকটা কে তা যদি জানা যেতো!

আদু শেখ বসে বসে হুঁকোই চুষলো এতক্ষণ। নিভে যাওয়া হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে এবার সে প্রশ্ন করলো—কি বললে ?

জেকের আলী বললো—বলছি, লোকটা কে, এই হদিস কেউ যদি দিতে পারতো, মানে ওখানে গিয়ে এ খবরটা কেউ যদি—

কথার মাঝেই আদু শেখ ব্যঙ্গ করে বললো—হুঁঃ!

'মরদের নাম তারুর বাপ, লেংটি খুলে মারে লাফ'।

ঃ মানে ?

ঃ মানে বাঘ যে মারে মারুকগে, ওর মধ্যে কি মর্দানী! মরা বাঘের লেজে যে আগুন দিতে পারে, সেই তো হলো মরদ!

ঃ কথাটা বুঝলাম না তো ?

ঃ বুঝবে কি ? কে কেমন মরদ তাতো দেখাই যাচ্ছে। অন্যে গিয়ে হদিস করে আসবে আর তখন তোমরা বাহাদুরী দেখাবে! নিজেদের সে সাহসটা নেই।

ঃ নিজেদের মানে ? আমাদের ?

ঃ যাওনা কেন নিজেরা কেউ ? একা না পারো দল বেঁধে ?

ঃ এ্যাঁ ? হ্যাঁ, তা অবশ্য—

ঃ সারাদিন লাঠি বাগিয়ে বেড়াও আর এই খবরটা করার মুরোদ নেই ? ঐ একটা লোক একা বসে বাঁশী বাজায় ওখানে আর তোমরা দল বেঁধেও যাওয়ার সাহস পাও না ? একেই বলে, ভাই মরদ ভাবীর কাছে।

আদু শেখ কলকেয় আবার আগুন ভাঙ্গতে লাগলো। ইজ্জতে ঘা লাগলো নওজোয়ানদের। জেকের আলীই এদের মধ্যে সর্বাধিক তেজী। ডানপিটে নওজোয়ান। কিছুটা অহংকারী ও দাম্ভিক। সে ক্রোধ ভরে বললো—কি খামাখা বাজে বকছেন ?

www.pathagar.com

আদু শেখ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—অমনি বন্ধু বেজার ? হবেইতো। হক কথা সইতে পারা সহজ কথা নয়।

সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জেকের আলী বুক ফুলিয়ে বললো—ঠিক আছে। কেউ না গেলে আমিই আজ যাবো। দেখি কোন্ মরদের বেটা ওটা ?

সঙ্গীরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে বললো—আমরাও—আমরাও। ডরাই নাকি কাউকে আমরা ? যখন যাবি, আমাদের ডাক দিস।

ভারিক্কী চালে জেকের আলী বললো—তাহলে তৈরি থাকিস সবাই।

আদু শেখ এবার খোশ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো—মারহাবা মারহাবা! এইতো মরদকা বাত।

এতো গেল বেদরদী বে-দীলদের কথা। দীল-দরদীর দীলটা রাত পোহালেই বেহাল হয়ে গেল। পর পর দুইদিন সে দীলের কথা কোনমতে দীলেই চেপে রেখেছে। বাঁধ দিয়েছে অন্তরে। কিন্তু তৃতীয় রাতের পর আর তার কল্পনায় রঙ্গীন দীল বাঁধ মানতে চাইলো না। ফেঁপে উঠলো আবেগে। দীলটাও অটুট—অক্ষয় রইলো না। কল্পনাতেই খরচ হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই গলার হার বদল দেয়ার ধ্যান ধারণা না থাক, 'বাঁশী বাজায় কেরে সখী বাঁশী বাজায় কে', এই প্রশ্ন দীলে তার দুর্বার হয়ে উঠলো।

অনভিজ্ঞ অন্তরে অচেনার ঢেউ এসে পয়লা হঠাৎ লাগলে তাকে শান্ত করা কঠিন। রোকসানা ফিরদৌসও তার উদ্বেলিত অন্তরকে শান্ত করতে পারলো না। শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। শয্যা ত্যাগের পরই সে তার ভাবীর পেছনে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। বাড়ীতে কিংবা হাতের কাছে এমন কেউ নেই যার কাছে এসব কথা বলা যায় বা তোলা যায়। মোখতাছার কথাটা যে খুব একটা গোপন কথা, তা নয়। রাতের বেলা মাঠে বসে বাঁশী বাজালো কে—এ প্রশ্ন একেবারেই স্বাভাবিক এক প্রশ্ন। কিন্তু রোকসানা ফিরদৌসের মতো উঠতি বয়সের মেয়েদের পক্ষে এ প্রসঙ্গ মাথাকাটা যাওয়ার চেয়েও গুরুতর প্রসঙ্গ।

রোকসানা তাই সরাসরি কথাটা জিজ্ঞেস করতে না পেরে কেবলই তার ভাবীর চারপাশে ঘুরতে লাগলো। তা লক্ষ্য করে ভাবী রাবিয়া বেগমের মনে কৌতুহলের উদয় হলো। রাবিয়ারও বয়স কম। কয়েক বছর হলো শাদি হয়েছে তার। খানিকটা রসিকাও। সে হাসি মুখে প্রশ্ন করলো—কিলো, কিছু বলবে ?

দুনিয়ার শরম এসে চেপে ধরলো রোকসানাকে। মনের ভাব সে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করতে পারলো না। আসল কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো—কৈ, কিছু নাতো ?

ঃ কিছু নয় ? তাহলে আর খামাখা এদিকে ঘুরছো কেন ?

ঃ না, মানে এই অমনি।

ঃ অমনি ? সেরেফ অমনি অমনি এতক্ষণ ধরে ঘুরছো ?

ঃ হ্যাঁ, অমনিই তো।

www.pathagar.com

ঃ তাজ্জব!

আর প্রশ্ন না করে রাবিয়া বেগম অন্যদিকে চলে যেতে লাগলো। সুযোগটা হারিয়ে যায় দেখে রোকসানা ইতস্তত করে বললো—আচ্ছা ভাবী, তুমি মানে রাতে কিছু শুনতে পেয়েছো?

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাবিয়া বেগম সবিস্ময়ে বললো—শুনতে পেয়েছি মানে?

রোকসানা ফিরদৌস ঢোক চিপে বললো—মানে কোন শব্দ—আওয়াজ?

ঃ শব্দ আওয়াজ! কখন?

ঃ অনেক খানি রাতে। সবাই শুয়ে পড়ার পর ঐ যে বাঁশীর মতো কি জানি কি বাজলো?

ঃ বাঁশীর মতো কেন? বাঁশীই তো বাজলো?

ঃ সেই কথাই বলছি।

রাবিয়ার চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। রোকসানার মতলবটা এতক্ষণে বুঝতে পারলো সে। ঠোঁটের হাসি লুকিয়ে সে ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—সেই কথাই বলছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তা এটা বলার কথা কি হলো?

ঃ কথা মানে—তিনরাত একইভাবে বাজছে তো!

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ হয়নি কিছু। তুমি শুনেছো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।

ঃ আমি কেন? গাঁয়ের অনেক লোকই শুনেছে। তাতে কি?

ঃ কিছু নয়। আমিও শুনেছি, তাই বলছি।

ঃ তুমিও শুনেছো?

ঃ জি-হাঁ।

ঃ তিন রাত ধরেই?

ঃ হুঁউ।

ঃ আগাগোড়াই শুনেছো?

রোকসানার শরমটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। সে ফিক করে হেসে উঠে বললো — শুনেছিই তো।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে রোকসানা ফিরদৌস মুখের হাসি চাপতে লাগলো। রাবিয়া বেগম এবার চোখ ঠেরে বললো—আচ্ছা! তাহলে ঘুম আসেনি চোখে নিশ্চয়ই?

মাটির দিকে নজর রেখে রোকসানা বললো—না।

ঃ খুব ভাল লেগেছে বুঝি?

ঃ খুউব। তোমার লাগেনি?

ঃ আমি কি তোমার মতো খেয়াল করেছি অতটা? বাঁশী বাজতে শুনেছি আর তারপর ঘুমিয়ে গেছি। ভাল না মন্দ, তা খেয়ালই করিনি। খুব মিষ্টি সুর, তাই না?

www.pathagar.com

উৎসাহিত হয়ে উঠে রোকসানা বললো—মিষ্টি মানে? খুবই মিষ্টি। মনটা অবশ হয়ে যায়। ও সুর কানে পড়লে নিদঘুম আর থাকে না।

ঃ বলো কি?

ঃ খেয়াল করে শুনলে দেখতে, ঘুমটা আর তোমার চোখেও আসছে না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ তুমিও বিভোর হয়ে শুনতে।

ঃ তাই?

ঃ লোকটা কে ভাবী?

রাবিয়া বেগম এবার কপট বিস্ময়ে বলে উঠলো—এই খেয়েছে রে!

ঃ খেয়েছে মানে?

ঃ তুমি মরেছো।

ঃ মরেছি।

ঃ ডোবায় ডুবে মরেছো। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

ঃ কি যে বলো ভাবী! তোমার কথার কোন মাথা মুণ্ডু নেই।

ঃ বটে! মাথা মুণ্ডু নেই? ছিলে বাঁশীর কথায়। তা থেকে লাফ দিয়ে আবার ঐ লোকটার কথায় গেলে কেন?

ঃ কেন আবার? এত সুন্দর যে বাঁশী বাজায় সে লোকটা কে, তা জানতে ইচ্ছে হয় না?

ঃ তারপর?

ঃ লোকটা কে, কি করে, কোথায় বাড়ী—এ সব জানতে দোষ কি?

ঃ এরপর বলবে, তাকে একটু ডেকে দাও না ভাবী, লোকটাকে একটু দেখি। দেখায় দোষ কি?

ঃ সে তো ঠিকই। যার বাঁশীর সুর এত মিষ্টি, সে লোকটার সুরাত কেমন—তা দেখায় দোষ কি?

রাবিয়া বেগম চোখ পাকিয়ে বললো—তবে রে! এইতো মরার আলামত!

ঃ ভাবী!

ঃ আর নয়। যতদূর এগিয়েছো, ঐ ঢের। আরো এগিয়ে ডুবে মরতে যেও না।

ঃ ওমা! ডুবে মরতে গেলাম কোথায়?

ঃ যেতে আর বাকী আছে কিছু? আমি কি মেয়ে নই? আমি কিছু বুঝিনে?

ঃ তা মানে—

ঃ তওবা তওবা! একজন জবরদস্ত লাঠিয়ালের বোন তুমি। কে একজন হাবা না গাবা, ল্যাংড়া না কুঁড়ে, বাঁশী বাজায় রাত-বিরাতে। সেই বাঁশী শুনেই তার জন্য দিউয়ানা বনে যাবে? এ কথা তোমার ভাইয়ের কানে গেলে আর আস্ত রাখবে তোমাকে?

ঃ ভাবী।

www.pathagar.com

ঃ খবরদার-খবরদার। এমন খেয়াল এখনই ঝেড়ে ফেলো মন থেকে। নইলে আখেরে বড়ই পোস্তাতে হবে বলে দিলাম।

রোকসানার ভাই অর্থাৎ রাবিয়ার স্বামী বাহার খাঁ এই সময় বাইরে থেকে বাড়ীতে ফিরে এলেন। রাবিয়ার কথা শুনতে পেয়ে তিনি দেউটি থেকেই বললেন—কি হলো? কাকে পোস্তাতে হবে?

রোকসানা ফিরদৌস চমকে উঠে 'ওরে—ব্বাবা!' বলে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিয়ে পালালো। রাবিয়া বেগম হাসিমুখে বললো—না, কিছু নয়। আপনার বোনটা মোটেই সময় মতো নাওয়া খাওয়া করে না, তাই বলছি।

বাহার খাঁও হাসিমুখে বললেন—ও আচ্ছা ওকে তাহলে সময় থাকতেই শাসন করো ভাল করে।

মানুষকে শাসন মানানো অনেক খানি সহজ। মনকে শাসন মানানো ঢের শক্ত। ভাবীর কথা শুনে কিছুটা হুঁশে ফিরে এলেও আর মনকে শাসন করার কিছু আগ্রহ-ইচ্ছে হলেও, আবার যখন রাত্রিকালে বেজে উঠলো বাঁশী, রোকসানা ফিরদৌসের তামাম ইচ্ছে-ইরাদা কর্পূরের মতো উবে গেল। আবার সে আকৃষ্ট হলো বাঁশীর দিকে। বিছানায় চোখ মুজে আবার সে পেতে রইলো কান। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলো বাঁশী। এরপর সে নিমেষেই নিজেকে হারিয়ে ফেললো সুরের আবর্তে।

বাঁশীর আবেদনটি আজ যেন আরো অধিক আকুতিময়, আরো অধিক করুণ এবং আরো অধিক মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাজার টুকরো করে যেন নিজের দীলটাকেই বাঁশীর সুরে বিলিয়ে দিচ্ছে বাঁশীওয়ালা। যেন রক্ত ঝরছে অন্তরে তার। মর্মস্পর্শী ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে আবেদন। ঝরে পড়ছে মিনতি। ঠিক কেঁদে কেঁদে বলছে, "মরেছি তোমারে হেরিয়া ক্ষণিক, মরিতেছি ফের খুঁজিয়া—কোথায় লুকালে তুমি কোথায় ওগো তুমি কোথায়—।"

রোকসানা আজ ধরে ফেলেছে বাঁশীর ভাষা। এমনই এক গানের কলি সে নদীপথে চলার কালে একদা এক বিবাগীকণ্ঠে শুনেছিল। বেশী দিনের কথা নয়। গানটি তার বেজায় ভাল লেগে ছিল। বার বার মোক্কো করে কথা কয়টি সে বেশ কয়েকদিন আউড়ে গেছে। আসল সুরটা ইতিমধ্যেই এলোমেলো হয়ে গেলেও, সুরের আমেজটা দীলে তার তরতাজাই ছিল। স্মরণে ছিল গানের কলি। প্রথম থেকেই গানের ভাষাটা যে আনমনে হাতড়িয়েছে। চেনা চেনা লেগেছে। চিনে নেয়ার চেষ্টা করেছে সুরটা। আজকের এ সুস্পষ্ট আকুতির মাঝে সে আবার ফিরে পেয়েছে সেই সুর, খুঁজে পেয়েছে সেই কথা—"মরেছি তোমারে হেরিয়া ক্ষণিক, মরিতেছি ফের খুঁজিয়া—কোথায় লুকালে তুমি কোথায়—ওগো তুমি কোথায়—"। মুখের কথা বাঁশীর সুরে বিগলিত হচ্ছে।

রোকসানা ফিরদৌস বিভোর হয়ে শুনছে। তার অবচেতন অন্তর নীরবে গেয়ে যাচ্ছে সেই গান। অলক্ষ্যে অচেতনে চোখের কোণে জমা হচ্ছে আঁসু। যদিও সে বুঝে তার কিছু নয়, তবুও সে কেঁদে যাচ্ছে অপরের বেদনায়।

www.pathagar.com

অকস্মাৎ ছন্দ পতন। আচমকা থেমে গেল বাঁশী আর সুরের বদলে সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগলো প্রচণ্ড এক হৈ চৈ। চমকে গিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো রোকসানা। কি হলো—কি হলো বলে নীরব আর্তনাদে সে কেবলই ছটফট করতে লাগলো।

যেটা হওয়ার কথা ছিল, সেইটেই হলো। জেকের আলীরা সকালে মিথ্যা দম্ভ করেনি। সন্ধ্যে হওয়ার পর থেকেই তারা তালঠুকে ছিল। বটতলায় আজও আবার বাঁশী বেজে উঠলে, আঁধারে গা-ঢেকে তারা চুপি চুপি বটতলায় চলে এলো এবং একসঙ্গে অকস্মাৎ হা-রা-রা রবে ঘিরে ধরলো বাঁশীওয়ালাকে। জেকের আলী সেই সাথে হাঁক দিয়ে বললো—চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলো, যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

বাঁশীওয়ালা হতবাক। ঘর নয়, বাড়ী নয়, উন্মুক্ত এক ময়দান। নিঃস্ব এক লোক বাঁশী বাজাচ্ছে সেখানে বসে। কোন অর্থকড়ি ধন-সম্পদ কাছে নেই। তার উপর ডাকাতের হামলা হওয়ার কি কারণ বাঁশীওয়ালা প্রথমে সেইটেই বোঝার চেষ্টা করলো। কিন্তু যখন দেখলো, আগন্তুকেরা তার ঘাড়ের উপর পড়ে পড়ে অবস্থা, তখন সে চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

জ্যোৎস্না ঢালা রাত। কোন হাতিয়ার কেউ তাক করছে কিনা, বাঁশীওয়ালা তা এক পলকে দেখে নিলো। এরপর কিছুটা সরে এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে বললো—একি! আপনারা আমাকে ঘিরে ধরলেন কেন? আমার কাছে তো কোন অর্থকড়ি নেই।

জেকের আলী সক্রোধে বললো—অর্থকড়ি! আমরা কি ডাকাত না লুটেরা যে তোমার কাছে অর্থকড়ি পাওয়ার জন্য এসেছি?

ঃ তাহলে আমার উপর এভাবে চড়াও হলেন কেন?

ঃ তুমি কোন চোর-ডাকাতের চেলা কিনা, সেই হদিস করার জন্যে।

ঃ সে কি! চোর ডাকাতের চেলা হবো কেন আমি?

ঃ তা হবে নাতো কে তুমি? এখানে এতরাতে বাঁশী বাজাতে আসো কেন দৈনিক? মতলব কি তোমার?

ঃ মতলব! আমার আবার কি মতলব হবে? গরমের রাত। ঘুম ধরে না সহজে। তাই বসে বসে বাঁশী বাজাই।

ঃ তাহলে এখানে এই বটতলায় কেন?

ঃ কারো অসুবিধে যাতে করে না হয়, সেই জন্যে। পাড়ার মধ্যে বাঁশী বাজালে লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হবেতো! তাই এখানে এসে বাজাই।

কথার মধ্যে যুক্তি আছে। জেকের আলীর গরম কিছুটা কম হলো। লহমা খানেক থেমে ফের সে প্রশ্ন করলো—তুমি, মানে মকান কোথায় তোমার? এই গাঁয়ের লোক বলে তো মনে হচ্ছে না?

ঃ জিনা। আমার বাড়ী অন্য জেলায়। এই ফরিদপুরের মাদারীপুরে। এখানে একজনের মকানে আমি এসেছি।

ঃ কাজ কি তোমার এখানে?

www.pathagar.com

ঃ কোন কাজ নিয়ে আসিনি। বেড়াতে এসেছি। আমি এখানে মেহমান।

ঃ মেহমান! মেহমান আছো তো মেহমান হয়েই থাকো। ভিনগাঁয়ে এসে দুপুর রাতে বাঁশী বাজানোর এতো সখ কেন?

বাঁশীওয়ালা ঈষৎ ভারী কণ্ঠে বললো—কি করবো বলুন? ঐটেই যে আমার একমাত্র সখ। না বাজিয়ে আমি স্থির থাকতে পারিনে।

তার কথা শুনে জেকের আলীর সঙ্গীদের একজন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—তাজ্জব লোক! বাঁশী না বাজিয়ে স্থির থাকতে পারে না, এ আবার বলে কি? পাগল নাকি জেকের ভাই?

অন্য একজন তামাসা করে বললো—পাগল না হলেও, জরুর আধপাগলা।

তৃতীয়জন তম্বি করে বললো—আরে বাদ দাও। এসব বিলকুল ভড়ং। আলবত কোন বদ মতলব আছে এর।

জেকের আলী ফের জেরা শুরু করলো—এখানে কার মকানে এসেছো?

বাঁশীওয়ালা বললো—শাহ সাহেবের মকানে।

ঃ শাহ সাহেব! কোন্ শাহ?

ঃ নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব।

জেকের আলী থমকে গেল। বিস্মিতকণ্ঠে বললো—নিয়ামতশাহ সাহেব? তার মকানে এসেছো?

ঃ জি হাঁ।

ঃ কথাটা ঠিক তো?

ঃ ঠিক হবে না কেন?

ঃ কবে তাহলে এসেছো?

ঃ হপ্তা খানেক হবে।

ঃ শাহ সাহেব তোমার কে হন?

ঃ সম্পর্কে মামা হন।

ঃ সম্পর্কের মামা? আপন মামা নন?

ঃ জিনা। আমার মামার দোস্ত্।

ঃ সেই সুবাদে এসেছো?

ঃ জি জি।

ঃ আজব ঘটনা। একটা জোড়াদেয়া রিস্তেদারের মকানে এসে এভাবে 'তেরেকিটি তাক' মেরে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াচ্ছো?

তৃতীয়জন জমিরউদ্দীন তীব্র প্রতিবাদ করে বললো—মিথ্যা কথা। এটা আমি বিশ্বাস করিনে। এ লোক কোনক্রমেই শাহ সাহেবের মেহমান হতে পারে না।

বাঁশীওয়ালা পাল্টা প্রশ্ন করলো—কেন পারে না?

ঃ তোমার মতো একজন বাঁশী বাজানো বাউরে লোক তার মকানে স্থান পেতে পারে না। শাহ সাহেবকে সবাই আমরা চিনি।

বাঁশীওয়ালা বললো—বাউরে লোক!

দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ নূর বকশ, বাঁশীওয়ালাকে জ্যোস্নার আলোয় ভাল করে দেখে

www.pathagar.com

নিয়ে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ। একশোবার বাউরে লোক। তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। তিন- চারদিন আগে ভিন এলাকার যে এক নওজোয়ান আমাদের সারা গাঁ টহল দিয়ে বেড়ালো—মানে এপাড়ায় ওপাড়ায় এনতার ঘোরাফেরা করলো, সেই লোক তুমি নও ? দেখতোরে বরকত, এই লোককেই কি আমরা কয়দিন ধরে দেখলাম না ?

প্রথমজন বরকতুল্লাহ কাছে এসে দেখেই সশব্দে বলে উঠলো—আরে হ্যাঁ তো! ঠিক ঠিক। এই লোকই—এই লোকই।

জেকের আলী বাঁশীওয়ালাকে আবার প্রশ্ন করলো—তাই ? আপনিই কি সেই লোক ?

বাঁশীওয়ালা স্মিতকণ্ঠে বললো—জি, আমিই।

ঃ তুমিই! আশ্চর্য! এরপরও বলবে, তুমি শাহ সাহেবের মেহমান ?

ঃ কেন, তাতে কি হয়েছে ?

ঃ কি হয়েছে মানে ? আলগা এক গাঁয়ের তামাম পাড়ায় যে লোক মাস্তানের মতো সারাদিন টহল দিয়ে বেড়ায় আর সারারাত মাঠে বসে বাঁশী বাজায়, এমন একটা রংবাজকে স্থান দেবেন শাহ সাহেব। কখ্খনো এটা হতে পারে না।

অন্য একজন বললো—আরে এত কথার দরকার কি ? একে ধরে নিয়ে চলো আমরা শাহ সাহেবের বাড়িতে যাইনে কেন ? দেখি, সে কতবড় সত্যবাদী আর সেখানে যাওয়ার সৎসাহস তার আছে কিনা ?

নূর বকশ বললো—পাগল! গুল একটা মেরে দিয়েছে ব্যস। সেই সৎ সাহস থাকে ? এখন দৌড় না দিলে হয়।

জেকের আলী বাঁশীওয়ালার আরো খানেক কাছে এসে বললো—কি মিয়া ? এ সৎসাহস আছে ?

বাঁশীওয়ালা স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললো—থাকবে না কেন ? চলুন—

জেকের আলী আর তার সঙ্গীরা এবার পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এত সহজভাবে আর নির্দ্বিধায় লোকটা এ প্রস্তাবে রাজী হবে, এটা তারা ভাবেনি। ঘটনাটা সত্যি হলে, অর্থাৎ লোকটা সত্যি সত্যিই শাহ সাহেবের মেহমান হলে, খানিকটা বিব্রতকর ব্যাপার বৈকি ? এই অনর্থক হুড় হাঙ্গামা করার জন্য শাহ সাহেবই বা কি মনে করবেন। তার ধারণা কারো উপর খারাপ হলে, গাঁয়ের বারো আনা লোকের কাছেই তার ভাবমূর্তি বিপন্ন হয়ে যায়। জেকের আলী ইতস্তত করে বললো—সত্যিই আপনি শাহ সাহেবের মেহমান ?

বাঁশীওয়ালা স্মিতহাস্যে বললো—আহ্হা চলুন না ? গেলেই বুঝতে পারবেন।

জেকের আলী অতপর থতমত করে বললো—তা মানে, আপনার নামটা—

বাঁশীওয়ালা বললো—নূরউদ্দীন।

নিয়ামতুল্লাহ শাহ ইয়ারপুরের একজন অত্যন্ত সৎ-সরল মানুষ। খানদানী লোক ও শরীফ ইনসান। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ঈমানের সাথে মুর্শিদাবাদের নবাবের নকরী করে গেছেন। নিজেও তিনি এলেমদার আদমী আর পরহেজগার লোক। কোন সাতে-

www.pathagar.com

পাঁচে থাকেন না বা কোন রকম অসততা-উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করেন না। ধর্মকর্ম নিয়ে একটু খানি ফাঁকে থাকতে ভালবাসেন। গাঁয়ের কোন প্রধান-মাতবর নন তিনি। কিন্তু প্রধান মাতবর সহকারে গাঁয়ের সকলেই তাকে সম্মান সমীহ করে চলেন।

নূরউদ্দীনকে নিয়ে যখন জেকের আলীরা নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবের বাড়ীতে এসে হাজির হলো, শাহ সাহেব তখনও জেগেই ছিলেন। ঘুমোননি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাতপাখা নাড়ছিলেন। বাহির আঙ্গিনায় অনেক লোকের কথাবার্তা শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ফটফটে চাঁদের আলোয় বাইরে এসে দাঁড়াতেই জেকের আলী সামনে এসে সালাম দিয়ে বললো—আপনার বোধ হয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম চাচা। মাফ করে দেবেন। দেখুন তো, এই লোক কি আপনার মেহমান?

নূরউদ্দীনকে দেখিয়ে দিয়ে সকলেই তাঁর জবাবের অপেক্ষা করতে লাগলো। ধীরকণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সেকি! সেটা যাচাই করার কারণ কি ঘটলো তোমাদের?

জেকের আলী থতমত করে বললো—কথা হলো, কয়দিন ধরেই এই লোক বাঁশী বাজাচ্ছে মাঠে তো—

শাহ সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন—আর অমনি তোমরা তার পেছনে লেগেছো? তোমাদের কি খেয়ে দেয়ে কোন কাজ কাম নেই রে বাপু?

ঃ চাচা!

ঃ তোমরাও ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দিলে না?

ঃ না—মানে, আমরা ভাবলাম আপনি এটা জানেন কিনা—

ঃ জানবো না কেন? আমার মেহমান কোথায় থাকে, কি করে, তা আমি জানবো না?

ঃ কিন্তু মাঠে বসে এইভাবে বাঁশী বাজায়—

ঃ তোমাদের কি তাতে কোন অসুবিধে হয়েছে? হয়ে থাকলে বলো, সে আর বাজাবে না। তীব্র আওয়াজ দিয়েও তো বাজায় না সে।

ঃ চাচা!

ঃ মাঠে ময়দানে বা নদী পথে কেউ যদি একটু আধটু বাঁশী বাজায়, কি গান গায়—তাতে তো গাঁয়ের কারো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এ নালিশ আগে কেউ করেনি।

উপস্থিত যুবকের দল লা-জবাব হয়ে গেল। জেকের আলী একটু পর নিস্তেজ কণ্ঠে বললো—আমরাও নালিশ নিয়ে আসিনি চাচা। আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। ঐ রকম একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় বসে অনেক রাতে বাঁশী বাজায়—এ লোকটা কে, এইটে জানার জন্যেই আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। কোন খারাপ অসৎ লোক বা পাগল-টাগল কিনা, এই ভেবে।

ঃ নারে বাপু, না-না। মোটেই ওরকম কোন ছেলে এ নয়। খুব ভাল ছেলে। এ নিয়ে খামাখা তোমাদের ব্যস্ত হওয়ার জরুরত নেই।

ঃ ঠিক আছে চাচা। আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা তাহলে আসি এখন?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, তাই এসো। অনেক রাত হয়েছে। এখন অধিক কথাবার্তা বলতে গেলে পাড়ার লোকের কৌতুহলই বৃদ্ধি করা হবে।

বাঁশীওয়ালা নূরউদ্দীনের কাছে মামুলী একটু মাফ চেয়ে নিয়েই তাড়াতাড়ি কেটে পড়লো জেকের আলীরা। বাঁশীওয়ালাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে না পারার শরমে তারা আর এক লহমাও দাঁড়ালো না।

কিন্তু লোক জুটে গেলই। প্রচণ্ড গরমের জন্যে পাড়ার অনেকেই তখনও, জেগেছিলেন। তারা উঠবোস করছিলেন। শাহ সাহেবের বাহির আঙ্গিনায় অকস্মাৎ জন সমাগমের শব্দ পেয়ে এক এক করে বেরিয়ে এলেন অনেকেই।

এঁদের মধ্যে শাহ সাহেবের এক খুব খাতিরের লোক ছিলেন। তিনি ভিন এলাকায় কারবার করেন। দিন তিনেক আগে বাড়িতে এসেছেন। বাড়ীতে এসেও সাংসারিক ঝামেলায় বাইরে বাইরে ঘুরছেন, শাহ সাহেবের সাথে বসতেই পারেননি। তিনি সামনে এসে দাঁড়াতেই শাহ সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—আরে আকন্দ সাহেব যে! কবে এলেন? দেখাই করেননি যে এবার এসে?

আবদুস সালাম আকন্দ সাহেব শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—খুবই ব্যস্ত ছিলাম ভাই। সময় পাইনি। তা আপনার খবর কি? এত রাতে এতো লোক আপনার এখানে এসেছিল—মানে চলে গেল দেখলাম, ব্যাপার কি?

ঃ আর বলবেন না। এই গাঁয়েরই ছেলেপুলে। যত্তসব ছেলে ছোকরার কাণ্ড।

ঃ কি কয় ওরা?

ঃ একেবারেই এক মামুলী ব্যাপার। এমন কিছুই নয়। আসুন—আসুন। এই দহলীজের বারান্দায় একটু বসি। যে গরম পড়েছে। গাটা একটু জুড়িয়ে নিই আর সেই ফাঁকে আপনার সাথে দু'টো কথাবার্তা বলি। এতদিন পরে এসে কোন কথাই হবে না, তা কি হয়?

অতপর শাহ সাহেব অন্যান্যদের লক্ষ্য করে বললেন—যান যান, আপনারা গিয়ে শুয়ে পড়ুন। দেখছেন না, আজকালকের ছেলেপুলেদের আচরণ কি হয়েছে? ঘটনা কিছু নয়। সামান্য এক বাঁশী বাজানোকে কেন্দ্র করে এই দুপুর রাতে তারা খামাখা হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। আপনারাও তো অনেকেই মাঠের মধ্যে এক বাঁশীর সুর একটু আধটু শুনেছেন। কোন অসুবিধে কি হয়েছে আপনাদের, বলুন?

উপস্থিত সকলেই বললেন—না-না, কোন অসুবিধে হয়নি তো!

ঃ তাহলেই বুঝুন! খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই, এই নিয়ে ঐ ছেলেছোকরারা মাতামাতি শুরু করেছে। যান, শুয়ে পড়ুন গে সবাই—

সকলেই চলে গেলেন। নূরউদ্দীন ইতিমধ্যেই তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। আকন্দ সাহেব সহকারে শাহ সাহেব এসে দহলীজের খোলা বারান্দায় বসলেন।

অল্প কিছু কথাবার্তার পর আকন্দ সাহেব প্রশ্ন করলেন—তা ব্যাপার কি ভাই সাহেব? বাঁশী বাজলো মাঠে আর আপনার কাছে ছেলেরা এলো মানে?

শাহ সাহেব হাসি মুখে বললেন—ঐ বাঁশী বাজানো ছেলেটা যে আমারই মেহমান। মানে আমারই এক দোস্তের ভাগ্নে। আমার বাড়ীতেই এসে কয়দিন ধরে আছে।

www.pathagar.com

ঃ সেকি! ঐ যে এক সুদর্শন ছেলে, বলিষ্ঠ গঠন আর সুন্দর মুখাকৃতি মানে আপনারই নাকি মেহমান শুনলাম, সেই ছেলের কথাই বলছেন কি?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি তাকে দেখেছেন?

ঃ দেখলামই তো ঘুরতে ফিরতে কয়েকবার। রাতে কি সেই ছেলেই বাঁশী বাজায়?

ঃ জি। ঐ এক তার সখ। মানে, বাতিকই বলা যায়।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আকন্দ সাহেব বললেন—কি তাজ্জব কথা। এত সুন্দর বাঁশী বাজায় আপনার ঐ মেহমান? এত মিষ্টি সুর? আমিও তো কয়দিন ধরেই ভাবছি, একবার খোঁজটা নিলে হয়।

শাহ সাহেব বললেন—তাই নাকি? আপনিও তাঁর বাঁশী শুনেছেন?

ঃ শুনেছি মানে? যতক্ষণ জেগে থাকি, কান পেতে শুনি আর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাই। তোফা তোফা।

ঃ হ্যাঁ, অনেকেই এ কথা বলেন।

ঃ নামটা কি ছেলেটার?

ঃ নূরউদ্দীন।

ঃ ছেলেটা কে ভাই? আপনার কে হয়?

ঃ সরাসরি আমার কেউ হয় না। ঐ যে বললাম, আমার এক দোস্তের ভাগ্নে? খুব পেয়ারের দোস্ত। ছেলেটাও আমার খুব স্নেহভাজন ছেলে। আমার এখানে বেড়াতে আসার জন্য ছেলেটাকে বহুবার সাধাসাধি করেছি, কিন্তু আসেনি। মাস ছয়েক আগে হঠাৎ একবার আসার পর কি যেন কি খেয়ালে আরো দুই দুইবার এলো আর বেশ কয়েকদিন থাকলো। এবারও হপ্তাকাল ধরেই সে আছে।

ঃ আচ্ছা। তা ছেলেটা করে কি? এই বাঁশী বাজিয়েই বেড়ায় বুঝি? অবশ্য যা হাতযশ, তাতে জায়গা মতো পড়লে এ কাজেও বেশ করে খেতে পারবে আর খ্যাতি সম্মান পাবে—এতে ভুল নেই। এমন দক্ষ হাত—

শাহ সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন—এইবার ঠেকিয়ে দিলেন ভাই সাহেব। এই এক কাজেই কি? দক্ষ যে সে কোন্ কাজে নয়, এখন তা হিসেব করে আমারই বলা কঠিন। এমনিতেই কি এত স্নেহ করি তাকে?

ঃ কি রকম? বলুন তো শুনি?

ঃ সে অনেক কথা ভাই।

ঃ তা হোক—তা হোক, বলুন। আপনার মতো ছেলেটাকে আমারও খুব ভাল লেগেছে। বলতে পারেন, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

শাহ সাহেব পুনরায় হেসে বললেন—তাই?

আকন্দ সাহেব বললেন—বিলকুল। তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, ছেলেটা খুব সৎ আর নিসন্দেহে গুণী। মুখই তো অন্তরের প্রতিচ্ছবি কিনা!

ঃ তা ঠিক। এত সৎস্বভাবের ছেলে লাখে একটা পাওয়া ভার। সর্বগুণে গুণী। তবে দোষও তার একটা মস্তবড়ই আছে। মনে প্রাণে সে কিছুটা বাউরে আর জেদী।

www.pathagar.com

ঃ তাই নাকি ? বাড়ী কোথায় ছেলেটার ? বাপ-মা বা অভিভাবকদের খবর কি ?

ঃ তাঁরা মস্তবড় লোক। বাপভাই সবাই আছেন। আগে ছোটখাটো জমিদারই ছিলেন তাঁরা। ইংরেজ সরকারের হাতে সব কিছু খুইয়েও এখন যা আছে, তাতে এখনও তারা বড়লোক। অনেক বিষয় বিত্ত। আপনার মতোই মস্তবড় তেজারতদার মানুষ। এর উপরও আবার সবাই তারা এলেমদার। এই পাশের জেলার মাদারীপুরে বাড়ী।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এই নূরউদ্দীনও অনেকখানি লেখাপড়া জানা ছেলে। কিন্তু ঐ যে বললাম, স্বভাবে সে বাউরে ? ওতেই যত গোলমাল। তার বড় দুইভাই এলেম শিক্ষা করে সংসারটা বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে। নূরউদ্দীনের ওয়ালেদ নূরউদ্দীনকেও সংসারী করার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। বাপের ঠিক অবাধ্য সে নয়। আসলে সাদামাটা আর নিরীহ সংসার জীবন যাপন করার মানসিকতা এই নূরউদ্দীনের মধ্যে নেই। একটা বড় কিছু হওয়ার বা করার তার বেজায় ঝোঁক।

ঃ যেমন ?

ঃ যখন যেটা দেখে তখন সেইটেই সে আঁকড়ে ধরে আর তাতেই দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে। লেখাপড়া শেষ হতে না হতেই এক গানের উস্তাদ এলেন এলাহাবাদ থেকে। তাঁর খুব নামযশ আর খাতির-সম্মান দেখেই নূরউদ্দীন ঐ উস্তাদের পেছনে ছুটলো। কয়েকদিন মুখে তার গান আর গান।

ঃ তারপর ?

ঃ এ প্রসঙ্গ শেষ না হতেই সে আবার এক বাঁশীওয়ালার খপ্পড়ে পড়ে গেল। শুরু হলো বাঁশীর রেওয়াজ। এ রেওয়াজটা সে মনোযোগ দিয়ে করলো। আর রেওয়াজ করে করে বাঁশীতে যে দক্ষতা অর্জন করেছে তাতো নিজেই আপনি দেখছেন।

ঃ হ্যাঁ, সত্যিই অপূর্ব। বিলকুল উস্তাদ।

শাহ সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—না, উস্তাদ যদি বলেন, তাহলে ঠিক এখানেও নয়। যাতে সে সব চাইতে বড় উস্তাদ সেটা একেবারেই আলাদা এক দিক।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ লাঠিতেই সে সবচেয়ে বড় উস্তাদ আর এতেই সে বিস্ময়করভাবে দক্ষ। বাঁশী বাজানো শিখতে শিখতে লাঠি খেলার হিড়িক পড়ে গেল দেশে। প্রতিযোগিতা মূলক খেলা আর পুরস্কার দেয়া শুরু হলো। বেড়ে গেল শক্ত লাঠিয়ালের কদর। ব্যস্! আবার টপ্‌কে গেল নূরউদ্দীন। তার জিদ হলো, লাঠি চালানোই শুধু শিখবে না, সে উস্তাদ হবে লাঠিয়ালদের।

ঃ বলেন কি!

ঃ সেই থেকে এই বিগত কয়েকটি বছর ধরেই সে এই সাধনায় ছিল। এতেই সে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন এলাকায় লাঠি খেলে বেড়াতে লাগলো। গান, বাঁশী, তামামই বাদ পড়ে গেল। লাঠি খেলার নাম শুনলেই তাকে আর ঘরে আটকানো যেতো না, বেরিয়ে পড়তো লাঠি হাতে।

www.pathagar.com

ঃ তার মানে ? লাটি ছেড়ে আবার তাহলে বাঁশী ধরলো কেন ?

ঃ কারণ তো কিছু আছেই। ইদানিং মাথায় তার একটু ছিট দেখা দিয়েছে। এটা শুরু হয়েছে তার শাদির প্রসঙ্গ নিয়ে। সংসারী করার জন্য তার বাপভাইয়েরা এখন তাকে শাদি দেয়ার জন্য খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। তার ইচ্ছে-ইরাদার তোয়াক্কা না রেখে জোর করেই তাকে শাদি দেয়ার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন আর তার উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করেছেন। পাত্রীও তারা নাকি ঠিক করে রেখেছেন। অধিক এই চাপাচাপির কারণেই বোধ হয় তার মাথায় একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। সে লাঠি খেলাও ছেড়েছে, বাড়ীও ছেড়েছে। এখন সে নানা দিকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ঃ সেকি!

ঃ আমার বিবি সাহেবাই আমাকে জানালেন, বাড়ী থেকে পালিয়েই সে আমার এখানে এসেছে। বাড়ীতে থাকলে তার অভিভাবকেরা জোর করেই তাকে শাদি করাবে—এই তার ভয়। আমি যদি বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেই, তাহলে সে আবার অন্য কোথাও চলে যাবে, বাড়ীতে যাবে না। তাই আমিও নীরব আছি। থাকুক সে যে কয়দিন খুশী।

ঃ লাঠি ছেড়ে তাই এই বাঁশী ?

ঃ ঐ যে বললাম, তার মানসিক ভারসাম্য একটু গড়বড় হয়ে গেছে ? একটা কিছু নিয়ে না থাকলে সে স্থির থাকতে পারে না।

ঃ বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! তা শাদির ব্যাপারে তার এমন আতঙ্ক কেন ?

ঃ এটাও তার একটা খেয়াল বা জিদ। আমার বিবি সাহেবা তাকে ফুসলিয়ে এটাও জেনে নিয়েছেন। তার নিজের পছন্দের বাইরে, যত সুন্দরীই হোক, অন্য কাউকে সে শাদি করতে রাজী নয়। যাকে তার পছন্দ হবে একমাত্র তাকেই সে শাদি করবে, অন্যথায় মাথায় লাঠি ভাঙ্গলেও সে জিন্দেগীতে ও কাজে যাবে না। কি এক বিদ্‌কটে জিদ দেখুন।

আকন্দ সাহেব বিপুল বিস্ময়ে বললেন—তাইতো! এমন অদ্ভুত মানসিকতার ছেলে তো আগে কখনো দেখিনি। এত রূপ, এত গুণ, অথচ এতটা খেয়ালী!

ঃ এজন্যেই তো তার বাপ-ভাইয়েরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। গত পরশু খবর পেলাম, ও যেখানে ইচ্ছে যাক, যা ইচ্ছে করুক, ওকে নিয়ে তাঁদের আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। বাড়ীতে আসে আসুক, না হয় যেখানে ইচ্ছে যাক, এই তাঁদের কথা।

ইতিমধ্যে মোরগ ডেকে উঠায় কথা খাটো করে শাহ সাহেব ও আকন্দ সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

সুবেহ সাদিকের সাথে সাথেই রোকসানা ফিরদৌস বিছানা ছেড়ে উঠে এলো এবং কোন মতে ফজরের নামায আদায় করলো। এরপরেই সে আবার অস্থির হয়ে উঠলো। গত রাতের ঐ ঘটনার পর তার চোখে আর ঘুম আসেনি দীর্ঘ সময়। এ পাশ

www.pathagar.com

ওপাশ করে প্রায় গোটা রাত কাটিয়ে সুবেহ সাদিকের আগে দণ্ড কয়েক ঘুমিয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই আবার তার মনে ঐ প্রসঙ্গ জোরদার হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ বাঁশীটা থেমে গেল কেন, ওখানে এত গোলমাল হলো কেন, আর বাঁশী একবারও বাজলো না কেন, বাঁশীওয়ালার কোন বিপদ হলো কিনা—ইত্যাদি ভেবে সে আওয়ারা হয়ে ঘুরতে লাগলো।

ভাবীর কাছে এ প্রসঙ্গ তোলার আর উপায় নেই। তাহলে এবার যারপর নেই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। ভাবী আবার কথাটা তার খসম অর্থাৎ রোকসানার ভাইয়ের কানেও দিতে পারে। ওরে বাপরে। তাহলে আর রক্ষে নেই। ভাই তাকে যত স্নেহই করুন না কেন, কোন বেয়াড়া আচরণ তিনি মোটেই বরদাস্ত করেন না। এ খবরে তাকে তুলে তিনি আছাড়ও মারতে পারেন।

কোন কূল কিনারা না পেয়ে সে কিছুক্ষণ সামলে রাখলো নিজেকে। এরপর বেলা কিছুটা বাড়লে, তাদের পাড়াতেই তার এক বান্ধবীর কাছে সে এক ফাঁকে চলে এলো। সমবয়সী মেয়ে। মক্তবে কিছুদিন এক সাথে পড়েছে। খাতির আছে অনেক-খানি। তাকে আড়ালে নিয়ে রোকসানা ফিরদৌস প্রশ্ন করলো—কিছু শুনেছিস নাকিরে সিতারা? রাতে যে বাঁশী বাজাটা বন্ধ হয়ে গেল আর প্রচণ্ড হৈ চৈ হলো ওখানে, এ সম্বন্ধে তুই কি কিছু শুনেছিস? মানে কি ঘটনা তা কি কিছু জানিস?

সিতারাও বাঁশী শুনে দৈনিক। তবে রোকসানার মতো এত দিউয়ানা হয়ে নয়। কানে পড়ে, তাই শুনে। এ নিয়ে এর আগে তাদের মধ্যে আলাপও হয়েছে বার দু'য়েক। প্রশ্নটা শুনেই সিতারা বানু সাগ্রহে বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানিই তো।

ঃ ঘটনা কি রে? লোকটা কে আর কি ঘটলো ওখানে?

ঃ ওটা এক বাউরে-বাঁচর লোক। কি এক বদ মতলব নিয়ে নাকি সে বাঁশী বাজাতে আসে। জেকের আলী ভাইয়েরা গিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওখান থেকে।

রোকসানা ফিরদৌস চমকে উঠে বললো—বলিস কি! তাড়িয়েই দিলো?

রোকসানার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে না গিয়ে সিতারা বানু আপন জোশে বললো—সেরেফ তাড়িয়ে দিয়েছে, এইতো ওর খোশ নসীব! জেকের আলী ভাইয়েরা খুব ভাল মানুষ বলে ওকে তাড়িয়ে দিয়েই থেমেছে। অন্য কেউ হলে তো ওর হাড়-হাড্ডি গুঁড়ো করে দিতো। বদ-মতলব নিয়ে ভিন এলাকায় মস্তানী করতে এলে কেউ কি ছেড়ে কথা কয়?

ঃ বলিস কি! মস্তান?

ঃ মস্তান বলেই তো তাড়িয়েছে। তার বাঁশীর সুরটা খুবই মিষ্টি—এটা আমিও স্বীকার করি। শুনতে আমারও বেশ ভালই লেগেছে। কিন্তু লোকটা তো মিষ্টি নয়। কোন্ এক ত্যান্দর লোক।

ঃ কার কাছে শুনলি এসব? কে বললো এসব কথা?

ঃ আমাদের হারুন ভাই। কি এক কাজে দক্ষিণ পাড়ার আদু শেখের ওখানে হারুন ভাই আজ সকালেই গিয়েছিল। তামাম ঘটনা আদু শেখের কাছেই শুনে এসেছে হারুন ভাই। লোকটা খারাপ বুঝে আদু শেখের কথাতেই জেকের আলী ভাইয়েরা গত রাতে এই কাজ করেছে।

www.pathagar.com

ঃ সত্যি বলছিস ?

ঃ আমাদের বাড়ীর সবাই একথা শুনেছে। বিশ্বাস না হয়, যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।

জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রোকসানা ফিরদৌস জিল্লুতি আর বৃদ্ধি করতে গেল না। নিদারুণ মর্মব্যথা নিয়ে সে ধীরে ধীরে বাড়ীতে ফিরে এলো।

২

বেজে উঠেছে আবার। তুমুল বেগে বেজে উঠেছে। তবে বাঁশী নয়, কাড়ানাকাড়া। লাঠি খেলার বাজনা। রায় বেরেলীর সাইয়্যীদ আহমদ ব্রেলভী (সৈয়দ আমদ বেরেলভী) জিহাদের ডাক দিয়েছেন। মুজাহিদ পাঠাতে হবে সেখানে। ইয়ারপুরের বাহার খাঁ সেই ইরাদায় লাঠিয়াল বাছাই করছেন। জঙ্গে পাঠানোর জন্যে শক্ত লাঠিয়াল চাই তার।

জাদু জানেন সাইয়্যীদ আহমদ ব্রেলভী। বাংলা মুলুক হয়ে হজ্বে যাবার পথে দলবল নিয়ে তিনি কলিকাতায় কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং দ্বীন ও দেশের দুর্দিনের প্রেক্ষিতে সভা-জালসা করেন। তিনি আন্দোলনের ডাক দেন এবং প্রয়োজনে জিহাদের জন্যে তৈরি থাকার আহ্বান জানান।

জাদুর মতো কাজ করে তাঁর আহ্বান। বাংলা মুলুকের হাজার হাজার লোক তাঁর নসিহতে মুগ্ধ হন এবং তাঁর হাতে বয়াত হন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইয়ারপুরের বাহার খাঁও তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণ করেন এ অঞ্চলের শত শত লোক। সাইয়্যীদ আহমদের প্রেরণায় জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে বিপুল সংখ্যক লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এক্ষণে ডাক এসেছে সেই জিহাদের। বাংলার লোক মৌলভী ইমামউদ্দীন ও নজীবুল্লাহর নেতৃত্বে একদল লোক সাইয়্যীদ আহমদের ডাক নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছেন। দ্বীনকে ফ্যাসাদ-ফিৎনা ও শিরক থেকে এবং দেশকে বিজাতির আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার ডাক। ডাক শুনেই বাহার খাঁ মুজাহিদ দল গঠন করার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

বাহার খাঁর ইরাদার কথা শুনে ইয়ারপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রচুর লোক বাহার খাঁর বাড়ীতে এসে ভিড় জমিয়েছেন জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে। দ্বীন ও দেশের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে অশেষ সওয়াবের হকদার হওয়া যায়—এই প্রেরণাই তাদের এত আগ্রহী করে তুলেছে।

কিন্তু জিহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ পোষণ করলেই তো আর সব রকম লোক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা যায় না। সে জন্যে শরীরে তাকত থাকা চাই। লড়াই করার তাকত। মজবুত লাঠিয়ালই এ কাজের যোগ্য লোক। তাই বাহার খাঁ লাঠিয়াল বাছাই করছেন। লাঠি খেলার মহড়ার মাধ্যমে মুজাহিদ নির্বাচন করছেন। লাঠি-চালানোর হাত যার শক্ত, সেই পরে লড়াইয়ের অন্যান্য হুরক সফলভাবে গ্রহণ করতে পারবে। পারবে সব রকম যুদ্ধাস্ত্র চালাতে।

www.pathagar.com

বাহার খাঁর বাহির আঙ্গিনায় এই মহড়া শুরু হয়েছে। বাহির আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। মহড়ায় অংশগ্রহণ করার জন্যে জমা হয়েছেন যতজন, তার চেয়ে পঞ্চাশ গুণে অধিক লোক এসেছেন দর্শক হয়ে। অর্থাৎ লাঠি খেলা দেখার জন্যে।

জমে উঠেছে মহড়া। বাহার খাঁর অন্যতম প্রধান সাগরেদ জেকের আলী আঙ্গিনার মাঝখানে লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছে। জেকের আলীকে ঠেকিয়ে দিতে না পারলেও, তার সামনে অনেকক্ষণ যে টিকে থাকতে পারছে, প্রাথমিকভাবে তাকেই নির্বাচন করা হচ্ছে। অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে জিহাদকে চাঙ্গা করে দিলেও জিহাদের বিপুল সওয়াব পাওয়া যাবে—এই বলে অমনোনীত ব্যক্তিদের নিবৃত্ত করা হচ্ছে।

মহড়া চলছে বাহির আঙ্গিনার মাঝখানে। দহলীজের বাইরের দিকের বারান্দায় গণ্যমাণ্য লোক ও শিষ্য সাগরেদ নিয়ে বাহার খাঁ বসে থেকে মনোনয়ন দান করছেন। দর্শকেরা আঙ্গিনার চারদিক ঘিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে-বসে আছে। দহলীজের ভেতরে জমা হয়েছে জেনানারা। দহলীজের বাহির বারান্দার দিকে দুই দুইটে জানালা। এই দুই জানালার পাশে দুই চৌকির উপর বসে মগ্ন হয়ে খেলা দেখছে মহিলারা।

এক জানালার ধারে শুধু তরুণীরাই বসেছে। রোকসানা ফিরদৌস তার বান্ধবীদের নিয়ে জানালার একদম কোল ঘেঁষে বসেছে। তারা খেলা দেখছে আর খেলোয়াড়দের দক্ষতা নিয়ে নিম্নকণ্ঠে আলাপ ঠাট্টা করছে। আবেগ প্রকাশ করছে। প্রত্যেকজনের পরীক্ষা অর্থাৎ মহড়ার সময় তালে তালে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠছে বলে তাদের আবেগ উচ্ছ্বাস বাইরে কারো কর্ণগোচর হচ্ছে না।

আবেগের মাত্রা আজ সিতারারই অধিক। জেকের আলীর উপর সিতারা বানুর একটা গোপন দুর্বলতা আছে। তাই জেকের আলীর তারিফে সে মুখর হয়ে উঠেছে। তার হিম্মত ও দক্ষতার প্রতি রোকসানাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেগে ও গর্বে সে ফুলে ফুলে উঠছে।

থেমে থেমে পর পর পনের ষোলজন লাঠিয়ালের পরীক্ষা শেষ হলো। জেকের আলীর সামনে এসে কেউ কেউ অল্পতেই মার খেয়ে কেটে পড়লো, কেউ বা অনেকক্ষণ টিকে থাকার বদৌলতে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ার কিসমত লাভ করলো। জেকের আলীকে এঁটে উঠা তো দূরের কথা, এদের কেউ তাকে এক কদমও পিছু হটাতে পারলো না। জেকের আলীর এই কৃতিত্বে সিতারা বানু আনন্দে একবার তার ডানপাশে উপবিষ্ট রোকসানার কোলে এবং একবার তার বামপশে উপবিষ্ট সাবিহা আরজু নামের অন্য এক তরুণীর কোলে ঢলে ঢলে পড়তে লাগলো।

পরীক্ষা প্রায় শেষের দিকে। আর দুইতিনজন লাঠিয়ালের পরীক্ষা শেষ হলেই আজকের মতো শেষ হবে লাঠিখেলা। আগামী কাল আবার যথাসময়ে ও যথা নিয়মে শুরু হবে মহড়া।

অবশিষ্ট তিনজনের মধ্যে থেকে এবার যে লোক সামনে এগিয়ে এলো, তার চেহারা দেখে দর্শকেরা তাক লেগে গেল। বিশাল এক মানুষ। যেমন লম্বা চওড়া তেমনই তার শরীর স্বাস্থ্য। আস্ত এক পালোয়ান। তাকে দেখে সিতারার বামপাশে উপবিষ্ট সাবিহা আরজু এবার সভয়ে বলে উঠলো—ওরে বাবা! এবার জেকের আলী

www.pathagar.com

সাহেবের কম্ম সারা। পরীক্ষা নেয়া তো দূরের কথা, জেকের আলী সাহেব এবার নিজেই টিকে থাকতে পারলে হয়।

সিতারার বুকটাও ঢিপ ঢিপ করছিলো। তবু সে মুখে হার মানলো না। পূর্ববৎ গর্বভরে বললো—আরে রাখ ওসব কথা। চেহারাটা মোষের মতো হলেই তো আর হলো না। শক্তি থাকা চাই। তার উপর কায়দাই হলো বড় কথা। জেকের আলী ভাই এমন কতজন পালোয়ানকে এক তুড়িতে কাত করে দিয়েছে। তার লাঠির প্যাঁচ ছাঁদতে পারার বাহাদুর একমাত্র উস্তাদ বাহার খাঁ ভাই সাহেব ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।

সাবিহা আরজু তবু বললো—কিন্তু—

সিতারা বানু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—আগে দ্যাখ না কি হয়!

শুরু হলো মহড়া। পালোয়ানটি বিপুল উদ্যমে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এসে জেকের আলীকে হামলা করলে, জেকের আলীও পাল্টা হামলা করলো। শুরু হলো বাঘে-মহিষে লড়াই। কেহ নাহি হারে কেহ নাহি জিতে অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে এ লড়াই চললো। শেষ পর্যন্ত জয় হলো সিতারারই। পালোয়ানটি জেকের আলীকে এঁটে উঠতে পারলো না। সেই পিছু হটে এলো।

ফলাফল যা হবার তাই হলো। অনেক্ষণ টিকে থাকার সুবাদে পালোয়ানটি মনোনয়ন লাভ করলো আর জেকের আলীর খ্যাতি গেল বহুগুণে বেড়ে। তার তারিফে দর্শককুল কলরব জুড়ে দিলো। নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো।

সিতারাকে সামলানো দায় হলো তার দুইপাশের দুই তরুণীর। বামপাশে সাহিবা আরজু আর ডানপাশে রোকসানা—দু'জনে দু'দিক থেকে চেপে ধরেও সিতারাকে বসিয়ে রাখা দায় হলো তাদের। আনন্দে ও উল্লাসে সিতারা বানু পুনঃ পুনঃ লাপিয়ে উঠতে লাগলো। 'বাইরের লোকেরা দেখতে পাবে, তার চিৎকার তারা শুনতে পাবে, সবাইকে তারা খন্নাস আউরাত ঠাওরাবে'—এসব বলে বার বার সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও সিতারা বানু অনেকক্ষণ যাবত হাত-পা ছুড়তে লাগলো আর গর্বিত কণ্ঠে জেকের আলীর তারিফ করে সবাইকে শুনাতে লাগলো।

আস্তে আস্তে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলো। থেমে গেল কোলাহল। এরপর বাকী দুইজন লাঠিয়াল একে একে এসে জেকের আলীর হাতে অল্পতেই পরাস্ত হয়ে কেটে পড়লো। শেষ হলো খেলা। পরীক্ষা দেয়ার জন্য আজ আর কোন লাঠিয়াল সামনে এগিয়ে এলো না।

মহড়া আজকের মতো শেষ বলে ঘোষণা দেয়ার আগে বাহার খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন—আর কোন লাঠিয়াল কেউ অবশিষ্ট আছেন কি? আর কেউ কি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে চান?

জনতার তরফ থেকে কোন জবাব আসার আগেই জেকের আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কয়েকজন একযোগে বলে উঠলো—কেউ নেই উস্তাদ, আজ আর কেউ নেই। ঘোপে ঘাপে দুইএকজন নবীশ গোছের থাকলেও, জেকের আলীর সামনে দাঁড়ানোর সাহস আজ আর কারো নেই। আগামীকাল নয়া লোক না আসা পর্যন্ত তার সামনে কেউ আজ আর এগুবে না।

www.pathagar.com

বাহার খাঁ বললেন—তাজ্জব! এতগুলো বাহাদুর পর পর লড়ে গেল, তবু জেকের আলীকে কিছুমাত্র টলাতে কেউ পারলো না! সাব্বাস জেকের আলী সাব্বাস্! আমার শিক্ষা সার্থক। তুমি আমার গর্ব! আমার দলের অহঙ্কার।

জেকের আলীর সঙ্গীরা ফের সোল্লাসে বলে উঠলো একশোবার উস্তাদ। তাকে হারাতে পারে, এমন মরদ এ তল্লাটে কেউ নেই।

সামনে উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্যে থেকে এই সময় এক নওজোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললো—অনুমতি পেলে আমি একটু কোশেশ্ করে দেখতাম জনাব।

বাহার খাঁ তার দিকে নজর দিলেন। নজর দিয়েই একটুখানি থমকে গেলেন। এক দর্শনধারী নওজোয়ান। চমৎকার গড়ন গঠন আর গায়ের রং। আকর্ষণীয় মুখশ্রী। তার দিকে চোখ তুলে উপস্থিত জনতাও সঙ্গে সঙ্গে চোক ফেরাতে পারলো না।

মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বাহার খাঁ বললেন—আপনি, মানে তুমি কি জিহাদে শরিক হতে চাও?

নওজোয়ানটি বিনম্র কণ্ঠে বললো—পরীক্ষায় কামিয়াব হতে পারলে সে ইরাদা আমার জিয়াদাই আছে।

ঃ সাব্বাস্! তাহলে যাচাই করে দেখো নিজেকে।

লাঠি খেলার খবরে নওজোয়ানটি তার নিজের লাঠিখানা সাথে নিয়েই এসেছিল। লাঠিটা মাটিতে শোয়ায়ে রেখে জনতার মাঝে চুপচাপ বসেছিল। লাঠিটা তুলে নিয়ে এবার সে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

তাকে দেখেই জেকের আলীর সেদিনের সেই সঙ্গীরা উপহাস করে একে অন্যকে বলতে লাগলো—দ্যাখ-দ্যাখ, 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবারতরে'। লাঠি হাতে কে এগিয়ে আসছে দ্যাখ।

অন্যেরা বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলো—আরে সেকি! এতো সেই বাঁশীওয়ালা! বাঁশীওয়ালার হঠাৎ এই মতিভ্রম ঘটলো কেন?

অন্য একজন বললো—ঘোড়ারোগ, ঘোড়ারোগ। বিলকুল ঘোড়ারোগ।

তৃতীয়জন বললো—তাইতো দেখছি। বাঁশী বাজানো আর লাঠি চালানো এক কথা? পাগল নাকি?

প্রথমজন বললো—বিলকুল পাগল। বললাম না সেদিন, পাগল ছাগল না হলে ঐ ভূতুড়ে বটতলায় কি কোন ভাল মানুষ অতরাতে বাঁশী বাজাতে যায়?

তৃতীয়জন ফের বললো—ঠিক ঠিক। মুখে ফুঁ দিয়ে হাতের আঙ্গুল নাচালেই সুন্দর সুর বেরোয় দেখে ভেবেছে, ফুঁ দিয়েই লাটি খেলাতেও জিতে যাবে। বদ্ধ পাগল কাঁহাকার।

দ্বিতীয়জন দাঁত পিষে বললো—একটু থাম। ওর ঐ পাগলামী কিভাবে ছুটে যায়, এখনই দেখতে পাবি। জেকের আলীর লাঠির ঘায়ে কয়হাত লম্বা হয়ে যায় ব্যাটা, সেও তা এখনই টের পাবে।

অগণিত লোকের মধ্যে কথা। কথা তাদের অধিক দূরে গেল না। জনতার মধ্যেও ইতিমধ্যে সহানুভূতিশীল গুঞ্জরন শুরু হলো। কেউ কেউ আফসোস করে বলতে

www.pathagar.com

লাগলো আহা, এত সুন্দর ছেলে! খামাখা ঐ হুড় হাঙ্গামার কাজে না গেলেই ভাল হতো। আসলে ও গুলোতো বেয়াড়া ডানপিটেদের কাজ।

গুঞ্জরন শুরু হলো দহলীজের ভেতরেও। এবার অগ্রণী ভূমিকা নিলো রোকসানা ফিরদৌস। এই নওজোয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে পুলক-বিস্ময়ে বলে উঠলো —ওমা! কি সুন্দর চেহারা রে! কি চমৎকার দেখতে। এ লোক কোত্থেকে এলো?

রোকসানাকে সায় দিয়ে সাবিহা আরজু বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! খুব সুন্দর দেখতে তো! এমন চেহারা কদাচিত দেখা যায়।

একথায় রোকসানা আপন খেয়ালেই বলে উঠলো—কদাচিৎ বলে কদাচিৎ? এই যে আজ এতলোক হাজির হয়েছে এখানে, লাঠি খেলছে কতজন, কিন্তু এর কাছাকাছি চেহারাও কি এদের একজনেরও আছে?

আঁচ লাগলো সিতারা বানুর গায়ে। তার জেকের আলীর সুরাত তেমন উজালা-উমদা নয় বলে, একথা তার গায়ে গিয়ে বিধলো। সে নাখোশ কণ্ঠে বললো—হয়েছে হয়েছে। এমন সুন্দর গাধা পথে ঘাটে হাজারটা দেখা যায়।

রোকসানা ফিরদৌস থতমত করে বললো—সুন্দর গাধা!

সিতারা বানু তাচ্ছিল্যের সাথে বললো—নয়তো কি? পুরুষের বাহাদুরী রূপে নয়, তাকতে। হিম্মতে। একটু অপেক্ষা করে দ্যাখ, ওর ঐ সুন্দর চেহারা জেকের ভাই লাঠির ঘায়ে কি করে পাল্টে দেয়। বাছাধন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি।

মৃদু প্রতিবাদ করে রোকসানা বললো—তা একেবারে অক্ষম লোক তো নাও হতে পারে? এত সাহস করে আসছে যখন—

সিতারা বানু ঠেশ দিয়ে বললো—ব্যস্! অমনি কাত?

ঃ কাত মানে?

ঃ তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কোন খবর না জেনেই যাকে তাকে নিয়ে যখন তখন ডুবে মরিস তুই।

ঃ ডুবে মরি।

ঃ নয়তো কি? কোন্ এক ত্যাঁন্দর লোকের বাঁশী শুনেই ক্ষেপে গেলি দু'দিন আগে। আজ আবার এই এক মাকাল ফল দেখেই লাল হয়ে উঠছিস। দরদ যেন উথলে উঠছে। আসলে ওটা যে কাকের খাদ্য, মানুষের কাছে জাররামাত্র কদরও এসব মাকাল ফলের নেই, তা বিবেচনা করে দেখার হুঁশও লোপ পেয়েছে তোর।

ঃ সিতারা।

ঃ একটু ধৈর্য ধর। কত দত্যিদানা মুখ থুবড়ে পড়লো আর ঐ একটা ফড়িংয়ের তিড়িং-তিড়িং কতক্ষণ টিকে থাকে, একটু ধৈর্য ধরে দ্যাখ।

এদের কথা আর এগুলো না। বেজে উঠলো কাড়ানাকাড়া। বুক ফুলিয়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে গেল জেকের আলী। তা দেখে গর্বে আবার দুলতে লাগলো সিতারা বানু। দম বন্ধ হলো দর্শকদের। নওজোয়ানটি জেকের আলীর সামনে এগিয়ে আসতেই তাকে চিনে ফেললো জেকের আলী। তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। বাঁশীওয়ালাকে চমকে দেয়ার ইরাদায় সে আচমকা হা-রা-রা আওয়াজ দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঁশীওয়ালা নওজোয়ানটির উপর।

www.pathagar.com

কিন্তু একি! চোখের পলক না ফেলতেই দর্শককুল অবাক বিস্ময়ে দেখলো, জেকের আলীর লাঠি ছুটে গিয়ে দশহাত শূন্যে উঠে বন্ বন্ করে ঘুরছে, জেকের আলীর হাত খালি। লাঠি বাগিয়ে নওজোয়ানটি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

আঁতকে উঠে জেকের আলী পিছিয়ে এলো কয়েক হাত। নওজোয়ানটির লাঠির ঘা এখনই তার পিঠের উপর পড়বে ভয়ে সে পেছনে ছিটকে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু নিরস্ত্রকে আঘাত করতে নওজোয়ানটি এগুলো না। জেকের আলীর সঙ্গীরা আর একখানা লাঠি সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ে দিলো জেকের আলীর দিকে। লাঠি পেয়ে জেকের আলী এবার বাঘের মতো চড়াও হলো নওজোয়ানটির উপর। নওজোয়ানটি আবার পাল্টা হামলা করামাত্রই দমাদ্দম কয়েক ঘা লাঠি পড়লো জেকের আলীর পিঠে। নওজোয়ানটির লাঠির প্যাঁচ জেকের আলী কিছুমাত্র ছাঁদতে সক্ষম হলো না।

ক্ষেপে গেল জেকের আলী। খেলার নিয়ম-কানুন তামামই লঙ্ঘন করে সে মারা-মারিতে প্রবৃত্ত হলো। নওয়োজানটিকে আঘাত করার জন্যে এলোপাথারী লাঠি চালাতে লাগলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জেকের আলীর লাঠি নওজোয়ানটির কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না। বরং নওজোয়ানটির লাঠির দুরন্ত এক ঘায়ে জেকের আলীর লাঠিখানা ভেঙ্গে দু'খণ্ড হয়ে দুই দিকে ছিটকে গেল।

পুনরায় চমকে উঠলো জেকের আলী। আতঙ্কের উপর আবার পিছু হটতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে জমিনের উপর শাটপাট হয়ে পড়ে গেল।

বিপুল উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা। সাবাস্-সাবাস্ রবে নওজোয়ানটির তারিফে তারা আসমান জমিন প্রকম্পিত করে তুললো। আঙ্গিনার বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত জনতার উল্লাসের প্লাবন ছুটতে লাগলো।

তারিফে মুখর হয়ে বাহার খাঁও বিপুল আবেগে নেমে এলেন বারান্দা থেকে। একখানা লাঠি হাতড়িয়ে নিয়ে তিনি আপন খেয়ালে বলে উঠলেন—মারহাবা-মারহাবা। সত্যিই তুমি বাহাদুর। লেকেন আ-যাও মেরা পাস্। তোমার বাহাদুরীর শেষটা একটু দেখি—

বাহার খাঁ লাঠি হাতে নওজোয়ানকে হামলা করতে গেলে আবার শুরু হলো লড়াই। এবার আর বাঘে-মহিষে নয়, একদম সিংহে সিংহে। অনেকক্ষণ যাবত টিকে রইলো এ লড়াই। এরপর এক সময় বাহার খাঁর হাত থেকেও তাঁর লাঠিখানা ফসকে জমিনে পড়ে গেল।

আবার উল্লাসে মুখর হলো জনতা। থমকে গেলেন বাহার খাঁ। লাঠিখানা আর কুড়িয়ে নিতে না গিয়ে তিনি দুইহাত প্রসারিত করে অপরিসীম আবেগে বলে উঠলেন —উস্তাদ-উস্তাদ, বিলকুল উস্তাদ। আঁ-যাও মেরে উস্তাদ, সিনা মিলাও হামারা সাথ্—

বলেই তিনি ছুটে গিয়ে নওজোয়ানটিকে পরম স্নেহে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার মাথায় মুখে পর পর কয়েকটি চুমো খেলেন। নওজোয়ানটিও হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বাহার খাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লো ও পরম শ্রদ্ধায় তাকে কদমবুঁচি করতে লাগলো।

www.pathagar.com

উপস্থিত আপামর জনসাধারণ এই আসমানি দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেল। তারা নানাজন নানা ভাষায় খোশ প্রকাশ করতে লাগলো।

দহলীজের ভেতরে তখন রোকসানা ও সাবিহা আনন্দে আত্মহারা। তাদেরই সামলানো এবার দায় হয়ে গেল। অপর দিকে সিতারা বানু ক্ষোভে ও অপমানে লাল হয়ে উঠলো এবং কান্নার বেগ চাপতে চাপতে দৌড় দিয়ে পালালো।

কদমবুঁচিরত নওজোয়ানকে তুলে পুনরায় বুকের সাথে চেপে ধরলেন বাহার খাঁ। দরদভরে বললেন—আজ আর তোমাকে ছেড়ে কথা নেই বাহাদুর। তুমি আজ আমার মেহমান-জরুর মেহমান। তোমার নামটা কি ভাই?

নওজোয়ানটি স্মিত কণ্ঠে বললো—নূরউদ্দীন।

বাহার খাঁর মকানে মেহমানদারীর জোর আনযাম শুরু হয়েছে। খাসী মেরে খাওয়া। একজন উস্তাদ নওজোয়ানকে শিষ্য রূপে পাওয়ার আনন্দে উস্তাদ বাহার খাঁ আত্মহারা হয়ে গেছেন। নওজোয়ানটির আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। পয়সা খরচ করে মেহমানদারী করছেন।

মেহমান শুধু নূরউদ্দীন একাই নয়। জিহাদের সমর্থক কিছু গণ্যমান্য লোক, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব সহকারে জেকের আলী, বাহার খাঁর অন্যান্য শিষ্য সাগরেদ ও মহড়ায় উত্তীর্ণ লাঠিয়ালগণ সকলেই আজ মেহমান। এদের সবাইকে দাওয়াত করেছেন বাহার খাঁ। মেহমানদের নিয়ে তিনি বাহির বারান্দায় বসেছেন আর খোশ আলাপ করছেন। পাক হচ্ছে অধিকটা বাইরে আর খানিকটা অন্দরে।

জেকের আলীরা আসার পরেই বাহার খাঁ নূরউদ্দীনের সাথে তাদের মিল করে দিয়েছেন। মূল্যবান নসিহতের মাধ্যমে জেকের আলীদের মধ্যে তিনি পরিবর্তন এনেছেন এবং নূরউদ্দীনের প্রতি তাদের আন্তরিক করে তুলেছেন। খেলোয়াড় মাফিক মনোভাব নিয়ে জেকের আলীরা এখন নূরউদ্দীনের বন্ধু হয়ে উঠেছে আর বিগত দিনগুলোর ঐ অহেতুক ভুলের জের খতম করে দিয়েছে।

দিন দু'য়েক আগে পূর্নিমা হয়ে গেছে। অল্প রাতেই বাহার খাঁর বাহির বারান্দায় ঢেলে পড়েছে চাঁদের আলো। এর সাথে ঘরে-বাইরে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকায়, দিন বরাবর মনে হচ্ছে চারদিক। মনের আনন্দে বাহার খাঁ মেহমানদের সাথে বসে গল্প-গুজব করছেন।

পাকশাকে বিলম্ব আছে অনেকখানি। তাই অনেক বিষয় নিয়েই তাদের গল্প-আলাপ চলছে। খেলার কথা, জিহাদের কথা, দেশের কথা, দশের কথা, মায় ভূৎ-প্রেত-জ্বীন-পরীর কথা নিয়েও কথা বলছেন অনেকে। জমে উঠেছে আলাপ ঠাট্টা।

এরই মাঝে জেকের আলীর সঙ্গী বরকতুল্লাহ বলে উঠলো ওহো, আর এক খবর কি রাখেন আপনারা কেউ?

সকলের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হলো। মেহমানদের একজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আর এক খবর মানে?

www.pathagar.com

নূরউদ্দীনের প্রতি ইঙ্গিত করে বরকতুল্লাহ বললো—আমাদের এই নয়া দোস্তের আর একটা মস্তবড় গুণের কথা কেউ কি আপনারা জানেন?

ঃ না তো! কি সেটা?

ঃ ঐ যে আমাদের ঐ ভূতুড়ে বটতলা থেকে অনেক রাতে একটা বাঁশীর সুর কেউ কি আপনারা শুনেননি?

অনেকেই এক সাথে বললেন—হ্যাঁ- হ্যাঁ, দিন কয়েক আগে পর পর কয়েক রাত শুনেছি। বড়ই মনমাতানো সুর। মন উদাস করে দেয়। কিন্তু তার সাথে এই নূরউদ্দীন সাহেবের—

বরকতুল্লাহ ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠলো—ইনিই তো সেই লোক। মানে, ইনিই সেই বাঁশীওয়ালা। ইনিই ওখানে বাজিয়েছেন বাঁশী।

সকলেই ঘুরে বসলেন নূরউদ্দীনের দিকে। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাহার খাঁ বললেন—সেকি! সেকি! তাহলে তো সত্যিই এক তাজ্জব খবর! এত মধুর আর হৃদয়গ্রাহী সুরটা আমাদের এই নয়া বাহাদুরীই কয়রাত ধরে শুনালো আমাদের?

ঃ জি- জি। তো আর বলছি কি?

জেকের আলী সহকারে বরকতুল্লাহর অন্যান্য সঙ্গীরাও সাথে সাথেই বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনিই-ইনিই।

বাহার খাঁ বললেন—বলো কি তোমরা? বাঁশীতেও হাত এর এতটা নিপুণ? মানে এখানেও সে মস্তবড় এক উস্তাদ?

জেকের আলী বললো—জি উস্তাদ, জি-জি। আমরাই পয়লা সেটা আবিষ্কার করেছি।

ঃ এও কি সম্ভব? লাটি আর বাঁশি একেবারেই দু'টো দু' বিপরীতধর্মী ব্যাপার! এমন অসম্ভবটাও সম্ভব হয়েছে এর হাতে?

ঃ তাইতো হয়েছে উস্তাদ। জাজ্জিল্যমান ঘটনা, সন্দেহের আর অবকাশ কোথায় এখানে। সরজমিনে আমরা তা আবিষ্কার করেছি।

উপস্থিত মেহমানদের একজন সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন—ব্যস্-ব্যস্। তাহলে আর কোন কথা নেই। আমরা তার বাঁশী শুনবো।

অন্য একজন বললেন—তোফা প্রস্তাব! এমন উমদা জিনিস ফেলে রেখে ফালতু খোশ গল্প আর নয়। বাঁশীই শুনতে চাই।

সকলেই একবাক্যে সমর্থন দিয়ে বললেন—ঠিক-ঠিক। বাঁশীই শুনবো এখন। নূরউদ্দীন সাহেব, আমাদের আরজ কবুল করুন। অনুগ্রহ করে কবুল করুন। শুনান আমাদের কিছুক্ষণ।

প্রবল এই চাপের মুখে নূরউদ্দীন আর আপত্তি করে কুলিয়ে উঠতে পারলো না। একজন দৌড়ে গিয়ে শাহ সাহেবের বাড়ী থেকে তার বাঁশীটা এনে দিলে নূরউদ্দীন বাজাতে শুরু করলো। প্রথমে দুই একটা উল্টা পাল্টা ফুঁ দিয়ে সে তার অন্তরের সেই সুরটাই ধরলো এবং হৃদয় ঢেলে গান তুললো বাঁশীতে—

"মরেছি তোমারে হেরিয়া ক্ষণিক, মরতেছি ফের খুঁজিয়া—
কোথায় লুকালে তুমি কোথায়—
ওগো তুমি কোথায়—"

www.pathagar.com

সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এলো বারান্দায়। কিন্তু কেঁপে উঠলো বাহার খাঁর অন্দর মহল। রোকসানা ফিরদৌস তার ভাবীর সাথে পাকশাকে মশগুল হয়েছিল। আবেগ ও পুলকের দোলা ছিল দীলে। তার পছন্দের লোকটি লড়াইয়ে জয়ী হওয়ায় আর সেই লোক মেহমান হয়ে তাদের বাড়িতে আসায়, রোকসানা ফিরদৌস উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সে ছুটোছুটি করে পাকশাকের যোগান দিয়ে ফিরছিল।

পানির পাত্র হাতে নিয়ে এই সময় সে তার ভাবীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। অকস্মাৎ বাঁশীর আওয়াজ কানে যেতেই আর সেই সুরটাই ধ্বনিত হয়ে উঠতেই থপ করে পানির পাত্র তার হাত থেকে পড়ে গেল। অপরিসীম বিস্ময়ে ক্ষণিকের তরে সে বেহুঁশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর, বাঁশীটা তাদেরই বাহির বারান্দায় বাজছে—এটা অনুধাবন করা মাত্র নিজের অজ্ঞাতেই 'ভাবী' বলে এক আবেগপূর্ণ আওয়াজ দিয়ে উঠে সে দহলীজের দিকে দৌড় দিলো।

ঐ একই সুরে বাঁশী বাজতে শুনে তার ভাবী রাবিয়া বেগমও তাজ্জব বনে গেল। রোকসানার পিছে পিছে সেও দ্রুতপদে দহলীজে চলে এলো।

দহলীজে ছুটে এসে কে ঐ বাঁশীওয়ালা, ঐ সুরে যে বাঁশী বাজায় সে লোকটা কে-এটা দেখার জন্য রোকসানা ফিরদৌস বাহির দিকের জানালায় চোখ লাগালো। সে লোকটা নাকি এক ত্যান্দর লোক, কোন্ এক বদমতলব নিয়ে নাকি সে এ এলাকায় এসেছে, ত্যান্দর লোক তো এখানে এলো কি করে—এমন হাজারটা প্রশ্ন তখন রোকসানার দীলে।

জ্যোৎস্নায় ও প্রদীপে বাহির বারান্দা একদম দিন বরাবর ফর্সা। চোখ লাগিয়ে রোকসানাকে কসরত করতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেলো বাঁশীওয়ালাকে। দেখতে পাওয়ার সাথে সাথেই তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। ক্ষণিকের তরে সে অবশ হয়ে গেল। সারাবিশ্বের বিস্ময় এসে চেপে ধরলো তাকে। সে দেখলো, সে বাঁশীওয়ালা অন্য কেউ নয়। কোন ত্যাঁদর-বাঁচর নয়। তারই চোখে ধরা, তারই মনে লাগা সুপুরুষ নূরউদ্দীনই সেই বাঁশীওয়ালা! বাঁশী বাজাচ্ছে তারই পছন্দের জন নূরউদ্দীন। আজকের এই নূরউদ্দীনই তাকে আকুল করা সেই বাঁশীওয়ালা!

আনন্দের আধিক্যে রোকসানা ফিরদৌস দিশেহারা হয়ে গেল। বিপুল আবেগে সে ছটফট করে উঠলো। কি করবে, কি বলবে, স্থির করতে না পেরে সে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো, তার ভাবীও তার পেছনে দাঁড়িয়ে নূরউদ্দীনকে দেখছে।

মুহূর্তে রোকসানা শরম-সংকোচের উর্ধে চলে গেল। 'ভাবী' বলে চাপা অথচ আকুল কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে সে ছিটকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাবিয়া বেগমের বুকে। রাবিয়াকে সবলে আঁকড়ে ধরে আবেগে ও আনন্দে সে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

৩

পর পর আরো ক'দিন মুজাহিদ নির্বাচন করা মহড়া অব্যাহত রইলো। সেই থেকেই বাহার খাঁ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত আছেন। জিহাদ আন্দোলনের বাংলার প্রতিনিধি

www.pathagar.com

মৌলভী ইমামউদ্দীন ও নজীবুল্লাহ সাহেবেরা ইতিমধ্যে আবার ইয়ারপুরে এসেছিলেন। তাকিদ দিয়ে গেছেন তারা। পক্ষকালের মধ্যেই মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করার জন্যে বাহার খাঁকে তারা অনুরোধ করে গেছেন।

বাংলার বিভিন্ন এলাকায় আরো অনেক মুজাহিদ দল প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কোন কোন দল, অর্থাৎ মুজাহিদ বাহিনী, ইতিমধ্যেই পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। বাংলা মুলুক সহকারে পূর্বাঞ্চলের সকল মুজাহিদদের জন্যে পাটনায় উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এদিকের তামাম মুজাহিদ বাহিনীকে প্রথমে পাটনার উপকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হতে হবে। সমস্ত বাহিনী সেখানে গিয়ে জমায়েত হলে, উপকেন্দ্রের পরিচালক, অর্থাৎ পাটনার জিহাদ নেতা মৌলভী বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী ও মৌলভী মাজহার আলী সাহেবেরা মুজাহিদদের সাইয়্যীদ আহমদ ব্রেলভীর কাছে রায় বেরেলীতে নিয়ে যাবেন।

এ কারণে বাহার খাঁ খুবই ব্যস্ত আছেন কয়দিন ধরে। বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হলে দল গঠনের পালা। তবে বাছাই করার ঝামেলাটাই বড় ঝামেলা। এ বড় ঝামেলায় ব্যাপৃত আছেন তিনি।

বাছাইয়ের কাজ শেষ হলো। বাহার খাঁর ব্যস্ততা খানিক শিথিল হয়ে এলো। এই ফাঁকে বাহার খাঁর বিবি রাবিয়া বেগম শক্তভাবে ধরে বসলো বাহার খাঁকে।

রোকসানার আকুলতায় তার অন্তরের আকিঞ্চন রাবিয়া বেগমের কাছে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সে রোকসানাকে শাসন করার চেষ্টা করলো। কিন্তু রোকসানা একেবারে আওয়ারা হয়ে উঠায় আর শাসন-সতর্কতার ঊর্ধে উঠে যাওয়ায়, রাবিয়া বেগম বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলো।

গভীরভাবে সে চিন্তা করে দেখলো, ভুলটা তাদেরই। এটাকে এভাবে উপেক্ষা করে যাওয়াটা কোনক্রমেই উচিত হচ্ছে না তাদের। বয়স হয়েছে রোকসানার। একদিন না একদিন শাদি তাকে অল্প দিনেই দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নূরউদ্দীন শুধু যোগ্য পাত্রই নয়, অত্যন্ত লোভনীয় পাত্র। সর্বগুণে গুণবান সৎবংশের ছেলে। যে কেউ যখন তখন লুফে নেবে তাকে। ওদিকে আবার রোকসানার সাথে মানাবেও তাকে চমৎকার।

এমন পাত্রের সাথে রোকসানার শাদি দেয়ার কথাটা তারা যদি আদৌ না ভাবে, উল্টো আরো উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আর কার সাথে তারা শাদি দেবে রোকসানার? এমন পাত্র তো দূরের কথা, প্রয়োজন কালে, এর অর্ধেক যোগ্যতা সম্পন্ন পাত্রও তো হাতড়িয়ে তারা পাবে না।

সমঝে গেল রাবিয়া। বাহার খাঁর কর্মব্যস্ততা খানিকটা হালকা হয়ে এলেই সে তার খসমকে ধরে বসলো শক্তভাবে। রোকসানার ইচ্ছে-আকাঙ্খার কথা বাহার খাঁর কানে দিয়ে, এই সমস্ত বিবেচনার দিকগুলো বুঝিয়ে বললো তাকে। শুধু বুঝিয়েই বললো না, সময় আর সুযোগ থাকতেই নূরউদ্দীনের সাথে রোকসানার শাদির ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে সে স্বামীর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলো। সেই সাথে সে আরো বললো—নূরউদ্দীন জিহাদে যাবে, যাক। জিহাদ থেকে সহিসালামতে ফিরে আসার পরই শুভকাজ সুসম্পন্ন করা যাবে। আমরা তাকে এখনই আটকিয়ে না

www.pathagar.com

ফেললে, যে কেউ তাকে ইতিমধ্যে আটকিয়ে ফেলতে পারে। বর হিসেবে সে তো কারো কম লোভনীয় নয় ?

কথাটা মনে ধরলো বাহার খাঁর! তার অবচেতন মনে এমনই একটা চিন্তা-ভাবনা ইদানিং দানা বেঁধে উঠছিল। বিবি সাহেবার কথা তিনি সাগ্রহেই গ্রহণ করলেন এবং এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কথাটা সরাসরি নূরউদ্দীনের কাছে তোলা ঠিক হবে না বুঝে, তিনি সেদিকে গেলেন না। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে নূরউদ্দীনের স্থানীয় অভিভাবক শাহ সাহেবের সাথে কথা বলাই তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন।

দু' একদিনের মধ্যেই বাহার খাঁ এক ফাঁকে নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবের মকানে এসে হাজির হলেন। বাহার খাঁকে দেখে নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব খোশদীলে তাকে এনে দহলীজে বসালেন। কুশলাকুশল নিয়ে কিছু কথা বলার পর শাহ সাহেব বললেন —তা বাপজান, হঠাৎ এদিকে কি মনে করে ? বেশ কয়দিন ধরে তোমার কোন খবর বার্তাই নেই!

বাহার খাঁ সসম্ভ্রমে বললেন—খুবই ব্যস্ত আছি চাচা। মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা নিয়ে এতোই পেরেশান আছি যে, নাওয়া খাওয়ার সময়টাও ঠিক মতো করে উঠতে পারিনে।

ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, শুনেছি। সেই জন্যেই কি তাহলে আমার কাছে এসেছো বাপজান ? মানে নূরউদ্দীন জিহাদে যাবে সেই কথা নিয়ে ?

বাহার খাঁ থতমত করে বললেন—এ্যাঁ ? হ্যাঁ, সে এযাজত নেয়ার অবশ্যই জরুরত আছে। আপনিই তার স্থানীয় অভিভাবক। আপনার আপত্তি থাকলে তো—

শাহ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—কোন আপত্তি নেই—আমার কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া, আমার আপত্তি-সম্মতির প্রশ্নও এখানে একেবারেই গৌণ বাপজান। ও নিয়ে ভেবো না।

বাহার খাঁ থমকে গিয়ে বললেন—চাচা!

শাহ সাহেব বললেন—নূরউদ্দীন নিজেই তার নিজের অভিভাবক। আমার এখানে দু'দিন বেড়াতে এসেছে, এই যা।

ঃ তবু তো তার মাতাপিতারা কেউ এখানে নেই যে, তাদের আমি জানাবো। আপনাকেই এটা আমার অবহিত করা প্রয়োজন।

ঃ কোন সমস্যা নেই। তার মাতাপিতারাও এ নিয়ে কেউ ব্যতিব্যস্ত হবেন না। ওর নিজের যেটা ইচ্ছে সেইটেই ও করুক, এইটেই তার মাতাপিতারা চান। ওদিকে আবার নূরউদ্দীনও ডানপিটে ছেলে। দুরন্ত ও দুঃসাহসী। একেবারেই অকুতোভয়। এ কাজে তার মনও লাগবে আর বিপুল নামযশও করতে পারবে।

বাহার খাঁ খোশকণ্ঠে বললেন—তাই নাকি ? যাক, তাহলে এক চিন্তা গেল। কিন্তু আর একটা কথা নিয়েও যে আমি আপনার কাছে এসেছি চাচা ?

ঃ আর একটা কথা!

ঃ মানে খোলাখুলিই বলি, একটা শাদির পয়গাম নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে আপনার সাথেই আলাপ আলোচনা করার জন্যে এসেছি।

www.pathagar.com

ঃ শাদি! কার সাথে কার শাদি ?

ঃ আমার বোন রোকসানা ফিরদৌসকে আপনি চেনেন, জানেন, দেখেছেন। তারই শাদির ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

ঃ কেন, আমার সাথে কেন ?

নজরটা জমিনের দিকে নিয়ে বাহার খাঁ সসংকোচে বললেন—কথা হলো, আপনাদের নূরউদ্দীনের সাথে রোকসানার শাদিটা দেয়া যায় কিনা, এই নিয়ে প্রথম পর্যায়ে আপনার সাথেই আলাপ করতে চাই। মেহমান হোক আর যাই হোক, নূরউদ্দীনের আপন লোক বলতে তো এ গাঁয়ে একমাত্র আপনিই। আপনার সমর্থন উৎসাহ পেলে, আপনার নির্দেশ মতোই পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা নেবো।

এ কথায় নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন। প্রস্তর মূর্তির মতো নির্বাক হয়ে তিনি শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। জবাবে কোন কিছুই বললেন না।

জবাবের আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহার খাঁ চোখ তুলে শাহ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েই দমে গেলেন। দেখলেন, শাহ সাহেবের মুখমণ্ডলের তামাম আলো নিভে গেছে। তা দেখে বাহার খাঁ ইতস্তত করে বললেন—কি ব্যাপার চাচা ? আপনি যে একদম নীরব হয়ে গেলেন।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে শাহ সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কি বলবো বাপজান ? এমন এক অসম্ভব প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি এসেছো যে, কেবলই নিরুৎসাহ করা ছাড়া এ ব্যাপারে কিছুমাত্র উৎসাহ আমি দিতে পারবো না তোমাকে।

ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বাহার খাঁ বললেন—অসম্ভব কেন চাচা ? আমাদের ঘর পছন্দ মাফিক নয় বলে ?

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে শাহ সাহেব বললেন—তওবা-তওবা! ঘর তোমাদের পছন্দ মাফিক নয় মানে ? বংশে গৌরবে, অর্থে-বিত্তে, মানে-সম্মানে, কার কাছে খাটো তোমরা ? তোমাদের ঘর অপছন্দ করবে, এতবড় নবাব বংশ কয়টা আছে এদেশে ?

ঃ তাহলে ? আমার বোনটা তেমন সুন্দরী নয় বলে কি ?

ঃ একি বলছো বাপজান ? গায়ের রংটা কিঞ্চিৎ শ্যামলা কিসিমের হলেও তার গড়ন-গঠন আর মুখাকৃতি এতই উৎকৃষ্ট মানের যে, এমন আকর্ষণীয় মেয়ে দশ হাজারে একটা পাওয়া ভার। মুখটাতো তার একদম শিল্পীর হাতে খোদাই করা মুখ। মুখের এমন নিখুঁত গড়ন আমার তো আর চোখে পড়েনি কোথাও ?

ঃ তাহলে ? তাহলে বাধাটা আর কোথায় ?

ঃ বাধা ঐ নূরউদ্দীন নিজেই।

ঃ চাচা!

ঃ তার হাজারটা গুণই এখন দেখতে পাচ্ছো তোমরা। তার মস্তবড় বদগুণটা এখনও দেখতে পাওনি। সে যেমনই খেয়ালী, তেমনই জেদী।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ কোথায় কোন মেয়েকে সে আগে থেকেই পছন্দ করে রেখেছে। আর সেই

www.pathagar.com

থেকেই জিদ ধরে আছে, ঐ মেয়েকে ছাড়া তাকে কেটে ফেললেও আর অন্য কোন মেয়েকে শাদি সে করবে না। বাস্তবটা স্বীকার করতে দোষ কি ? আমার রোকসানা আম্মার চেয়েও তো আরো অনেক সুন্দরী মেয়ে এ দুনিয়ায় আছে ? সেই রকম অনেক সুন্দরী মেয়ের সাথে তাকে শাদি দেয়ার জন্যে তার বাপ-ভাইয়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তবু পারেননি। এখনও নাকি তল্লাট উজালা করা দুইটে মেয়ে তারা ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু নূরউদ্দীন অনড়। অন্য আর কাউকে শাদি সে করবে না।

ঃ বলেন কি ?

ঃ এ শাদি করার ভয়েই তো বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে সে এখানে এসে আছে। শাদির জন্যে তার বাপ ভাইয়েরা যদি তার উপর চাপ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে নূরউদ্দীনের ছায়াটিও এ অঞ্চলের কেউ কখনো দেখতো না।

ঃ চাচা!

ঃ যে কারণে সে তার নিজের এলাক্কা ছেড়েছে, সেই কারণটা এখানে আবার পয়দা হলে দেখবে, নূরউদ্দীন আর এই ইয়ারপুরের ত্রিসীমানায় নেই!

বাহার খাঁ ভড়কে গেলেন। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—তাজ্জব! তাই নাকি চাচা ?

ঃ হ্যাঁ বাপজান! সেক্ষত্রে আমার নসিহত হলো, আর যাই করো, শাদির কোন প্রস্তাব যেন তার কানে পৌঁছিও না। তাহলে এই যে এত আপন করে তাকে তোমরা পেয়েছো, তোমার দলের একান্ত একজন হয়ে তোমাদের সাথে মিশে গেছে, এসব তামামই ভেস্তে যাবে। শুধু তোমার মকানই নয়, এই ইয়ারপুরের গাঁটাই সে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করবে। ভুলেও আর এদিকে আসবে না।

বাহার খাঁ তার আগ্রহ ও ইরাদা গুটিয়ে নিলেন। তিনি সতর্ক কণ্ঠে বললেন —তাই ? তাহলে তো আপনার সাথে কথা বলতে এসে আমি ঠকিনি চাচা ? এটা না জানলে তো সত্যিই এ মস্তবড় অঘটনটা ঘটে যেতো। তাকে কেন্দ্র করে আমার দলটা আমি যেভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি আর যে আন্তরিকতা তার সাথে আমাদের ইতিমধ্যেই পয়দা হয়েছে—সবই নষ্ট হয়ে যেতো।

ঃ বাপজান!

ঃ বোনের শাদি যেখানে হোক দেয়া যাবে। কিন্তু তার এ নির্মল আন্তরিকতা আর সহযোগিতা তো আমি হারাতে পারিনে।

ঃ আমারও কথা তাই বাপজান। তোমার বনের শাদি দেখেশুনে তোমরা অন্যখানে দাও। ও যাকে পছন্দ করে রেখেছে তাকেই সে শাদি করুক। আমাদের এই গাঁয়ের সাথে, বিশেষ করে তোমার আর তোমার পরিবার-পরিজনদের সাথে, তার আন্তরিকতাটা টিকে থাকুক।

ঃ ঠিক চাচা, ঠিক। তাকে আমি আমার একটা ভাইয়ের মতো পেয়েছি। তার সাথে বোনের শাদি আর দরকার নেই। আমার বোনের আর একটা ভাই হয়ে সে থাক আর আমাদের সাথে তার এ হৃদ্যতা বজায় থাক, তাহলেই আমি খুশী।

নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব বাহার খাঁর এ সৎ-আন্তরিকতার তারিফ করলেন। বাহার খাঁ এরপর অল্প কথায় বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

যে উৎসাহ নিয়ে বাহার খাঁ শাহ সাহেবের সাথে আলাপ করতে গেলেন, সে উৎসাহ অটুট রাখতে না পারলেও তিনি যখন মকানে ফিরে এলেন তখন তার চোখে মুখে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। তা দেখে তার বিবি রাবিয়া বেগম আশান্বিত হয়ে উঠলো। বাহার খাঁ এসে ঘরে ঢুকলে, ফলাফলটা জানার জন্য রাবিয়াও ঘরে এসে ঢুকলো।

আড়ালে আবডালে থেকে রোকসানাও সব খবর রেখেছিল। সেও ফলাফলটা জানার জন্যে এসে ঘরের বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো।

রাবেয়া এসে শাহ সাহেবের মতামতটা জানতে চাইলে, বাহার খাঁ তাকে ডেকে খাটের উপর বসালেন এবং আগাগোড়া সব কথা ব্যাখ্যা করে শুনালেন। এরপর বললেন—যেটুকু পেয়েছি এই ঢের। বিশেষ করে আমার মুজাহিদ বাহিনীর জন্যে ঢেরের উপরও ঢের। কাজেই এই টুকুই বজায় রাখার চেষ্টা করো অধিক আগ্রহী হয়ে উঠলে, আমও যাবে ছালাও যাবে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে রোকসানা ফিরদৌস বাহার খাঁর প্রতিটি কথাই সুস্পষ্টভাবে শুনলো। বস্তুত তাকে শোনানোর জন্যে বাহার খাঁ তামাম কথা স্পষ্ট করে উচ্চকণ্ঠে বললেন। সব কথা শুনার পর রোকসানা ফিরদৌস কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দুনিয়াটা তার সামনে ফাঁকা হয়ে গেল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এলো।

রোকসানা ফিরদৌস এরপর অনেকখানি মনমরা হয়ে থাকলেও এ নিয়ে আর তেমন উচ্চবাচ্য করলো না। দীলের ব্যথা আর মনের কথা সে তার দীলেই চেপে রাখলো।

বাহার খাঁ সহকারে সকলের কর্মব্যস্ততা আবার বেড়ে গেল। দল গুছানোর কাজ এখন শেষের দিকে। সেপাই শ্রেণীর লোকজন ডেকে এনে প্রাথমিক কিছু প্রশিক্ষণও মুজাহিদদের ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে নূরউদ্দীনই এ বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত হয়েছে। বাহিনী নিয়ে সে-ই আগে পাটনার দিকে যাবে। পরবর্তী মুজাহিদ ও সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাহার খাঁ এর পরে পরেই রওনা হবেন।

এর ফলে কাজ বেড়েছে নূরউদ্দীনেরই বেশি। বাহিনীর তদারকে এখন তাকে সবসময়ই বাহার খাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। খাওয়া দাওয়াও অনেক সময় বাহার খাঁর বাড়িতেই তাকে সেরে নিতে হয়। নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবের বাড়িতে অধিকক্ষণ থাকার সময় তার আর এখন নেই।

বাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার সময় এসে হাজির হলো। আগামীকালই রওনা হওয়ার দিন। কাপড়চোপড় পরিষ্কার করার আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার কাজে নূরউদ্দীন আজ শাহ সাহেবের বাড়িতেই একবেলা আটকে রইলো। বাহার খাঁর বাড়িতে আর মুজাহিদদের কাছে যাওয়ার সময় করতে পারলো না। দুপুরের আহারের পরেই তাই সে আবার বাহার খাঁর বাড়ির দিকে দৌড় দিলো।

খাঁ-খাঁ দুপুর। আহারের পর গ্রামবাসীরা ধনী গরীব প্রায় সকলেই ক্ষণিকের

www.pathagar.com

বিশ্রাম তরে গৃহকোণে ঠাঁই নিয়েছে। নেহায়েত জরুরি কাজ ছাড়া এ সময় লোকজনের বাইরে আনাগোনা তেমন একটা নেই। কিছু বেয়াড়া ছেলেরাই এই ভরদুপুরে হেথা হোথা দৌড়ঝাপ করে বেড়াচ্ছে।

বাহার খাঁর বাড়িতেও সকলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। মুজাহিদদের জন্যে বাহার খাঁর বাড়ির বিপরীত দিকে এক ছায়া ঘেরা ভিটেয় ছাউনি ফেলা হয়েছে। মুজাহিদদের সবাই এখন ঐ ছাউনীতে আছেন। বাহার খাঁর বাহির আঙ্গিনা হয়ে ঐ ছাউনিতে যাওয়ার পথ। নূরউদ্দীন ঐ ছাউনির দিকে ছুটছে।

বাহার খাঁর বাহির আঙ্গিনায় এসে নূরউদ্দীনের হঠাৎ খেয়াল হলো, বাহার খাঁর সাথে জরুরি একটা কথা বলা প্রয়োজন। ঘুমিয়ে না থাকলে, কথাটা এখনই বলতে পারলে ভাল হয়। এ কারণে সরাসরি ছাউনিতে না গিয়ে সে এক পা দু'পা করে বাহার খাঁর দহলীজের বাহির বারান্দায় উঠে এলো। কিন্তু গোটাবাড়ী নিঃঝুম নিস্তব্ধ। নূরউদ্দীন থমকে গেল। একটুখানি ভাবলো। দহলীজের বাহির দিকের জানালা দু'টো বিলকুল খোলামেলা। একটা জানালার পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় শূন্যের উপর ডাকাডাকি করাটা সে সমীচিন বোধ করলো না। এটা দহলীজ, কোন জেনানা মহল নয়। তাই, দহলীজের ভেতরে কেউ আছে কিনা তা দেখার জন্যে আস্তে আস্তে জানালার কাছে এগিয়ে এলো। কেউ থাকলে সে তার মারফত খোঁজ নেবে—বাহার খাঁ সাহেব জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন।

কিন্তু দহলীজ হলেও এটা একটা ঘর। বলা যায় না ভেতরে কে কিভাবে আছে। তাই জানালার কাছে এসে নূরউদ্দীন একপাশ থেকে সসংকোচে নজর দিলো জানালাতে।

নজর দিয়েই নূরউদ্দীন বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে গেল। যারপরনাই চমকেই সে উঠলো না, নিজের অস্তিত্বটাই বিলকুল সে হারিয়ে ফেললো তৎক্ষণাৎ। নজর দিয়ে নজর আর সে ফিরিয়ে নিতে পারলো না। ভেতর থেকে জানালায় মুখ লাগিয়ে ধ্যান মগ্নভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে যেজন, তাকেই নূরউদ্দীন খুঁজে মরছে এ যাবত। 'কোথায় লুকালে, তুমি কোথায়,' বলে তারই জন্যে হুতাশ করে ফিরছে।

নূরউদ্দীনের মানসচোক্ষে এক রোমাঞ্চকর অতীত ঝিলিক দিয়ে গেল। মাস ছয়েকের অল্প কিছু আগের কথা। ইয়ারপুরের নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব কয়েক বছর ধরেই ইয়ারপুরে বেড়াতে আসার জন্য নূরউদ্দীনকে বারংবার অনুরোধ আহ্বান জানাচ্ছিলেন। নূরুদ্দীনের মামার বাড়িতে এই শেষের বারে এসে তো তিনি রীতিমতো পীড়াপীড়িই করে গেলেন। নূরউদ্দীনও অবশেষে ধরাবাধা কথা দিলো, যাবেই সে সময় করে একবার।

ইতিমধ্যে নূরউদ্দীনের বাপভাই নূরউদ্দীনের জন্যে পাত্রী দেখতে লাগলেন। নূরউদ্দীনকে শাদি দেয়ার জন্যে তারা আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। নূরউদ্দীনের মন এতে খারাপ হলো। সে গান গেয়ে, লাঠি খেলে, বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়। চির স্বাধীন জীবন। ঘর ছাড়া মন। তার এ স্বাধীনতা খর্ব হবে, ঘর ছাড়তে গেলেই বেড়ি

www.pathagar.com

পড়বে পায়ে, এসব ভেবে নূরউদ্দীন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তার চেয়েও বড় কথা, কোথাকার কাকে এনে জুড়ে দেবে তার সাথে আর তাকেই আজীবন টেনে বেড়াতে হবে—নূরউদ্দীন এটা কল্পনা করতে পারে না। শাদির প্রতিই বরাবর তার অনিহা, তার উপর এই অবস্থা তার চিন্তার একদম অতীত। শাদির কথা তার কাছে তাই অবাঞ্ছিত কথা। তবু যদি কোনদিন কোন কাউকে মনে ধরে তার, একমাত্র তখনই সে শাদির কথা ভাবতে পারে।

এহেন অবস্থায় শাদির কথা শুনে নূরউদ্দীনের মন উতলা হয়ে উঠলো। বাড়ির হাওয়া বাতাস তার কাছে বিস্বাদ লাগতে লাগলো। বাড়ি ছেড়ে বেরোই বেরোই করতে লাগলো মন তার। কিন্তু বেরিয়ে সে যাবে কোথায় ভাবতেই তার ইয়াদে এলো ইয়ারপুরের শাহ সাহেবের কথা। বাড়ির চাকর-নফরদের কানে কথাটা একটু ফেলে দিয়েই সে ইয়ারপুরে চলে এলো।

বাড়ি ছেড়ে ইয়ারপুরে এসেও তার মন তেমন টিকলো না। দিন কয়েকের মধ্যে সে হাঁপিয়ে উঠলো। আবার উড় উড় করতে লাগলো মন। লাঠি-বাঁশি-গান আর ইয়ার বন্ধুদের কথা মনে উদয় হতেই আবার উঠে দাঁড়ালো নূরউদ্দীন। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিতে লাগলো। শাহ সাহেবের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে ফিরে চললো বাড়ির দিকে।

ইয়ারপুর ছেড়ে খানিকটা পথ এলেই পথের উপর নদী। নদী পার হওয়ার জন্যে নূরউদ্দীন এসে খেয়াঘাটে দাঁড়ালো।

নদীটা কিছু শীর্ণকায় হলেও খুব গভীর ও খরস্রোতা। পথটাও সদর ও গুরুত্বপূর্ণ পথ। লোক চলাচল ছাড়াও গরু-মহিষের গাড়ীর সাথে মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ীও এ পথে চলে। ফলে খেয়াঘাটে পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থাই আছে। প্রশস্থ এক কোশা নৌকার উপর গোটা গোটা বাঁশ পেড়ে পাটাতন বানানো হয়েছে। পাটাতনের উপর আবার বাঁশের কাবারি দিয়ে চাটাইয়ের মতো শক্ত আচ্ছাদন দেয়া হয়েছে। তার উপর খড়বিচালী বিছানো। গাড়ীঘোড়া মানুষজনের আরামে নদী পারের ব্যবস্থা।

নূরউদ্দীন যখন খেয়াঘাটে এলো তখন খেয়াতরী ওপাড়ে। ছইওয়ালা একটা মহিষের গাড়ীসহ জনাদুই পুরুষ আর নেকাব আঁটা জনা তিনেক জেনানা নিয়ে নৌকাটা ওপাড় থেকে এপাড়ে আসার জন্যে সবে মাত্র ছাড়লো। এপাড়ে ঘাটের উপর বড় একটা হিজল গাছ আর গাছটাকে ঘিরে কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া ঝোপঝাড়।

মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। নৌকাটা এপাড়ে আসতে আর নৌকা থেকে গাড়ি নামাতে দেরী হবে দেখে, নূরউদ্দীন হিজল গাছের ছায়ায় এমনই একটা ঝোপের পাশে দাঁড়ালো।

খেয়া নৌকা যথা সময়ে এপাড়ে এসে ভিড়লো। পুরুষেরা গাড়ী নামানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো আর মহিলারা তিনজন নেমে এলো নৌকা থেকে। রোদে ও গরমে তারাও ঘেমে তেঁতে উঠেছিল। নেমে এসেই তারাও এ হিজল গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো।

দু'জন বয়স্কা মহিলা আর একজন তরুণী। বয়স্কা মহিলা দু'জন নেকাব আঁটা অবস্থাতেই ঝোপের একটু ফাঁকে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। তরুণীটি গরমে আর

www.pathagar.com

নেকাব রাখতে পারলো না। লোকের দৃষ্টি আড়াল করার অভিপ্রায়ে সে অনেকখানি ঝোপের মধ্যে ঢুকে এলো এবং মুখের নেকাব খুলে ফেললো।

কড়াই থেকে একদম জ্বলন্ত চুলোয়। দাঁড়াবে তো একটু সরে গিয়েই দাঁড়াও। তা নয়তো নূরউদ্দীন যে একটা পাতা বিরল ছোট্ট ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তরুণীটিও এসে সেই ঝোপেরই কোল ঘেষে দাঁড়ালো এবং মুখের নেকাব খুলে নূরউদ্দীনেরই মুখ হয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলো। দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব হাত দুইয়েকের অধিক নয়। পথে তখন দূর থেকে বিভিন্ন লোক আসছে, রাখাল পাকাল ছুটছে, চিল কাক উড়ছে — এসবের দিকেই নজর রইলো তরুণীটির। তার একান্ত কোলঘেঁষে যে আস্ত একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে দিকে নজর তার গেল না।

রৌদ্র ঝরা দিন। হালকা পাতলা ঝরঝরে ঝোপের ফাঁক দিয়ে অতি সন্নিকটে দণ্ডায়মানা মেয়েটিকে নূরউদ্দীন সুস্পষ্ট ও খোলাসাভাবে দেখতে পেলো। প্রথমে তার ধারণা ছিল, মেয়েটি হয়তো অধিক নিকটে এগুবে না। যখন একেবারেই এগিয়ে এলো, তখন সরবো সরবো করতেই মেয়েটি তারই মুখ হয়ে মুখের নেকাব খুলে ফেললো। আর এতে করেই ঘটে গেল অঘটন। এক ঝলক সেই মুখের দিকে নজর দিয়েই নূরউদ্দীন খুন হয়ে গেল।

সেই মুখের দিকে নজর দেয়ার সাথে সাথে আটকে গেল নূরউদ্দীনের চোখ আর এই আটকাতেই নূরউদ্দীনও আটকে গেল এক দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকে।

মেয়েটি বেশ সুন্দরীই ছিল। আকর্ষণীয়ই ছিল তার গড়ন গঠন অঙ্গসৌষ্ঠব। সুগঠিত মস্তক, সুদীর্ঘ চুল, মায়াভরা চোখ, তরতরে নাক আর সুশ্রী মুখ। অনেকটা শিল্পীর হাতে খোদাই করার মতোই ছিল তার মুখ-চিবুক-ঠোঁট। বিশেষ সৌন্দর্য ছিল তার দু'ওষ্ঠাধরে। ঐ খোদাই করা ওষ্ঠাধরই নূরউদ্দীনকে ধরাশায়ী করে দিলো।

শ্যামলা বরণ আর মাঝারী গড়নের এই মেয়েটি সবার চোখেই মোটামুটি বেশ সুন্দরী বলে বিবেচিত হলেও, নূরউদ্দীনের চোখে এই মেয়েটিই এ বিশ্বের সেরা সুন্দরী রূপে প্রতিভাত হলো। মজে গেল নূরউদ্দীন। ডুবে গেল নিচ্ছিদ্র এক ঘোর মোহের আবর্তে।

স্থান-কাল-পাত্র আর আত্মমর্যাদা বোধ — তামামই ভুলে গেল নূরউদ্দীন। যতক্ষণ মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, নূরউদ্দীন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো নিষ্পলক। চেয়ে রইলো মোহাবিষ্ঠ হয়ে। সত্ত্বাহীন-সম্বিতহীন।

সম্বিতে সে ফিরে এলো মেয়েটি দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে যাওয়ার সময়। নৌকা থেকে গাড়ী নামিয়ে গাড়োয়ান ইতিমধ্যেই গাড়ীটা এনে রাস্তার উপর রাখলো আর গাড়ীতে উঠার জন্যে মহিলাদের ডাক হাঁক করতে লাগলো। ডাক শুনেই মেয়েটি ও মহিলা দুইজন দ্রুতপদে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো এবং ছইয়ের মধ্যে গিয়ে বসলো। মেয়েটি চোখের আড়াল হতেই নূরউদ্দীন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কে এই মেয়ে — কোথাকার মেয়ে — ইত্যাদি জানার জন্যে সে আকুল হয়ে গেল।

গাড়ীতে মহিষ জুড়ে গাড়োয়ানটি কি এক কাজে ঘাটের দিকে দৌড়ে গেল এবং মুহূর্তেই আবার দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে ফিরে আসতে লাগলো। নূরউদ্দীন এ সুযোগ

www.pathagar.com

ছাড়লো না। সেও প্রায় দৌড়ের উপর এসে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলো—আপনাদের বাড়ী কোথায় ভাই?

ব্যস্ত থাকার জন্যে গাড়োয়ান অধিক কথায় গেল না। সে তাড়াতাড়ি জবাব দিলো—ইয়ারপুরে।

নূরউদ্দীন সাগ্রহে বললো—এই ইয়ারপুরে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ঐ মহিলাদের?

ঃ ওদেরও সবার বাড়ী এই ইয়ারপুরে।

ঃ কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

ঃ কুটুমবাড়ী থেকে।

ঃ ঐ যে এক কম বয়সের মেয়ে দেখলাম, তার শ্বশুরবাড়ী থেকে।

গাড়োয়ানটি হাঁটা দিয়ে বললো—আরে দূর। শাদিই হয়নি, ওর আবার শ্বশুরবাড়ী এলো কোত্থেকে?

গাড়ীতে জুড়ে রাখা মহিষ দু'টি ইতিমধ্যেই হাটতে শুরু করলো। গাড়োয়ানটি চমকে উঠে "এই র-র" আওয়াজ দিয়ে দাঁতে জিহ্বায় সঙ্কেত সূচক শব্দ তুলতে তুলতে দৌড়ের উপর গাড়ীর দিকে গেল।

গাড়োয়ান গাড়ীতে উঠেই গাড়ী চালানো শুরু করলো। যথক্ষণ দেখা যায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে নূরউদ্দীন গাড়ীর দিকে চেয়ে রইলো। গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেলে সে সর্জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলো—একি অতুলনীয় রূপ! একি অপরূপ মুখ!

নদী পার হওয়া নূরউদ্দীনের আর তৎক্ষণাৎ হলো না। আবার সে আস্তে আস্তে হিজল তলায় ফিরে এলো। গাছের নীচে বসলো। বসে বসে কেবলই ভাবতে লাগলো, এখন কি করা যায়? মেয়েটিকে আর একবার দেখা যায় কিভাবে? তার চেয়েও মারাত্মক ভাবনা, কারো আপন যখন এখনো হয়নি, তাকে আপন করে পাওয়া যায় কিভাবে? সেই সাথে খেয়াল হলো মেয়েটার নাম জানা হয়নি। গাঁয়ের নামটাই পাওয়া গেছে, কার মেয়ে-কি পরিচয়, কিছুই পাওয়া যায়নি। ইয়ারপুরে ফিরে গেলেই জানা যাবে সবকিছু।

ইয়ারপুরে ফিরে যেতেই তখনই সে আগ্রহী হয়ে উঠলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে উঠবে কোথায়? এ প্রশ্নে আবার সে নিস্তেজ হয়ে গেল। শাহ সাহেবের সবিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও সে গোঁ ধরে চলে এসেছে সেখান থেকে। এখনই আবার সেখানে ফিরে যাবে কোন মুখে? একমাত্র কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সেখানে আবার যাওয়া যায়!

অগত্যা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো নূরউদ্দীন। কয়েকটা দিন কোনমতে কাটিয়ে দিতেই হবে। তারপর আবার ফিরে আসবে ইয়ারপুরে। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বাড়ীর দিকেই রওনা হলো।

নূরউদ্দীন বদলে গেল। বাড়ী থেকে যে নূরউদ্দীন এসেছিল, বাড়ীতে ফিরে গিয়ে নূরউদ্দীন আর সে নূরউদ্দীন রইলো না। বিলকুল আলাদা মানুষ। সবসময়ই চিন্তামগ্ন।

www.pathagar.com

ঐ অপরূপ মুখের চিন্তা। ঐ মুখ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে রইলো। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে-সর্বক্ষণ ঐ মুখ তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো। তাকে হাতছানি দিয়ে টানতে লাগলো। আহার নিদ্রার পরিমাণ তার হ্রাস পেলো বিপুলাংশে। গান বাঁশী খেলাধূলা বাদ পড়লো তামামই। নূরউদ্দীন এখন একা থাকতে ভালবাসে।

এর সাথে ক্রমেই বাড়তে লাগলো তাকে শাদি দেয়ার তৎপরতা। তার বাপ-ভাইয়েরা আরো জোরদারভাবে পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। দাদী নানী বয়সী মহিলারা এসে এক একটা পাত্রীর রূপগুণের এক একটা দশগজী ফিরিস্তি নূরউদ্দীনের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। নূরউদ্দীনের উদাসভাব এতে আরো বেড়ে গেল। আরো অধিক ঘন হয়ে এলো তার স্বপ্ন। ঐ অনবদ্ধ মুখের টান আরো অধিক প্রবল হয়ে নূরউদ্দীনকে টানতে লাগলো। নূরউদ্দীন পুনরায় চলে এলো ইয়ারপুরে।

নূরউদ্দীনকে দেখে নিয়ামতুল্লাহ্ শাহ সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। পুনঃ পুনঃ সাধাসাধি করেও যে নূরউদ্দীন একবার আসে না এলেও ফের দু'দিন বৈ থাকে না, সেই নূরউদ্দীন এত সত্ত্বর আবার এলো দেখে স্বাভাবিকভাবেই তিনি খানিকটা তাজ্জব বনে গেলেন। কিন্তু নূরউদ্দীনকে এবার খুবই উদাসীন দেখে আর তার বাপভাইয়ের প্রবল ইচ্ছের মুখে সে শাদি করতে গররাজী—এই খবর পেয়ে, তার এই পুনরায় আসার কারণ শাহ সাহেব অনুমান করে নিলেন। তবে যে কারণেই হোক, নূরউদ্দীন আবার তার মকানে আসায় তিনি খুশীই হলেন।

কিন্তু নূরউদ্দীন এবার এসে তার মকানে স্থির হয়ে রইলো না। মেয়েটার খোঁজে ইয়ারপুর গোটা গাঁ সে চষে বেড়াতে লাগলো। গাঁয়ের এ মাথা থেকে ও মাথা সে দু'বেলা পাক খেয়ে ফিরতে লাগলো। ঘাটে পথে ও সম্ভাব্য স্থানে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। উদ্দেশ্য, হঠাৎ যদি সে দেখা পায় সেই মেয়েটার।

এতে অবশ্য গাঁয়ের লোক তাকে একজন অসৎ যুবক বলে সন্দেহ করে বসলেন। তার গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রাখলেন সকলেই। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও তার চরিত্রে অসততার কোন চিহ্ন-আভাস কিছুই খুঁজে পেলেন না। ধারণা তাদের পাল্টে গেল। সে একজন পাগল-বাউল মানুষ, এ ধারণাই দীলে তাদের বদ্ধমূল হলো। গাঁয়ের মানুষ আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

হতাশ হয়ে নূরউদ্দীনও খামুশ হয়ে গেল। পক্ষকাল ধরে এইভাবে খুঁজে বেড়ানোর পরও মেয়েটির কোন হদিস সে পেলো না। এদিকে আবার শাহ সাহেবের মেহমান হয়ে দীর্ঘকাল পড়ে থাকাও খুবই বেমানান। তাই বাধ্য হয়েই নূরউদ্দীন ফের বাড়ীতে ফিরে এলো।

বাড়ীতে এসে নূরউদ্দীন আগের চেয়েও অধিক মনমরা হয়ে গেল। তা দেখে তার অভিভাবকেরা সাময়িকভাবে থমকে গেলেন। তার শাদির ব্যাপারে তোড়জোড় তারা কিছুদিন বন্ধ রাখলেন। কিন্তু তবু যখন নূরউদ্দীনের উদাসীনতা গেল না, আবার তারা তৎপর হয়ে উঠলেন। সবাই বুঝে নিলেন, এটা এক ধরনের পাগলামী, এক কিসিমের বিমার জোর-জব্বর করে শাদিটা দিয়ে দিতে পারলেই এ বিমার তার সেরে যাবে।

এর ফলে, এবার তারা নূরউদ্দীনকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, একান্তই যদি তার পছন্দ করা কোন মেয়ে থেকে থাকে, সত্ত্বর তার সন্ধান সে অভিভাবকদের দিক।

www.pathagar.com

অন্যথায় তারা যেখানে শাদি দেবেন, নূরউদ্দীনকে সেখানেই শাদি করতে হবে। এতে কোন দ্বিরুক্তি চলবে না।

নূরউদ্দীন সঙ্কটে পড়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ চেষ্টা করার জন্যে আবার সে চলে এলো ইয়ারপুরে। ইয়ারপুরে এসে আবার সে কয়েকদিন সমানে খুঁজে বেড়ালো মেয়েটাকে।

কিন্তু ফলাফল ঐ একই। ইয়ারপুর এক মস্তবড় গাঁ। পর্দানশীন মেয়েটি এ বিশাল গাঁয়ের কোথায় কোন গৃহকোণে লুকিয়ে রইলো, নূরউদ্দীন তার হদিস করতে পারলো না। বিষয়টিও নাজুক। নাম পরিচয়হীন বেগানা এক তরুণীর খবর কারো কাছে জানতে চাওয়াও বিড়ম্বনাময়। হায়ার প্রশ্ন পড়ে মরুক, এ কথায় লোকে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

শ্রান্ত ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে এ আশা ত্যাগ করলো নূরউদ্দীন। ইয়ারপুর ছেড়ে আসার আগের দিন সাঁঝরাতে সে অনেকক্ষণ নৌকায় ভেসে বেড়ালো। আশাভঙ্গের দুর্বিসহ বেদনায় সে নদীর মধ্যে আক্ষেপ করে বার বার গাইলো—

"মরেছি তোমারে হেরিয়া ক্ষণিক, মরিতেছি ফের খুঁজিয়া—
কোথায় লুকালে তুমি কোথায়—
ওগো তুমি কোথায়—"

ফিরে এলো নূরউদ্দীন। বাড়ীতে ফিরে এসে এবার সে একদম বোবা বনে রইলো আর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতে লাগলো। বাপ, ভাই, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি বন্ধু-বান্ধবের সাথেও সব রকম বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলো। তার পছন্দ করা মেয়ে কেউ আছে কিনা, এ প্রশ্ন আবার করা হলে, তারও কোন জবাব সে দিলো না।

ক্ষেপে গেলেন নূরউদ্দীনের ওয়ালেদ। বড় একরোখা মানুষ তিনি। সন্তানকে সংসারমুখী করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। শাদি দিলেই সংসারমুখী হবে সে, এ অপেক্ষা করেই তিনি এতদিন আছেন। তামাম এলাকা ঢুঁড়ে দুই দুইটে অতি সুন্দরী মেয়েও পছন্দ করে রেখেছেন। এমতাবস্থায় নূরউদ্দীনের এ একটানা একগুয়েমী তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। তার অপর দু'পুত্রকে তিনি কঠোর কণ্ঠে হুকুম দিলেন—ওকে ঘাড় ধরে শাদি করতে রাজি করাও। তার এত ভড়ং আর দেখতে চাইনে। তবু যদি বেঁকে বসে, হাড়গুলো গুঁড়ো করে ওকে বাড়ীর বাইরে ফেলে দাও। এ বাড়ীতে তার আর স্থান নেই। আমার বিষয়বিত্তের এক কণাও তাকে আমি দেবো না। তামাম কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত করবো আমি।

এখানেই তিনি থামলেন না। সেই সাথে বললেন—আর যেন সে হুট করে কোন দিকে চলে যেতে না পারে। ওকে ঘরে তুলে তালা লাগিয়ে দাও।

পরিস্থিতি অসম্ভব রকম প্রতিকূল হয়ে উঠলো। নূরউদ্দীনের আর কোন উপায়ান্তর রইলো না। গত্যন্তর না দেখে বাড়ীর মায়া ত্যাগ করলো সে। এক ফাঁকে পালিয়ে এলো বাড়ী থেকে। ঐ মেয়েটির আশা ত্যাগ করেও শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারলো না। আওয়ারা হয়ে কিছুদিন এখানে ওখানে থাকার পর, ঘুরতে ঘুরতে আবার সে ইয়ারপুরে চলে এলো। তার অবচেতন মনই তাকে টেনে আনলো এখানে।

www.pathagar.com

ইয়ারপুরের আশ্রয়টিও তার চিরউষ্ণ আশ্রয়। আসল কারণ না জানলেও, নূরউদ্দীনের কাহিল হালত দেখে নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব তার প্রতি আরো বেশী দরদী হয়ে উঠলেন। যেভাবে থেকে সে সুখ পায়, সেভাবেই রাখতে লাগলেন তাকে।

নূরউদ্দীন এবার আনমনা ও দিশেহারা। মেয়েটিকে খুঁজে বেড়ানোর সেই বিপুল আগ্রহ তার আর এখন নেই। খোঁজার নামে দিন তিনেক উদাসভাবে সারা গাঁ ঘুরে বেড়িয়ে সে অল্পতেই ক্ষান্ত হলো। খুঁজতে আর সে বেরোয় না। ভেবেও কিছু পায় না। বাড়ীর দুয়ার তার সামনে বন্ধ। মেয়েটিও মিথ্যা এক মরিচীকা। অন্য কোথাও যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট কোন ঠিকানাও চোখের সামনে নেই। দিশেহারা নূরউদ্দীন মনের দুঃখে তাই ইয়ারপুরের ঐ বটতলায় কয়েকরাত বাঁশী বাজিয়ে কাটালো। উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনাহীন অবস্থা তার এখন।

ঘটনাচক্রে এরই মাঝে তার সামনে এলো জিহাদের ডাক। অকূলে কূল পেলো নূরউদ্দীন। পেলো এক আশাতীত অবলম্বন। বর্তে গেল সে। পরম উল্লাসে ভর্তি হলো মুজাহিদের দলে। নবজীবনের সূর্যালোকে সে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। বিপুল উদ্যমে জিহাদের কাজে সঁপে দিলো মনপ্রাণ।

এমনই ওয়াক্তে এ অপরিসীম বিস্ময়। মুজাহিদদের ছাউনিতে যাওয়ার পথে বাহার খাঁর দহলীজে নজর দিয়েই সে দেখতে পেলো তার হৃদয়-ছেঁড়া আকাঙ্খার সেই পরম প্রিয় মুখ। যার খোঁজে আজ সে দিশেহারা-দিউয়ানা, সেই মুখখানাই দহলীজের শিকের সাথে আবদ্ধ। সেই মায়াভরা চোখের নজর গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে নিবদ্ধ।

নিমেষ কয়েক চেয়ে থাকার পরেই 'এইতো-এইতো' বলে নিজের অজ্ঞাতেই নূরউদ্দীন আওয়াজ দিয়ে উঠলো। ধ্যানমগ্ন থাকায় নূরউদ্দীনকে দেখতে পায়নি মেয়েটি। এ আওয়াজ কানে যেতেই ধ্যান ভাঙ্গলো তার। সেও চমকে উঠে নূরউদ্দীনের মুখের দিকে তাকালো। মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির চোখ মুখ খুশীতে ভরে উঠলো। রোশনাই হয়ে গেল তার মুখমণ্ডল।

কিন্তু ঐ মুহূর্তের জন্যেই। তার চোখ মুখের সে আলো পরক্ষণেই আবার নিভে গেল দপ করে। উল্টো, সেই চোখে মুখে বিক্ষোভ ও বেদনার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো এবং দহলীজের অন্দরমুখী দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

'কি হয়েছে আপা ? দহলীজে কে এসেছে ?' বলতে বলতে ছোট্ট একটা ছেলে ছুটে এলো দহলীজে। কাউকে কোথাও না দেখে জানালার দিকে তাকিয়েই সে নূরউদ্দীনকে দেখতে পেলো। 'একি! আপনি এখানে! কাকে চান ?' বলেই সে জানালার কাছে ছুটে আসতে লাগলো। নূরউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো— ও মেয়েটা কে ? এই যে এখনই এ ঘর থেকে দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে গেল, কে ঐ মেয়েটা ?

জবাবে ছেলেটা সাগ্রহে বললো—আরে ওটাতো রোকসানা আপা। রোকসানা ফিরদৌস। এ জানালার ধারে বসে ছিলেন।

www.pathagar.com

ঃ ওর বাড়ী কোন্‌টা ?

ঃ কোন্‌টা মানে ? এইটেই তো। বাহার খাঁ ভাইজানের বোন।

ঃ বোন ?

ঃ ঐ একটাই তো বোন তাঁর।

নূরউদ্দীনের কানে আর কোন কথাই গেল না। বিহ্বল ও বিমুগ্ধ অন্তরে সে আপন মনে সেখান থেকে সরে গেল। উল্লাসে আপ্লুত মন তার পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলো —পেয়েছি ? এতদিনে তারে আমি পেয়েছি! একান্তই হাতের কাছে পেয়েছি।

আগামী কাল প্রত্যুষেই বাহিনী নিয়ে পাটনার পথে রওনা হতে হবে। বাহিনী প্রস্তুত। মাঝে আর একটা দিনও নেই। নূরউদ্দীন ভেবে দেখলো, এর মধ্যে আর অন্য চিন্তার ফাঁক নেই। কিছুমাত্র সমীচিনও তা নয়। হারিয়ে যাওয়া মুখখানার যে সন্ধান পাওয়া গেছে আর একান্তই নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে, এই তো তার জব্বোর খোশনসীব। শাদি করার দুরন্ত আকাঙ্খা তার কোন দিনই ছিল না। শাদি করলে, এই মেয়েকেই করবে—এই ছিল তার অন্তরের আকিঞ্চন। মেয়েটাকে খোঁজ করার প্রয়োজন ছিল ঠিকই। কিন্তু অভিভাবকদের নিরতিশয় চাপে পড়েই এমন পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে।

তাকে পাওয়া গেছে এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালার কাছে হাজার শুকরিয়া। কিসমতে থাকলে তাকে শাদি করার মওকাও হবে তার। কিন্তু এখন সে চিন্তার বিন্দুমাত্র ফাঁক ফুরসুৎ নেই। যে মহৎ ও গুরু দায়িত্ব সে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারাটাই তার কাছে এখন সবচেয়ে বড় কাজ। তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য আর সবচেয়ে বড় তুষ্টি। দ্বীন, দেশ ও জাতির জন্যে জিহাদ করার সওয়াব মস্তবড় সওয়াব। জিহাদ করে শহীদ হতে পারলে, তার সওয়াব ইহ-দুনিয়ার তামাম কিছুর চেয়ে অনন্ত গুণে উত্তম। সে তুলনায় ইহ-দুনিয়ার দু' দণ্ডের আনন্দ কচুপাতার পানির মতোই মিথ্যে। এ পবিত্র কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারলে তবেই আল্লাহ তায়ালার তুষ্টি হাসিলের আশা করা যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তুষ্ট থাকলে, ইহ-দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াও সহজে পূরণ হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তায়ালাকে খুশী করতে পারলে, জিহাদ থেকে সহিসালামতে ফিরে এসে রোকসানাকে সে অনায়াসেই পাবে। অন্যথায়, এখানে পড়ে থেকে প্রাণপাত করলেও রোকসানা যে মরিচিকা ছিল, সেই মরিচিকাই হয়ে যাবে, তার নাগাল সে কোনদিনই পাবে না।

মন শক্ত করলো নূরউদ্দিন। অটল নিয়াত নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সে মুজাহিদ বাহিনীসহ পাটনার পথে রওনা হলো। তবে তকদিরের সাথে তকদিরেরও প্রয়োজন আছে। তাই সে তার এক আত্মীয়ের কাছে পত্র লিখে জানালো, ইতিমধ্যেই তাঁরা যেন রোকসানার সাথে তার শাদির কথা উপস্থাপন করে রাখে। নইলে আবার অন্য কোথাও কথা দিয়ে ফেলতে পারেন রোকসানার অভিভাবকেরা। সময় থাকতে চেষ্টা পাওয়া ভাল।

রোকসানাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে নূরউদ্দীনের অন্তরে নতুন প্রেরণা পয়দা হলো। জিহাদের জন্যে তার মনোবল গেল বহুগুণে বেড়ে। বাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার ক্ষণে সে বিপুল উল্লাসে আওয়াজ দিয়ে উঠলো—নারায়ে তাকবির—

www.pathagar.com

অনুরূপ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মুজাহিদগণ সাথে সাথে আওয়াজ দিলেন—আল্লাহু আকবর—

৪

'নারায়ে তাকবির—আল্লাহু আকবর' ধ্বনীতে পাটনার উপকেন্দ্রও মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগলো। শুধু ইয়ারপুরের মুজাহিদ বাহিনীই নয়, গোটা বাংলা ও বিহার এলাকার তামাম মুজাহিদ ইতিমধ্যেই দলে দলে এসে পাটনার উপকেন্দ্রে জমায়েত হওয়া শুরু করলো। বিজাতীয় নির্যাতনে অতিষ্ট জনগণ জিহাদের আহ্বানে প্লাবনের বেগে পাটনার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। উপকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ও জিহাদ নেতা পাটনার মৌলভী বিলায়েত আলী—ইনায়েত আলী সাহেবেরা এ অগণিত মুজাহিদদের সুসংহত করতে এবং ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাদের অস্থিরতা সামলে নিতে হিমশিম খেতে লাগলেন।

পলাশীর পর থেকেই বাংলার তথা হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা নিজ দেশে পরবাসী। দিন যতই গত হয়েছে তাদের পরিবেশ ততই বৈরী হয়ে উঠেছে। প্রতিকূল পরিবেশে বসত করতে গিয়ে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে অবিরাম। অস্তিত্বের লড়াই তাদের লড়তে হয়েছে লাগাতর। বিদেশী ও বিজাতীয় আগ্রাসনের ফলে, আর ইসলামের মৌলিক নীতি আদর্শ থেকে মুসলমানদের দ্রুত বিচ্যুতির কারণে, মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। একমাত্র কিছু অকুতোভয় মর্দে মুমিনদের হুংকারে আর সিরাতুল মস্তাকীমের কিছু সঠিক দিশারীদের দিক নির্দেশনায় এ উপ মহাদেশে এ কওমের অস্তিত্ব মুছে যেতে বসেও একেবারে মুছে যেতে পারেনি।

যুদ্ধের নামে পলাশীর প্রহসনের পর থেকেই ইংরেজ বেনিয়ারূপী কালসাপের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই আর কালসাপের ছোবলে নিরন্তর প্রাণপাত করে এসেছে মুসলমানেরাই। কালসাপের উদ্যত ফণার সামনে এ উপমহাদেশের আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মরণজয়ী মুসলমানদের বিরামহীন সংগ্রাম ও বেপরোয়া প্রাণপাতের মুখে সাপ যখন অনেকটা থমকে গেছে আর ফনা গুটিয়ে নেয়ার কিছুটা চিন্তা-ভাবনা মগজে তার এসে গেছে, একমাত্র তখনই অন্য জাতির কোলাহলটা কিছু কিছু শুরু হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সে কোলাহলটাও আবার সাপ মারার জন্য নয়, সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে আখের গুছিয়ে নেয়ার জন্যে। অনেকটা ঠিক কিষাণের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ফসল কায়দা করে হাত করার মহাজনী কোলাহল। ঈসায়ী সতের শো সাতান্ন থেকে অন্ততঃ এক দেড়শো বছরের ইতিহাসে একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে আর কাউকেই সোচ্চার দেখা যায় না। ব্যতিক্রম দু'একজন থাকলে তা ঐ দু'একজনই এবং তা ব্যক্তিগত।

শুধু রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই লড়াই করেনি মুসলমানেরা, বিজাতীয় আগ্রাসন ও প্রতিপত্তির প্রভাবে ইসলামের মৌলিকতার মধ্যে যে ধস্ নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই করতে হয়েছে। শিরক, বিদাতে ও কুসংস্কার থেকে দ্বীনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কিছু বিশিষ্ট আলেম ও অলি-আল্লাহ কিসিমের কিছু অনন্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ হরহামেশাই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর দ্বীনকে কলুষমুক্ত করার কাজে নেমেই তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, দেশকে আগে বিদেশীর ও বিজাতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তা না হলে, দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় স্বকীয়তা বজায় রেখে মুসলমানদের বাস করা আর অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবিধান করা।

এবম্বিধ কারণে, দেশকে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই শুরু হয়েছে পলাশীর পর থেকেই। খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ ও কৃষক-প্রজা বিদ্রোহের সাথে সাথে ব্যাপক লড়াই লড়ে গেছেন ফকির নেতা মজনুশাহ তার ফকির বাহিনী নিয়ে। ত্রিশ-চল্লিশটি বছরব্যাপী বিদেশী বেনিয়াদের উৎখাত করার এ সংগ্রামে এদেশের হাজার হাজার মুসলমান প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গেছে।

নানাবিধ কারণে ফকিরদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেলেও ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে এদেশের মুসলমানদের লড়াই থেমে থাকেনি কখনো। ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের ক্রমবর্ধমান জুলুম মুসলমানদের সে লড়াই সর্বদাই তুঙ্গে তুলে রেখেছে।

খোদ ইংরেজ প্রশাসন ও জমিদার-ইজারাদারদের অত্যাচারের সাথে অতপর যোগ হয় নীলকরদের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিষ্পেষণ। ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় আর জমিদারদের সহযোগিতায় নীলকর সাহেবেরা এদেশের কৃষককুলকে জুলুমের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করতে থাকে। নিপীড়িত প্রজাকুলের মর্মভেদী আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একদা নামগোত্রহীন এদেশের অমুসলমানেরা রাজার আসনে বসে আর রাজার জাত মুসলমানদের দাসানুদাস বানিয়ে পয়জারের নীচে নিষ্পেষণ করতে থাকে।

ফলে, ফকির বাহিনীর সংগ্রাম শেষ হতে না হতেই এদেশে আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে জিহাদের আগুন। বিজাতীয় দখলদার আর জুলুমের বিরুদ্ধে লাগাতর এ জিহাদ প্রায় পৌণে এক শতাব্দিব্যাপী অব্যাহত থাকে। ফকির নেতা মজনু শাহর ফকির আন্দোলনের মতোই এ সুদীর্ঘ জিহাদ আন্দোলন সংগঠন ও এতে নেতৃত্বদান করেন রায় বেরেলীর সিংহপুরুষ সাইয়্যীদ আহমদ ব্রেলভী (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী)।

এ সাইয়্যীদ আহমদ ডাক দিয়েছেন জিহাদের। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে হিন্দুস্থানের নানা অঞ্চলের মুসলিম জনতা। পূর্ব অঞ্চল, বিশেষ করে বাংলা থেকেই সাড়া এসেছে সর্বাধিক। বাংলা থেকে দলকে দল ছুটে আসছে মুজাহিদ। জমায়েত হচ্ছে পাটনার উপকেন্দ্রে। অধিকাংশেরাই এসে গেছেন। বাংলা ও বিহারের আরো কিছু দল প্রস্তুত হচ্ছে আসার জন্যে। তারা এসে পৌঁছলেই বিলায়েত আলী সাহেবেরা রায় বেরেলীতে রওনা দেবেন মুজাহিদদের নিয়ে।

এ অন্তর্বর্তী সময়টা পার করা কঠিন হয়েছে বিলায়েত আলী সাহেবদের। মুজাহিদদের দুর্বার আগ্রহ সামাল দিতে তারা নিজেরাই সময় সময় বেসামাল হয়ে পড়ছেন। অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা থেকে কেউ এসেছে জমিদারের মাথা কাটতে,

www.pathagar.com

কেউ এসেছে ইজারাদারের ঠ্যাং ভাঙ্গতে, কেউ এসেছে নীলকর সাহেব আর তাদের এদেশীয় দালাল-ঠিকাদারদের বংশ নিপাত করতে। এরা অধিকাংশেরাই বাংলার কৃষক আর কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার কৃষক মানেই সিংহভাগই বাংলার মুসলমান। মুসলমান শাসন শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাংলার মুসলমানেরা জমিদারী-জায়গীরদারী, চাকরি পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবকিছু হারিয়ে একমাত্র কৃষিকাজের উপরই নির্ভরশীল হয়েছিল আর জুলুমের পুরো ঝড়টা তাদের উপর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছিল।

তাই সাইয়্যীদ আহমদের মতাদর্শের সাথে অধিক পরিচিত না হয়েও, এ মজলুমদের মধ্যে থেকে কিছু লোক জিহাদের ডাক শুনেই ছুটে এসেছিল। সাইয়্যীদ আহমদের সাথে এদের পরিচয়ও নেই, তার হাতে এরা কেউ বয়াতও হয়নি। বয়াত হওয়া শিষ্যদের এক ডাকেই এরা জুলুমের প্রতিবিধানে ছুটে এসেছিল। অন্য কথায়, জিহাদের অনুকূলে মন এদের আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। জিহাদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আসা মুজাহিদদের তুলনায় এই রবাহুত-মুজাহিদদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু উদ্যম ও জান দিয়ে লড়াই করার নিয়াত এদের নগণ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কারো কারো অনেকখানি অধিক।

এরা লড়াই চায়। লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। উপকেন্দ্রে বসে বসে কাল কাটাতে চায় না। বিলায়েত আলী সাহেবদের তাই এদের পিছনে কিছুটা সময় দিতে হচ্ছে। অধিক আগ্রহীদের সামগ্রিক ব্যাপারটা সমঝে দিতে হচ্ছে। দিন যাচ্ছে ভিড় জমানো বিপুল সংখ্যক মুজাহিদদের মাঝে সমন্বয় সাধন করা নিয়ে আর বাদ মাগরিব বৈঠক চলছে অজ্ঞ ও রবাহুতদের কাছে জিহাদের মতবাদটা আরো অধিক পরিষ্কার করে দেয়ার কাজে।

আতাহার আলী এমনই একজন রবাহুত মুজাহিদ। সোজা জ্ঞান, সোজাবোধ, উচিতবক্তা মানুষ। যশোহর থেকে আগত অন্য এক ছোট দলের সে সদস্য। পথিমধ্যে এ দলটি যশোহরের ইয়ারপুর থেকে আগত নূরউদ্দীনের দলের সাথে এক হয়ে গেছে। বাদ মাগরিব পয়লা বৈঠকে আতাহার আলী হাজির ছিল। সামনের দিকের কাতারেই সে স্থান করে নিয়েছিল। পয়লা বৈঠকে সেদিন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল কম। অনেকটা ঘরুয়া সুলভ বৈঠক। সেই মাফিক কথাবার্তা। এমনই কথাবার্তার এক ফাঁকে আতাহার আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো—'নামে গোয়াল, কাঁজি ভক্ষণ'। খামাখাই হৈ চৈ।

বিলায়েত আলী সাহেবের পাশেই বসেছিলেন বাংলার জিহাদ নেতা মৌলভী ইমামউদ্দীন সাহেব। কথাটা তার কানে পড়লো। আতাহার আলীর দিকে তিনি নজর ফিরিয়ে বললেন—তুমি, মানে আপনি কি বললেন?

আতাহার আলী উদাস কণ্ঠে বললো—বলবো আর কি? মনের দুঃখটা প্রকাশ করছি।

ঃ মনের দুঃখ! কিসের দুঃখ?

ঃ দুঃখ মানে, "শব্দে শুনি মাছ জেগেছে রুই-কাতলা লাওকে লাও, ট্যাটা হাতে গিয়ে দেখি লাফ পাড়ছে পুঁটির ছাও"—ব্যাপারটা এই আর কি! গাছে আম নেই একটা, কুড়ানোর লোক হাজারটা। কি যে সব কাণ্ড কারবার?

www.pathagar.com

আতাহার আলীর কথার দিকে অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। ইমামউদ্দীন সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আপনার এসব কথার অর্থ?

আতাহার আলী ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—আমি একজন দুখী মানুষ! বয়স কম, বিদ্যা-বুদ্ধিও নেই। ওসব আলগা সম্মান ভাল লাগে না আমার? "আপ্-আপনি" বাদ দিয়ে দয়া করে আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনার কিছু ছেলের চেয়ে আমি হয়তো ছোট হবো।

ঃ তাজ্জব। তা তুমি এসব কথা বলছো কেন?

ঃ বেয়াদবী যে হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। আমার কসুর মাফ করে দেবেন। শুনতে পেলাম, দুরমার লড়াই বেধেছে দুশমনদের সাথে। মার-মার কাট-কাট লড়াই। শুনামাত্রই পথ থেকে ছুটে এলাম—হয় মারবো নয় মরবো—এ নিয়াত নিয়ে। কিন্তু লড়াই কোথায়? কেবলই তো পাঁয়তারা।

ঃ সেকি! পথ থেকেই এসেছো তুমি? বাড়ীতে বলে কয়ে আসোনি?

ঃ বাড়ী কোথায় হুজুর, আর বলবোই বা কাকে?

ঃ তার মানে? তোমার বাড়ীঘর বা আপনজন কেউ নেই?

ঃ ছিল। একদিন সবই ছিল। বাড়ীও ছিল, বউ-বাচ্চাও ছিল। আজ পথই আমার বাড়ী, পথই আমার সব।

উপস্থিত সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। ইমামউদ্দীন সাহেব বললেন—কি ঘটনা, বলো তো শুনি?

ঃ সে অনেক কথা। আমাদের ওসব আটপৌরে কাহিনী এসব মজলিসে চলে না হুজুর। অনেকে বিরক্ত হবেন।

মৌঃ বিলায়েত আলী সাহেব এই বৈঠকের মধ্যমণি। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন—চলবে চলবে, খুব চলবে। কে কোন অবস্থা থেকে আর কোন নিয়াতে এসেছো—এসব জেনে রাখার জরুরত আছে আমাদের। তুমি বলো।

আতাহার আলী বললো—আমি বাংলার যশোহর জেলার একজন কৃষক। বড়লোক কোনদিনই ছিলাম না। তবে অল্পস্বল্প জোত-ভুঁই যা ছিল, তা নিয়ে সুখেই ছিলাম। কিন্তু ইংরেজরা আসার পরেই আমাদের উপর চেপে বসলো নতুন জমিদার আর নতুন ব্যবস্থা। খাজনার পরিমাণ গেল দশগুণে বেড়ে। খাজনা ছাড়াও বারো মাসে তের রকম অতিরিক্ত কর। এর উপর আবার জমিদারের এক ঝাঁক সাঙ্গোপাঙ্গোর চাহিদা। জমিদারের দাবী মেটানোর পরও এক ঝাঁক সেরেস্তাদার, পাটনিদার, তস্য পাটনিদার, দালাল, গোমস্তা আর পাইক পেয়াদাদের চাহিদা মিটাতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেলাম। ঘরের চাল আর হালের গরু সবই ওদের পেটে চলে গেল।

ঃ তারপর? তারপরেই পথে এসে দাঁড়ালে?

ঃ জিনা হুজুর। তখনও কয়েকটুকরা জমি মাঠে ছিল। কিন্তু নীল বাঘ এসে গিলে ফেললো ওটুকুও।

ঃ নীল বাঘ!

ঃ নীলকর সাহেবেরা হুজুর। নীলকর আর তাদের দালাল অনুচরেরা। অন্য

www.pathagar.com

ফসলের বদলে জমিতে তারা নীল বুনতে বাধ্য করলো আমাদের। এরপর আবার শুরু করলো নীলের উপর দাদন দেয়া। বাধ্যতামূলক দাদন। দাদন নিতেও বাধ্য করলো সবাইকে। দাদন নেয়ার পর নীলকরদের দালাল আর অনুচরদের অর্থ লালসা মেটাতে যে দাদনের তিনভাগের একভাগও থাকে না, সেই দাদন নিতে কৃষকদের বাধ্য করলো তারা। জোর করে দাদনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নিতে লাগলো। আমি সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করায় নীলকরেরা আমাকে কয়েদ করে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কক্ষে আটক করে রাখলো।

ঃ বলো কি ? তা স্বাক্ষর দিতে তুমি সেরেফ একাই অস্বীকার করলে ?

ঃ একা নই হুজুর। অন্য গাঁয়ের তো আছেই, আমাদের গাঁয়েরও আরো অনেকেই। সবাইকে ধরে তারা বেদম মারদোর করলো। তারপর এনে অন্ধকার ঘরে আটক করে রাখলো। জমিদারেরা সবাই ঐ নীলকরদের দোস্ত। ইংরেজ পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটগণও নীলকরদেরই লোক। প্রতিবিধান করবে কে ?

ঃ তারপর ? তারপর কি হলো ?

ঃ আমাদের গাঁয়ের লোকেরা এ নিয়ে একটু হৈ চৈ করায় নীলকরেরা এসে আমাদের গোটা গাঁ জ্বালিয়ে দিলো। সকলের বাড়ীঘর ছাই হয়ে গেল। আমি তখন আটক।

ঃ সেকি! এতটাই করলো ?

ঃ আপনি এ এলাকার লোক হুজুর। আমাদের বাংলার সব খবর জানেন না। আমাদের সাথে গণি দফাদার নামের এক লোক, মানে দফাদার আটক ছিল। বেদম প্রহারের দরুন তার হাড়-হাড্ডির গিট-জোড় আর ছিল না। তার অপরাধ—এক নীলকরকে আর এক গাঁয়ে আগুন দিতে সে দেখেছিল আর সেই কথা সে অনেককে বলেছিল। এ অপরাধেই তাকে আধমরা করে এনে আমাদের ঐ অন্ধকার কক্ষে ফেলে দিয়ে গেল।

ঃ বড়ই করুণ ব্যাপার।

ঃ করুণ বই কি হুজুর! প্রতিকারের কোন পথ না থাকায়, এ নীলের কারবারে কৃষকদের খুন, গুম আর মেরে কেটে রক্তাক্ত করা নীলকরদের কাছে একদম এক আটপৌরে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজেও জানি, নীলকুঠিতে কাজ করা লোকদের মুখেও শুনেছি, যেসব বাকসো ভর্তি করে নীলকরেরা বিলাতে নীল পাঠায়, সে সব বাকসের মধ্যে এমন বাকসো নেই যাতে মানুষের রক্তের দাগ নেই। তাদের কিছুমাত্র বিরুদ্ধে গেলেই রক্তাক্ত হয়ে যাওয়া, এমনকি লাশ হয়ে যাওয়াও বিলকুল মামুলী ব্যাপার।

বিলায়েত আলী সাহেব অধিকতর বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—বড় সাংঘতিক কথা। কিছুটা জানি আর অনেকটা শুনেছি। কিন্তু এত বিশদভাবে শুনিনি। কি জনাব, ঘটনা কি ?

বিলায়েত আলী সাহেব ইমামউদ্দীন সাহেবকে প্রশ্ন করলেন। জবাবে ইমামউদ্দীন সাহেব ম্লান কণ্ঠে বললেন—নতুন করে আর কি বলবো ? সবই তো শুনছেন। অমনি

www.pathagar.com

কি আর জিহাদের এক ডাকেই বাংলা থেকে এত মুজাহিদ ছুটে আসছে ? এ ইংরেজ শাসনটা আমাদের বুকের উপর বাঘের থাবা হয়ে বসেছে।

বিলায়েত আলী সাহেব কিছুক্ষণ দম ধরে বসে রইলেন। এরপর নিঃশ্বাস ফেলে আতাহার আলীকে প্রশ্ন করলেন—তা থাক ওসব। এবার তোমার কথা বলো। অন্ধকার ঘর থেকে করে ছাড়া পেলে তুমি ?

আতাহার আলী ভারী কণ্ঠে বললো—সাত আট মাস পরে। বাড়ীতে এসে দেখি, বাড়ীঘর সব ছাই, বউ বাচ্চাও শেষ।

ঃ তার মানে ? আগুনে পুড়েই মরলো ?

ঃ হ্যাঁ, আগুনে বৈকি ? বাইরের আগুনে না হলেও পেটের আগুনেই মরলো। আমাকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন ঘরে আমার একদানা শস্য বা অর্ধকড়ি কিছুই ছিল না। অসুস্থ বউ-বাচ্চা অনাহারে আর অচিকিৎসায় ধুকেধুকে মরেছে। শেষের কয়দিন সেরেফ নাকি লতাপাতা সেদ্ধ করে খেয়েছে।

ঃ ইশ্! কি মর্মান্তিক। তারপর তুমি কি করলে ?

ঃ পথে পথে ঘুরতে লাগলাম আর এই জুলুমের কোন বদলা নিতে না পেরে নিজের গোস্ত নিজেই কামড়াতে লাগলাম।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপরেই তো আপনাদের এ জিহাদের ডাক শুনতে পেলাম। ঐ বিদেশী আর বিজাতীয় জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এরপরে আর কথা আছে ? ছুটে এলাম এখানে। কিন্তু এখানে এসে তো আবার আগের মতোই হতাশ হয়ে পড়ছি কেবল।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ জিহাদ কোথায় ? কোথায় লড়াই, কোথায় ময়দান ? কিছুই তো ভাল করে বুঝে উঠতে পারছিনে ?

ঃ সেকি! তুমি সেরেফ জিহাদের নাম শুনেই ছুটে এসেছো ? এই জিহাদটা কি ? কিসের জিহাদ আর কেন এর প্রয়োজন—এসব কিছুই জানো না ?

ঃ জানবো আবার কি ? লড়াই হবে আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে—এটা জেনেই তো লাঠি হাতে বেরিয়েছি।

ঃ আমাদের দুশমন কি কেবল এ ইংরেজ কোম্পানী আর তাঁদের তাঁবেদারেরাই ?

ঃ তাছাড়া আর কে ? আমাদের উপর গজব তো ওরাই পয়দা করেছে হুজুর। এদের উৎখাত করতে পারলেই তো আমাদের দুর্ভোগটা কেটে যায়।

ঃ এরা উৎখাত হলেইকি আমাদের দুর্ভোগ কেটে যাবে ?

ঃ শুধু আমাদের কেন ? আমাদের দেশের সকল মুসলমানেরই দুর্ভোগ কেটে যাবে। গজবটা তো মুসলমানদের উপর দিয়েই যাচ্ছে।

ঃ মুসলমানদের উপর গজব পয়দা করার মালিক কে ? বিদেশী আর বিজাতীয় লোকেরা, না আল্লাহ তায়ালা ?

আতাহার আলী থতমত করে বললো—এ্যাঁ! হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তো সবকিছুর মালিকই আল্লাহ তায়ালা। তাঁর হুকুম ছাড়া তো কিছুই হবে না।

www.pathagar.com

ঃ তাহলে সেরেফ বিদেশীদের তাড়ালেই কি আমাদের দুর্ভোগ কেটে যাবে ? আল্লাহ তায়ালা যদি নাখোশ থাকেন, তবুও ?

ঃ না- না, তা হবে কেন ? কিন্তু আল্লাহ তায়ালা না খোশ থাকবেন কেন ?

ঃ আল্লাহ তায়ালা নাখোশ না থাকলে আমাদের উপর এই গজব নেমে আসবে কেন ? তার করুণা হাসিল করতে না পারলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা যাবে কি করে ?

আতাহার আলী এবার ঈষৎ হেসে বললো—এসব কি গুরুতর পাঁচে ফেললেন হুজুর ? এত কি আমি বুঝি ? তিনি তাহলে আমাদের উপর নাখোশ হলেন কেন ? কি করেছি আমরা ?

ঃ আমরা তাকে ত্যাগ করেছি। তার অবাধ্য হয়েছি। তাঁর বিধিবিধান ভুলে গিয়ে আমরা শিরক আর বিদায়াতে মনোনিবেশ করেছি। আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে এ দুনিয়ার ফালতু জিনিসকে আমরা আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ আমরা কি সবাই এখন শরীয়াতের সঠিক গণ্ডীর মধ্যে আছি ? অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আমরা, এদেশের এ মুসলমান জাতিটা এখন নামেই মুসলমান। ইসলাম আমাদের মধ্যে নেই। শরীয়াত থেকে অনেক দূরে সরে গেছি আমরা। কবর পূজা, দরগা পূজা, পীরপূজা, গুরু পূজা, গাছ-পাথর-ঢিপি পুজোর সাথে তাজিয়া মিছিল, তপ-ধ্যান, ভেক-ভড়ং—মানে হাজার রকম শরীয়াত বিরোধী কাজে আমরা লিপ্ত হয়ে গেছি। যাই নি ?

ঃ জ্বি হুজুর। আমাদের এলাকার প্রায় সকলেই এসব করে। এসব করে বালা মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

ঃ ওদের কি সেই ক্ষমতা আছে ? ঐ সব জড়পদার্থ আর মানুষের কি কোন গায়েবী শক্তি আছে যে তারা আমাদের বালামুসিবত ঠেকাবে ? সে শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা।

ঃ হ্যাঁ, সেতো ঠিকই হুজুর।

ঃ সেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আমরা বিদায়াতে লিপ্ত হয়েছি। বেঈমানী-মোনাফেকী করে বেড়াচ্ছি। মুসলমানেরা যখন আল্লাহকে ভুলে যায়, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মাফিক না চলে, তখনই মুসলমানদের উপর গজব নেমে আসে। আমাদের এ উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর এ কারণেই গজব নেমে এসেছে।

ঃ হুজুর!

ঃ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ পালনকারী মুসলমানের উপর কোন গজব নেমে আসতে পারে না। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল মুসলমানের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগানোর কারো সাধ্য নেই। ঈমান, একতা আর আল্লাহওয়ালা মুসলমানেরা সর্বত্রই দুর্জেয়। কাজেই আমাদের দুশমন কেবল বিদেশী—বিজাতীয়রাই নয়, আমরা নিজেরাও। আল্লাহর হুকুম অমান্য করে আমাদের দুঃখ আমরাই ডেকে এনেছি।

ঃ তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে ?

www.pathagar.com

ঃ আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ আঁকড়ে ধরতে হবে। শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ অর্থাৎ শিরক-বিদায়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। এক কথায় নিজেকে কলুষমুক্ত করার জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে আমাদের।

আতাহার আলী হতাশ কণ্ঠে বললো—সেকি কথা হুজুর! আপনাদের জিহাদের অর্থ কি তাহলে এই? মানে নিজেকে আর জাতিকে খাঁটি মুসলমান বানানো?

ঃ হ্যাঁ, মূল লক্ষ্য এইটেই। ময়দানের লড়াই এর পরিপূরক। দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে।

ঃ তাজ্জব! তাহলে বিদেশী আর বিজাতি দুশমনদের বিরুদ্ধে আপনারা জিহাদের ডাক দিয়েছেন কেন হুজুর? মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজন নসিহত দান করা। সভা-জালসা করে দ্বীন ইসলামের আদর্শ মানুষকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দিলেই তো দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়।

ঃ না, তা হয় না। বিজাতি আর বিধর্মীরা দেশের মালিক হলে আর শাসনদণ্ড তাদের হাতে থাকলে, সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাকওয়া নিয়ে চলা।

ঃ হুজুর!

ঃ তারা তোমার দ্বীনের ধার ধারে না। তাদের আদেশ তাদের ইচ্ছে পালন করতে বাধ্য হলে দ্বীনকে রক্ষে করা যায় না। ইসলামও করবে, বিদায়াতও করবে—মুসলমান বলে নিজের পরিচয়ও দেবে আবার হারাম খেয়ে হারামীও করবে—অর্থাৎ দুধুও খাবে তামাকুও খাবে—দু'টো এক সাথে হয় না।

ঃ তা কথা হলো, সে তো ঠিকই।

ঃ তাদের ধর্মীয় কাজে শরিক হতে তারা তোমাকে বাধ্য করবে, পূজা-উপাসনায় চাঁদা নেবে, সেই মাফিক লেবাস পরাবে, হারাম খাওয়াবে আর হারামী পথে পরিচালিত করবে। ওদিকে আবার তোমার ধর্মীয় কাজে তারা ধাপে ধাপে বিঘ্ন পয়দা করবে। তুমি মসজিদ তুলতে পারবে না, নামায পড়তে পারবে না আজান দিতে পারবে না, কুরবানী দিতে পারবে না—এ রকম পদে পদে বাধা। এ অবস্থায় কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

ঃ হুজুর।

ঃ শুনেছো কিনা জানি না, পাঞ্জাবের শিক রাজা রনজিত সিং আইন করে মুসলমানদের আযান দেয়া নামায পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। কাজেই, বিধর্মীদের হাত থেকে দেশকে আগে মুক্ত করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করে আর মুসলমান সমাজের আবিলতা দূর করে একটা খাঁটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের এ জিহাদের লক্ষ্য।

আতাহার আলীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে খোশ কণ্ঠে বললো—ও, তাই বলুন? এতক্ষণে বুঝলাম। তা হুজুর, ঐ খাঁটি ইসলামিক রাষ্ট্রে কি তাহলে সেরেফ মুসলমানেরাই থাকবে? অন্য ধর্মের লোকেরা—

www.pathagar.com

ঃ সব ধর্মের লোকই থাকবে। দ্বীন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা হলে সব ধর্মের লোকেরাই সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ অন্য ধর্মের লোকদের জান-মাল-ধর্ম হেফাজত করা ইসলামের পবিত্র বিধান। অন্যথার পথ নেই। তাই সবচেয়ে বড় কথা, দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

উপস্থিত মুজাহিদদের কয়েকজন এ সময় 'সোবহান আল্লাহ—সোবহান আল্লাহ' আওয়াজ দিয়ে উঠলো। জান মুহম্মদ নামের এক মুজাহিদ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—আজকেই সবকিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো হুজুর। লড়াইয়ের কথার সাথে এসব কথাও কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু কার মধ্যে কি, কি কারণে কি, এসব এতদিন সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। আজকেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সোবহান আল্লাহ! বড়ই উমদা চিন্তা-ভাবনা।

বিলায়েত আলী সাহেব মৌঃ ইমামউদ্দীনকে প্রশ্ন করলেন—সেকি! এরা বলে কি জনাব ? এদেরকে কি সব কথা বুঝিয়ে আপনারা বলেননি ? সবাই এরা না বুঝেই এসেছে ?

ইমামউদ্দীন সাহেব বললেন—জিনা-জিনা। এদের মতো অতি অল্প কিছু লোক বেশী কিছু না বুঝেই এসেছে। বাদ বাকী সবাইকে সব কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আর তারা তা বুঝে নিয়েই এসেছে। সরাসরি বেরেলভী হুজুরের দ্বারা অনুপ্রাণীত হওয়া মুজাহিদদের সংখ্যাও এখানে কম নয়।

ঃ তবু সকলেই সব কিছু বুঝে নিয়ে এলে তবেই ভাল হতো।

এবার নূরউদ্দীন কথা ধরে বললো—তা সম্ভব হয়নি জনাব। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বড় হুজুরের কাছে সবকিছু বুঝে নিয়ে এসে কিছু লোককে বুঝিয়েছেন। তারা আবার আমাদের বুঝিয়েছেন। আমরা ফের অন্যদের বুঝিয়েছি। এভাবে বিভিন্নমুখে প্রচার হওয়ার ফলে জিহাদের সঠিক অর্থ, তথ্য আর বিবরণ এ বিপুল সংখ্যক মুজাহিদদের সকলেরই সমানভাবে জানা নেই। কিছু কিছু এখনও আমাদের বুঝে নেয়ার প্রয়োজন আছে। জনাব ঠিকই বলেছেন, সবকিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

বিলায়েত আলী সাহেব বললেন—তুমি, মানে আপনি নূরউদ্দীন বিনীতকণ্ঠে বললো—আমিও নিতান্তই ছেলে মানুষ জনাব। আমাকেও তুমিই বলবেন। আমি যশোহরের ইয়ারপুর থেকে এসেছি। ওখানকার বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে।

ঃ সাব্বাস্! তা তুমি কি বলছো ?

ঃ বলছি, অনেকেই অনেক কথা সঠিকভাবে জানে না। কুচকাওয়াজের সময় সবার সামনে এসব কথা ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়।

বিলায়েত আলী সাহেব খুশী হয়ে বললেন—তোফা-তোফা! বহুৎ উমদা বাত্ বলেছো। উত্তম প্রস্তাব। আগামী কাল থেকেই এ পদক্ষেপ নেবো আমরা, না কি বলেন নজীবুল্লাহ সাহেব ?

ইমামউদ্দীনের সঙ্গী মৌলভী নজীবুল্লাহও বাংলার লোক। বাংলা মুলুকে তাঁর মতোই একজন জিহাদের মতবাদ প্রচারক। জবাবে নজীবুল্লাহ সাহেব বললেন—জি

www.pathagar.com

জি। আমিও একথাই বলবো বলবো করছি। আসলে, অসংখ্য দেশবাসীর সবাইকে তো সব কথা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি আমাদের। কুচকাওয়াজের সময় এ জিহাদ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা সবাইকে দেয়া খুবই দরকার। সবকিছু সবাইকে অবশ্যই জানতে হবে।

ঃ ঠিক-ঠিক। এটা খুবই জরুরি।

এরপর বিলায়েত আলী সাহেব নূরউদ্দীনকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমার প্রস্তাবই সমর্থন পেলো নওজোয়ান। তুমি খুব বুদ্ধিমান। এবার বলো, তোমার কিছু বুঝার ফাঁক আছে নাকি?

নূরউদ্দীন বললো—ফাঁক তো অনেকখানিই আছে জনাব। সেগুলো আস্তে আস্তে পূরণ করে নেবো। এক্ষণে একটা বিষয় আমার কাছে খুবই জট পাকিয়ে গেছে। সেইটেই জানতে পারলে বাধিত হতাম।

ঃ কি সেটা?

ঃ শুনলাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় গিয়ে জিহাদে অবতীর্ন হতে হবে আমাদের। লড়াই শুরু করতে হবে সেখানে গিয়ে। এর কারণটা কি জনাব? বাংলা বা বিহারের কোথাও থেকে নয়, বড় হুজুরের মোকাম রায় বেরেলী থেকেও নয়, একদম সুদূর ওখানে গিয়ে কেন?

ঃ সাব্বাস! এই তো আর এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুমি তুলেছো। এ প্রশ্ন আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও দু' একজন করেছেন। আসলে এটা সকলেরই জেনে থাকা প্রয়োজন আর জরুর তা জানতে হবে সবাইকে।

ঃ জনাব।

ঃ দেশের বর্তমান অবস্থাতো দেখছোই। বাংলা আর বিহার থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত তামাম এলাকা ইংরেজদের পূর্ণ দখলে। তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে পান থেকে চুন খসার জো নেই। "অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ করে তারা গোটা উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত তাদের আধিপত্যে নিয়েছে। উত্তর ভারতে পাঞ্জাবের শতদ্রু নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত সমুদয় এলাকার সকল নরপতিই ইংরেজদের হুকুম পালন করতে বাধ্য। দিল্লীর বাদশাহ এখন এক অস্তাচলগামী সূর্য। ইংরেজদের আদেশ পালনে সরাসরি বাধ্য না হলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস একা তাঁর আর নেই। ওদিকে আবার শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীর থেকে পাঞ্জাবসহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমান্ত গোটা ভূভাগ জুড়ে শিখ নরপতি রনজিৎ সিংয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য। আজান নামাজ বন্ধ করে দিয়ে তিনি সেখানে মুসলমানদের উপর জুলুমের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন।

নূরউদ্দীন দুঃখপূর্ণ স্বগতোক্তি করলো—কি দুর্যোগ।

বিলায়েত আলী সাহেব বললেন—শুধু তাইই নয়। অমৃতসরের সন্ধির মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে তিনি আঁতাত করে নিয়েছেন। শতদ্রু নদীর পশ্চিমে শিখেরা আর পূর্বে ইংরেজরা যদেচ্ছাচার চালানোর আর মুসিবতে একে অন্যকে সাহায্য করার সমঝোতায় এসেছেন। এই দু'শক্তিরই তামাম আক্রোশ মুসলমান জাতির উপর।

www.pathagar.com

সুতরাং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা ছাড়া অন্য যে কোন স্থান থেকে জিহাদ আরম্ভ করলে, একদিকে ইংরেজ অন্যদিকে শিখ—দু'দিক থেকে এই দু' দুশমনের হামলায় জিহাদ আন্দোলন অংকুরেই বিনাশ হয়ে যাবে।

অনেকেই একবাক্যে বলে উঠলেন—ঠিক ঠিক। এ অবস্থায় এতে কোনই সন্দেহ নেই।

বিলায়েত আলী সাহেব ফের বললেন—অপর পক্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় এখনও অনেক স্বাধীন মুসলমান শাসক, মানে নবাব আমির, আছেন আর শিখদের আগ্রাসনে তাঁরাও অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ওখানে গেলে জিহাদে সহায়তা পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় আমাদের হুজুর সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব ঐ স্থানই বেছে নিয়েছেন।

নূরউদ্দীনসহ সকলেই 'বহুৎ খুব—বহুৎ খুব' আওয়াজ দিয়ে উঠলেন। এরপর কিঞ্চিৎ নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করে জান মুহম্মদ নামের ঐ মুজাহিদ বললো—এই বড় হুজুর সম্বন্ধে—মানে জনাব সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর সম্বন্ধে কিছু বলুন হুজুর। আমাদের অনেকের সাথে তার সরাসরি পরিচয়ও নেই, তার সব কথা আমরা জানিও না। তার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ঃ কিছু মানে? তাঁর জীবনী শুনতে চান?

ঃ তা কথা হলো—কে তিনি, কি তিনি, এমন মহৎ চিন্তা-ভাবনা তার দীলে কেমন করে বা কোন সূত্রে এলো, এতবড় বিশাল আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেয়ার উৎসাহ তিনি কোত্থেকে পেলেন—এসব আর কি।

ঃ তাহলে তো সংক্ষেপে তাঁর জীবনীটাই বলতে হয়।

অনেকেই এক সাথে সমর্থন দিয়ে বললো—বলুন হুজুর, বলুন—

বিলায়েত আলী সাহেব বলতে শুরু করলেন—আপনারা সবাই জানেন, আমাদের হুজুর সাইয়্যীদ আমদ সাহেবের বাড়ী যুক্ত প্রদেশের রায় বেরেলীতে। সেখানে তিনি ঈসায়ী ১৭৮৬ সনে এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়্যীদ মুহম্মদ ইরফান। তার বংশ নবী করিম (সা)-এর বংশের সাথে যুক্ত। তাঁর বংশের সবাই শিক্ষিত লোক। সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরের বড় ভাই সাইয়্যীদ মুহম্মদ ইসহাক দিল্লীর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র 'দার-উল-উলুম'-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে ইসহাক সাহেবের শিক্ষা পরিচালনা করেন শাহ আবদুল আজিজ ও শাহ আবদুল কাদির—যারা দু'জনই ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ও সমাজ সংস্কারের প্রবক্তা শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের পুত্র। হুজুরের আর এক ভাই সাইয়্যীদ মুহম্মদ ইবরাহিম পিন্ডারীর অন্তর্গত টংকের নবাব আমির খানের বাহিনীতে নকরী করতেন। এসব সূত্র পরবর্তীতে সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরের খুব কাজে লাগে।

বিলায়েত আলী সাহেব একটু থামতেই জান মুহম্মদ বললো—তারপর?

ঃ যদিও সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরের ওয়ালেদ হুজুরের বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেন, তবু হুজুর তার প্রাথমিক শিক্ষাটা তার ওয়ালেদের কাছেই পান। অতপর সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরও দিল্লীর এ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ভাইয়েরাই

www.pathagar.com

তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। দিল্লীতে সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরকে শিক্ষা দেন শাহ আবদুল আজিজের ছোটভাই শাহ আবদুল কাদির সাহেব। তিনি তাঁকে কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও ইসলামিক শিক্ষার অন্যান্য শাখায় বিশেষ বুৎপত্তি দান করেন। এ সময় শাহ আবদুল আজিজের দু'ভাতিজা ও জামাতা শাহ মুহম্মদ ইসমাইল ও শাহ আবদুল হাই সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীতে তাঁর বিশিষ্ট সাগরিদ বনে যান। অপর পক্ষে সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর নিজেও সেই সময় শাহ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আর তাঁর পরম ভক্তে পরিণত হন।

মুজাহিদ জীন মুহম্মদ ফের বললো—তাতো বেশ ভাল কথা হুজুর। কিন্তু আমি বলছিলাম, আমাদের বড় হুজুরের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের আর জিহাদ আন্দোলনের এ চেতনাটা—

কথা শেষ করতে না দিয়ে মৌলভী বিলায়েত আলী বললেন—সেই কথাই বলছি আর সেই কথাতেই আসছি। দিল্লীতে এলেম শিক্ষা করতে গিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর দিল্লীর ঐ সেরা আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে যান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের পরিবার ছিল আরবের ওয়াহাবী নেতা শেখ মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ পরিবার। শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব নিজে হজ্ব পালনে গিয়ে আরব থেকে এ হাওয়া দিল্লীতে নিয়ে আসেন। এখান থেকেই নির্ধারিত হয় সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরের ভবিষ্যৎ জিন্দেগীর গতি। দিল্লীর এসব বিশিষ্ট আলেমদের পাণ্ডিত্ব, চেতনা, আর সংস্কার মূলক চিন্তাধারা তার মধ্যেও অংকুরিত হয়। এতে করেই মুসলমান জাতিকে পুনর্জাগরিত করার জন্য সংস্কারমূলক কাজের প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন। বিশেষ করে, তার উস্তাদ শাহ আবদুল আজিজ সাহেবই হুজুরের মেধা ও নেতৃত্বের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে হুজুরকে এ সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

অখণ্ড মনোযোগ সহকারে সকলেই শুনতে লাগলেন। নূরউদ্দীন অতিশয় উৎসাহ-ভরে বলে উঠলেন তারপর জনাব?

বিলায়েত আলী সাহেব বললেন—বিদ্যালাভের পর হুজুর দিল্লী থেকে জন্মস্থানে ফিরে এলেন। কিছুদিন বাড়ীতেই থাকলেন, বিয়েশাদি করলেন আর তার একটা কন্যা সন্তানও জন্মলাভ করলো। এর অল্পদিন পরেই উস্তাদ শাহ আবদুল আজিজের পরামর্শে হুজুর টংকে চলে যান এবং তার ভাই সাইয়্যীদ মুহাম্মদ ইবরাহিমের মতো টংকের নবাব আমির খানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

ঃ হুজুর নকরী করতে গেলেন?

ঃ হ্যাঁ, তিনি কিছুদিন আমির খানের নকরী করেন ঠিকই। তবে আমির খানের বাহিনীতে যোগ দেয়ার অন্য একটা বড় উদ্দেশ্যও ছিল। নবাব আমির খান বাইরে থেকে এসে স্বীয় মেধা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর জোরে টংকের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং নিজেকে টংকের নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাই নকরী করার ইরাদার চেয়ে আমির খানের বাহিনীতে এসে সামরিক বিদ্যায় প্রশিক্ষণ লাভ আর আমির খানের অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হওয়ার ইরাদাই ছিল তার বড়। তাঁর সে

www.pathagar.com

ইরাদা পূর্ণ হয়। তিনি সেনাবাহিনীতে ইমামতি করেন এবং কিছু কিছু লড়াইয়েও সফলভাবে অংশ নেন। আমির খানের ছেলে ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ওয়াজির-উদ্দৌলাহর সাথে হুজুরের খুব আন্তরিকতাও গড়ে উঠে। সাত বছর পর অর্থাৎ আমির খান ইংরেজদের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হতে বাধ্য হলে, সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর সেখান থেকে দিল্লীতে তার উস্তাদের কাছে চলে আসেন।

জান মুহম্মদ বললো—তারপর হুজুর?

ঃ উস্তাদ আবদুল আজিজ হুজুরের প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল মুসলমান সমাজ থেকে বিদাত ও কুসংস্কার দূর করে মুসলমান জাতির পুনর্জাগরণ ঘটানো। কিন্তু দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করে তিনি বুঝলেন, দেশকে আগে বিজাতীয় অধিকার আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে না পারলে, জাতির পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে, তিনি কয়েকটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। প্রথমতঃ এই হিন্দুস্থানকে তিনি 'দার-উল-হারব" বলে ঘোষণা দিলেন এবং জিহাদে অবতীর্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের বুঝিয়ে দিলেন। এরপর, এ জিহাদে নেতৃত্ব দান করার জন্য তিনি আমাদের এ সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করলেন এবং তার আত্মীয় স্বজন ও শিষ্য সাগরিদদের সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরের নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করলেন। শাহ আবদুল আজিজের জামাতা শাহ মুহম্মদ ইসমাইল ও শাহ আবদুল হাইসহ এই সমস্ত লোকজন আমাদের হুজুরের হাতে বাইয়াত হলেন আর তার বিশিষ্ট সাগরিদ বনে গেলেন। তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে শাহ আবদুল আজিজ সাহেব জিহাদ আন্দোলন চালু করার জন্যে একটি সামরিক কমিটি ও একটি প্রচার কমিটি গঠন করলেন।

উপস্থিত সকলেই সমস্বরে আওয়াজ দিলেন—মা'শা আল্লাহ।

বিলায়েত আলী সাহেব বলেই চললেন—সেই থেকে হুজুর এ আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন এবং শাহ ইসমাইল, শাহ আবদুল হাই ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রচার কার্যে বেরিয়ে পড়লেন। গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি প্রচার কাজ চালালেন এবং সর্বত্রই বিপুল সাড়া পেলেন। শত শত লোক এসে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর তার সংস্কার আন্দোলনকে "তরীকায়ে মুহম্মদীয়া" নাম দিলেন এবং শিরক বিদ্যায়াত পরিহার করে তৌহিদের নীতিমালা অটুট ও অবিকৃতভাবে আকড়ে ধরার নসিহত দান করলেন। এর সাথে তিনি দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে একটা প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে জিহাদের মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—তাহলে আপনারা জনাব কবে আর কখন এই আন্দোলনের সাথে সামিল হলেন?

ঃ এই তো পশ্চিমে, মানে গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে প্রচার কাজ শেষ করে হুজুর যখন এ পূর্ব অঞ্চলে এলেন, তখনই। তোমাদের ঐ বাংলা মুলুকের (কলিকাতার) মতোই হুজুরের আদর্শ ও মতবাদ আমাদের এই পাটনার লোকদেরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে, আমি, আমার ভাই ইনায়েত আলী, আত্মীয় ও বন্ধু মাজহার আলী সাহেব সহ এই পাটনার অনেক লোক তার হাতে বাইয়াত হলাম আর হুজুরের

www.pathagar.com

সাগরিদ হওয়ার কিসমত লাভ করলাম। যে বছর হুজুর এখানে এলেন ঐ বছরই মানে ঈসায়ী ১৮১৯ সনে হুজুরের মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা তার প্রিয় সাগরিদ শাহ ইসমাইল সাহেব 'সিরাত-ই-মুস্তাকীম' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এ প্রসঙ্গে জান মুহাম্মদ বললো—হুজুর তো ঐ সনের, মানে ঐ সময়ের পরে কলিকাতায় এসেছিলেন। এই পাটনা পর্যন্ত এসে সেবার তিনি কি তাহলে এখান থেকেই ফিরে গেলেন?

ঃ হ্যাঁ, এখান থেকেই ফিরে যান। এরপরে অর্থাৎ জিহাদের ডাক দেয়ার আগে তিনি হজ্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তার সাগরিদদের হজ্ব পালনে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। হজ্বে যাওয়ার জন্যে তিনি বিহার ও বাংলার পথ বেছে নিলেন। বাংলার কলিকাতা বন্দর হয়ে জাহাজ যোগে আরবে যাবেন স্থির করলেন। চারশত লোক নিয়ে তিনি রায় বেরেলী থেকে বেরুলেন এবং উল্লেখযোগ্য জায়গায় থেমে থেমে তার মতবাদ প্রচার করে পথ চলতে লাগলেন। এতে করে অনেক লোক এসে তার হাতে বাইয়াত হলেন এবং অনেকেই তার সাথে হজ্ব যাত্রী হতে লাগলেন। ফলে কলিকাতায় যখন তিনি পৌঁছলেন, হজ্বে যাওয়ার জন্যে তখন তার সঙ্গী সংখ্যা দুইগুণে দাঁড়ালো। এরপরের খবর আমার চেয়ে এই জনাব ইমামউদ্দীন ও নজীবুল্লা ভাই সাহেবেরাই ভাল জানেন।

নূরউদ্দীন বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জনাবদের মতো আরো কিছু লোকের মুখে আমরা শুনেছি—সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর কলিকাতায় এসে বিপুল সম্বর্ধনা পান।

মৌঃ ইমামউদ্দীন বললেন—বিপুল বলে বিপুল? আমার জানামতে কলিকাতায়, মানে বাংলায় এসে উনি যে সম্বর্ধনা আর সাড়া পেয়েছেন, এতো বেশী সাড়া এই হিন্দুস্থানের আর কোথাও পাননি। হুজুরের অবস্থাপন্ন শিষ্য আর শুভাকাঙ্খীদের অনুদানেই এই এতোলোকের হজ্বের খরচ নির্বাহ হয় আর সে অনুদানের অনেক বেশী অংশটাই এসেছে বাংলা থেকে। হুজুর কলিকাতায় পৌঁছলে কলিকাতার মুসলিম জনতার সে কি উল্লাস আর উৎসাহ।

ঃ জি- জি। না দেখলেও অনেকটা আমরা শুনেছি।

ঃ দেখলে তাজ্জব বনে যেতে। হুজুর তার দলবল নিয়ে আসছেন শুনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ অসংখ্য মুসলমান জনতা তাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এটর্নী জেনারেল ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী মুনশী আমিরউদ্দীন, শেখ ইমাম বকশ আর শেখ গোলাম হোসেন নামের অপর দুই ধনাঢ্য ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ হুজুরদের মেহমানদারীর ব্যাপক ব্যবস্থা নেন। হুজুরদের আগমনের অগ্রিম খবর পেয়ে মুনশী আমিরউদ্দীন সাহেব একাই হুজুরদের থাকার সুব্যবস্থা করার জন্যে অনেকগুলো বড় বড় বাংলো, হল ঘর আর বড় বড় বাড়ী কিছু ভাড়া নেন আর কিছু কিনেই ফেলেন।

অনেকেই আওয়াজ দিলেন—মারহাবা! মারহাবা!

ইমামউদ্দীন সাহেব এরপর বললেন—হুজুর কলিকাতায় তিন মাস থাকেন। আমরা প্রচুর লোক তার হাতে বাইয়াত হলাম। আমাকে, এই নজীবুল্লাহ ভাই

www.pathagar.com

সাহেবকে এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সাগরিদ দিয়ে হুজুর প্রচারদল গঠন করলেন। হুজুরের নির্দেশে হুজুরের মতবাদ নিয়ে আমরা বাংলার বিভিন্ন দিকে বেরুলাম। যেখানেই যাই, লোকজনের সেকি সাড়া! হুজুরের মতবাদ শুনে সেরেফ কলিকাতার আশেপাশের এলাকা থেকেই নয়, সুদূর সিলেট, ঢাকা, এমনকি চট্টগ্রাম থেকেও বিপুল সংখ্যক মুসল্লমান কলিকাতায় এসে হুজুরের হাতে বাইয়াত হলেন আর অনেকেই তার হজ্বের সঙ্গী হলেন। তাকে ঘিরে কলিকাতায়, বিশেষ করে কলিকাতার মিছরীগঞ্জে আর কলূটোলায় এমন সাড়া পড়ে গেল যে, কিছু কিছু অমুসলমানও এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার হাতে বাইয়াত হলেন। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকসহ মহিশূরের মরহুম টিপু সুলতানের দুইপুত্রও তার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

অনেকেই আবার আওয়াজ দিয়ে উঠলেন—আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এসব কথাও কিছু কিছু আমরা জানি আর শুনেছি। তারপরের ঘটনা বলুন হুজুর।

ঃ তার পরের ঘটনা হলো, চল্লিশটি জাহাজের মালিক বিখ্যাত ঐ ব্যবসায়ী গোলাম হোসেনের কয়েকটি জাহাজযোগে কয়েকদলে ভাগ হয়ে হুজুর আরবে গিয়ে পৌছলেন। আরবে গিয়েও তিনি তার প্রচার কার্য অব্যাহত রাখেন। জনাব শাহ মুহম্মদ ইসমাইল ও শাহ আবদুল হাই এ সময় সিরাত-ই-মুস্তাকীম' গ্রন্থখানি আরবীতে অনুবাদ করে বিভিন্ন দেশের হাজীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এখানে এসে হুজুর দ্বীনের সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্থান 'হুদাইবিয়া আর আকাবাতে তার সঙ্গীদের বাইয়াত নবায়ন করেন আর তাদের জিহাদে শরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।

বৈঠকে উপস্থিত অন্য এক মুজাহিদ প্রশ্ন করলেন—এই আরবে এসে হুজুর তাহলে ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে আরো বেশী পরিচিত হলেন, না কি বলেন হুজুর।

ঃ সে তো অবশ্যই। ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে আমাদের হুজুরের আন্দোলনের কিছু মিল আছে এ কারণেই। দিল্লীতে থাকতেই তিনি ওয়াহাবী নেতা শেখ মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সাথে কিছুটা পরিচিত ছিলেন। আরবে এসে আরো অধিক পরিচিত আর তদ্বারা আরো খানিকটা অনুপ্রাণিত হন। তবে ওয়াহাবী আন্দোলনই তার মূল প্রেরণা নয়। মূল প্রেরণা তিনি দিল্লী থেকেই পান, আর দিল্লীর ঐসব বিশিষ্ট আলেমবর্গের চিন্তাচেতনা থেকেই তার মতবাদ গড়ে উঠে।

নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—আরবে তিনি কতদিন ছিলেন জনাব?

ইমামউদ্দীন সাহেব বললেন—এক বছরের কিছুটা বেশী দিন হবে। কলিকাতা হয়েই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন, তাতো তোমরা জানো। ঈসায়ী ১৮২৪ সালে জিহাদের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে করতে তিনি রায় বেরেলীতে ফিরে এলেন। তার বছরখানেক পরেই এইতো জিহাদের ডাক দিয়েছেন হুজুর।

এই সময় উপকেন্দ্রের জনা দু'য়েক কর্মী ব্যস্তভাবে এসে বিলায়েত আলী সাহেবকে বললো—হুজুর, একটু জলদি জলদি এদিকে আসুন। বাংলা থেকে আরো কয়েকদল মুজাহিদ এসে পৌছেছেন। স্থান সংকুলান নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে আর হৈ চৈ শুরু হয়েছে।

ঃ সেকি! আর কেউ ওখানে নেই?

ঃ আমাদের অন্য হুজুরেরা অন্য দিকে ব্যস্ত আছেন। এখন ওখানে কেউ নেই।

www.pathagar.com

কর্মীদের অতপর ইমামউদ্দীন ও নজীবুল্লাহ সাহেবদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো —এই যে, এই হুজুরদের খুঁজে না পেয়ে বাংলার মুজাহিদেরা গোলমাল আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। এছাড়া নূরউদ্দীন সাহেব নামের এখানে কেউ আছেন নাকি ? যশোহর থেকে আগত একদল মুজাহিদ তাকেও খুব খোঁজ করছেন।

নূরউদ্দীন বললো—যশোহর থেকে মানে ? ইয়ারপুর থেকে ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ রকমই কি একটা নাম বললো।

বিলায়েত আলী সাহেব বললেন—চলো- চলো, ঐদিকেই যাই সবাই। আজকের বৈঠক শেষ। কাল আবার বসা যাবে।

ব্যস্তভাবে সকলেই উঠে পড়লেন।

৫

বৈঠক থেকে উঠে এসে নূরউদ্দীন ইয়ারপুর থেকে আগত নয়া বাহিনীর খোঁজ করতে লাগলো। তার ছাউনির কিছুটা কাছে এসেই যে লোকের সে সাক্ষাৎ পেলো, তাকে দেখে নূরউদ্দীন পুলক বিস্ময়ে বলে উঠলো—আরে একি! সোহরাব হোসেন সাহেব, আপনি!

সোহরাব হোসেন নামের সেই লোকটিও উৎফুল্লকণ্ঠে বললো—মা'শা আল্লাহ! আপনি এসে গেছেন ? এসে অবধি আপনাকে আমরা খুঁজছি।

ঃ আমরা মানে ?

ঃ মানে ইয়ারপুরের নয়াবাহিনী। নয়া বাহিনীর মুজাহিদেরা।

ঃ তাঁরা কোথায় ?

ঃ আপনার দলের সাথে এইমাত্র তাদের সামিল করে দিয়ে এলাম।

ঃ আচ্ছা। তা আপনি। আপনি এখানে ?

ঃ আমিও আপনার মতোই এক মুজাহিদ। ইয়ারপুরের দ্বিতীয় দলের সাথে আমি এখানে এসেছি।

ঃ বলেন কি! আপনিও মুজাহিদ দলে ভর্তি হয়েছেন ?

ঃ সে তো বটেই। আমিই নেতৃত্ব দিয়ে এই দ্বিতীয় দল নিয়ে এলাম।

ঃ আপনি ? তা উস্তাদজী, মানে বাহার খাঁ ভাই সাহেব আসেননি ?

সোহরাব হোসেনের উল্লাসে ছেদ পড়লো। সে ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললো—না, উনি হয়তো শেষ পর্যন্ত আসতেই পারবেন না।

নূরউদ্দীন বিস্মিতকণ্ঠে বললো—সেকি! কেন ?

ঃ বেশ কিছুটা বিঘ্ন পয়দা হয়েছে। জেকের আলী তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কেটে পড়েছে। ওদিকে আবার উস্তাদজীর মকানেও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ সে অনেক কথা। আসুন, আমাদের দলের লোকজন নিয়ে আর আপাততঃ ঝামেলা নেই। ঐ ফাঁকে গিয়ে একটু বসি—

www.pathagar.com

ফাঁকে-এসে বসে নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—ব্যাপার কি ? জেকের আলী কেটে পড়লো মানে ?

ঃ ঈর্ষা। মানে হিংসা। লোকটাতো মূলত ভাল নয়। গোড়ায় গলদ। তার বংশের ধারাটা খুব নোংরা। মাঝে মাঝে ভাল হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ভেতরের গলদটা পরক্ষণেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

ঃ তা উঠুক। কিন্তু তার হিংসার কারণ কি ? ঈর্ষা হলো কিসে ?

ঃ থাক। ওসব কথা না-ই বা শুনলেন।

ঃ থাকবে কেন ? খুবই আপত্তিকর ব্যাপার কি ?

ঃ আপত্তিকর মানে—কথাটা আপনাকে নিয়ে—এই আর কি!

ঃ আমাকে নিয়ে!

ঃ হ্যাঁ। এতদিন সে-ই ছিল উস্তাদ বাহার খাঁর দলের গোদা। খাঁ সাহেবের ডানহাত। হঠাৎ আপনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, এটা সে সইতে পারবে কেন ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ তাকে বাদ দিয়ে বাহার খাঁ ভাইসাহেব আমাকে মুজাহিদ দলের অধিনায়ক বানালেন, একি তার কম শরমের কথা ? তার ইজ্জতে ঘা লেগেছে চরম।

ঃ একি বলছেন ? হঠাৎ করেই তো আমাকে অধিনায়ক বানাননি। অনেক আগে আর তাদের মতামত নিয়েই বানিয়েছেন। তারই সমর্থন ছিল উষ্ণ। এরপর একসাথে বেশ কিছুদিন হেসে খেলে কাজ করলাম আমরা। তার আন্তরিকতার মধ্যে তো কোন ফাঁক কখনো দেখিনি ?

ঃ তখন হয়তো কোন কুমন্ত্রণা তার কানে কেউ দেয়নি বলেই দেখেননি। চরিত্র তার নড়বড়ে। শক্ত কুমন্ত্রণা পড়লে, সে আর খাড়া থাকবে কতক্ষণ ?

ঃ বলেন কি ? এমন কুমন্ত্রণা দেয়ার লোক তাহলে কে ?

ঃ অনেকেই। তার বংশের লোক আছে। বদচরিত্রের সঙ্গী সাথী আছে। সবার উপর আছে তার পিয়ারীরা।

ঃ পিয়ারীরা।

ঃ পিয়ারী তার একাধিক বলেই জেনেছি। তবে একজনকে চিনি। ঐ বাহার খাঁ ভাইসাহেবের পাড়ারই মেয়ে। সিতারা বানু নাম। জেকের আলীকে অধিনায়ক না বানিয়ে আপনাকে বানানোর জ্বালাটা নাকি তাকেই দগ্ধ করেছে অধিক।

ঃ তাজ্জব কথা! আপনি এসব জানলেন কি করে ?

ঃ সে অন্য প্রসঙ্গ। পরে একদিন বলবো। আগে বাহার খাঁ ভাই সাহেবের বাড়ীর খবর শুনুন।

ঃ জি বলুন।

ঃ খাঁ সাহেবের বিবি সাহেবা অসুস্থ। আপনারা চলে আসার পরের দিন থেকেই জ্বর। আজও ছাড়েনি।

ঃ খুবই কঠিন হালত কি ?

www.pathagar.com

ঃ কঠিন না হলেও, অনেকটা শয্যাশায়ী। অন্তত বিবিকে ঐ হালতে রেখে অধিক দিনের জন্য কেউ বাড়ী ছাড়তে পারে না।

ঃ হ্যাঁ, তাতো তাই-ই। আসলে এসব কাজে বিবিবাচ্চা না থাকা লোকেরই প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ তো এ কাজে খুবই অনিশ্চিত।

ঃ সে তো অবশ্যই। বড় কারণটা এ রকমই। খাঁ সাহেবের নিঃসন্তান এক চাচা-চাচী আছেন, তাতো শুনেছেন?

ঃ জি-জি। দেখিনি, তবে শুনেছি। তার চাচীর এক ভাই খুবই অসুস্থ—এ খবর পেয়ে তারা দু'জনই সেখানে গিয়ে আছেন, এ পর্যন্ত জেনে এসেছি! তারা কি এখনও ফিরে আসেননি?

ঃ না। তার চাচীর সেই ভাইটা ইন্তেকাল করেছেন।

নূরউদ্দীন চমকে উঠে বললো—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

সোহরাব হোসেন বললো—ভাগের সংসার। ঐ বিধবাটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে গিয়ে তারা আসতে পারছেন না। অংশীদারদের সাথে এ নিয়ে গোলমাল হচ্ছে। তাদের ফিরে আসতে দেরী হবে।

ঃ খুবই সমস্যা তো!

ঃ জব্বোর সমস্যা। এ নিঃসন্তান চাচা-চাচী খাঁ সাহেবকে ছেলে বানিয়ে সম্পত্তিতে তাদের অংশ খাঁ সাহেবকে দিয়েছেন আর নিজের সংসার মনে করে খা সাহেবের সংসার তারাই আগলে রাখেন। এঁদের উপর সংসার ফেলে রেখেই তো বাহার খাঁ সাহেব মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর নানা দিকে লাঠি খেলে বেড়াতে পারেন। জিহাদের জন্য সংসার আর পরিজনদের নিয়ে তিনি ভাবেন না ঠিকই, কিন্তু সংসারটা আগলে রাখার একটা সুব্যবস্থা করে যেতে হবেতো?

ঃ আর বলতে হবে না ভাই। এ অবস্থায় তার আসাই ঠিক হবে না।

ঃ এখানেই শেষ নয়। এর উপরও আবার বোঝার উপর যে শাকের আটি চেপেছে, তাতে জিহাদে আসবেন কি, ঘরের বাইরে বেরোনোই এখন তার দায় হয়ে পড়েছে।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—কি রকম-কি রকম?

সোহরাব হোসেন ইতস্তত করে বললো—এটা তাদের পারিবারিক ব্যাপার। না বলাই ভাল। কিন্তু আপনিও তাদের সাথে অনেকটা একাত্ম হয়ে গেছেন বলেই বলছি। ব্যাপারটা তার বোন রোকসানাকে নিয়ে।

নূরউদ্দীন পুনরায় চমকে উঠে বললো—রোকসানাকে নিয়ে।

ঃ রোকসানা ফিরদৌস নামে বাহার খাঁ ভাই সাহেবের এক বোন আছে, তা জানেন তো? তার শাদির ব্যাপার নিয়ে।

ঃ শাদি! কোথায়—কোথায় শাদি?

ঃ ঐ ইয়ারপুরেরই কয়েকক্রোশ দূরের এক গাঁয়ে। বাহার খাঁ ভাই সাহেব অনেকদিন থেকেই এই চেষ্টা পাচ্ছিলেন। খুবই ভাল ঘর আর বরও খুবই ভাল বর। 'না-না' করতে করতে বরপক্ষ হঠাৎ কয়দিন আগে রাজী হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

ঃ রাজী হয়ে গেলেন ? আর এরা ? কনেপক্ষ ?

ঃ যদিও অনেক অসুবিদা—মানে খাঁ সাহেব মুজাহিদ দল তৈরি করা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, বিবি অসুস্থ, তবু এ মওকা তিনি ছেড়ে দিতে পারলেন না। অনেকদিন পরে 'হ্যা' করেছে বরপক্ষ। গড়িমসি করলে আবার যদি 'না' করে বসেন, এ চিন্তাও ছিল —তার সাথে জিহাদে যাওয়ার আগে বোনটার একটা ব্যবস্থা করে যাওয়াটাও উচিত বলে মনে করলেন তিনি। কারণ, ঐ যে আপনি বললেন, জং জিহাদের কাজে ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত ? আল্লাহ না করুন, দুর্ঘটনা একটা কিছু ঘটলে তার বিবির বাপভাই আছেন, বিবির যা হয় তারা করবেন। কিন্তু বোনটা তার একদম এতিম হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে তার বৃদ্ধ চাচা-চাচীরা মুসিবতে পড়ে যাবেন।

এতকথা নূরউদ্দীনের শুনার সময় ছিল না। কানেও তার গেল না। সে অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করলো— তারপর ? তারপর কি হলো বলুন ? শাদিটা হয়ে গেল ?

সোহরাব হোসেন এবার মৃদু হেসে বললো—কি ব্যাপার! এ কথায় আপনি এত চমকে চমকে উঠছেন কেন ?

ধরাপড়ে গিয়ে নূরউদ্দীন থতমত করে বললো—না, মানে হঠাৎ তার শাদির কথা শুনছিতো ? মানে—তার শাদি—

একইভাবে হেসে সোহরাব হোসেন বললো—তাতে কি হয়েছে ? শাদি হবে না মানুষের ? এতে আপনার এত অস্থির হওয়ার কি আছে ?

ঃ অস্থির! না-না, অস্থির দেখলেন কি ? আমি অস্থির হবো কেন ? কথা হলো—

ঃ দুর্বলতা পয়দা হয়েছে বুঝি ? নজরে ধরেছে তাকে ?

ঃ এ্যাঁ। না-মানে, কি যে বলেন ?

ঃ লাভ নেই লাভ নেই। ও গুড়ে বালি। আগে থেকেই ও মেয়ে বাঁধা পড়ে আছে। কোথায় যেন কঠিনভাবে আটকে আছে সে। টেনে আর তাকে অন্যদিকে সরিয়ে আনা যাবে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ আরে সেই কথাই তো বলছি। 'আঙ্গুর ফল টক'—এই মর্মে মনকে প্রবোধ দিন আর আসল ঘটনা শুনুন।

দুর্বলতা ঢেকে নূরউদ্দীন সতর্ক হয়ে বললো—জি জি, বলুন।

ঃ খুব পছন্দের ঘরবর। গড়িমসি না করে বাহার খাঁ ভাই সাহেব সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি প্রস্তাব দিলেন, ধুমধাপ-আনুষ্ঠানিকতা সুবিধে মতো অন্য সময় করা যাবে। এখন শুধু আকদ্, মানে কলেমাটা হয়ে থাকবে। বরপক্ষের মেয়েরা ইয়ারপুরে বেড়াতে এসে রোকসানাকে আগেই দেখে রেখেছিলেন আর খুব পছন্দও করে রেখেছিলেন। কাজেই, বরপক্ষ তাতেই রাজী হলেন। নিতান্তই ঘরুয়া মাফিক কাজ। বাড়ীতে কোন আলোচনা না করেই খাঁ সাহেব তাই তাদের দিন দিয়ে ফেললেন। খুব তড়িঘড়ি কারবার। মাঝে একদিন বাদেই দিন ধার্য করলেন। সেই মোতাবেক তিনি বরসহ কয়েকজন মুরুব্বীকে আসার জন্যে দাওয়াত দিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

নিজের অজ্ঞাতেই নূরউদ্দীন ফের ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো—তারপর?

ঃ একদিন পরেই বরপক্ষ বর নিয়ে চলে এলেন। কনে পক্ষ ধুমধাম না করলেও, তারা বেশ শানশওকতের সাথে চারদিকে জানান দিয়েই ছেলের শাদি দিতে এলেন।

ঃ তারপর?

ঃ মাথায় হাত। বর এসে পৌছামাত্র রোকসানা সেই যে ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিলো, খিল না ভেঙ্গে কেউ তাকে বের করতে পারলেন না। টেনে-হেঁচড়ে যদিও বা তাকে বের করে আনা হলো, মুণ্ডর মেরেও কেউ তার মুখ খুলতে পারলেন না। অর্থাৎ রোকসানা শাদি কবুল করলো না।

নূরউদ্দীনের শ্বাস-প্রবাহ স্বাভাবিক হলো। এবার সে কিছুটা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—এ্যাঁ! তাই নাকি? এরপর কি হলো?

ঃ যা হবার তাই হলো। উস্তাদ বাহার খাঁর মাথাকাটা গেল। বোন তার নচ্ছার। ভ্রষ্টা। শাদির আগেই অন্যের সাথে লটোঘটো করা মেয়ে। তাদের ঘরের ছেলের সাথে এমন একটা কসবী আর খানকী মেয়ের শাদি দিতে চায় বাহার খাঁ? ডেকে এনে এভাবে অপমান? এ অপমানের শোধ তারা অবশ্যই নেবেন—ইত্যাদি কথ্য অকথ্য নানা ভাষায় গালী গালাজ করতে করতে বর নিয়ে বরপক্ষ চলে গেল।

ঃ জব্বোর ঘটনা তো! এরপর উস্তাদজী কি করলেন? বোনকে বুঝি খুব মারধোর করলেন?

ঃ কি করলেন, তা ঠিক জানিনে। দু' চারটে চড়-থাপ্পড় কি দেননি আবার?

ঃ সোহরাব সাহেব!

ঃ তা ছাড়া মেয়েই বা আর করবেন কি? যা ঘটার তাতো ঘটেই গেল। চারদিকে টি টি পড়ে গেল। খাঁ সাহেব আর বাইরে মুখ দেখাতে পারলেন না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ গাঁয়ে-ভিনগাঁয়ে একথা জানাজানি হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা নানাজন নানা কথা বলতে লাগলো।

ঃ কি বলে?

ঃ বলার কি শেষ আছে? মুখরোচক ব্যাপার। পড়শীদের মুখ ছাঁদবে কে? বিশেষ করে, খন্নাসদের পুলক তখন সপ্তমার্গে উঠে গেল। এক একজন কল্পনায় এক এক কাহিনী রচনা করতে লাগলো। কেউ বলে রোখসানার লটোঘটোটা এর সাথে, কেউ বলে, ওর সাথে। এ বলার পেছনে তারা তার ব্যাখ্যাও দিতে লাগলো। আপনাকে নিয়েও টানাটানি করতে দু' একজন ছাড়েনি। আপনার কথাও উঠেছে।

নূরউদ্দিনের অন্তর শিহরিত হয়ে উঠলো। মনের ভাব লুকিয়ে সে বললো—কি যে বলেন! আমার কথা উঠবে কেন?

সোহরাব হোসেনের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে মুচকি হেসে বললো—উঠলেও ফায়দা নেই। ঐ যে বললাম, এটা কোন ফসকা গেরো—আলগা গেরোর ব্যাপার নয়। একটু চোখে-লাগা ভাল-লাগার বিষয় নয়। যার সাথে সে গেঁথে আছে, একদম পেরেক মারা গাঁথুনীতে গেঁথে আছে। কোন উঠতি প্রেম বা হালকা

www.pathagar.com

পিরীত কাউকে এতটা শক্ত করতে পারে না আর সে জন্যে কেউ এত লাঞ্ছনা ভোগ করতে যায় না। দীলের গভীরে গেঁথে যাওয়া মুহব্বতের বেলাতেই এটা সম্ভব।

ঃ সোহরাব সাহেব!

ঃ কবুল করাতে না পেরে রোকসানাকে তো কম তিরস্কার করেনি কেউ ? ধিক্কারে-লাঞ্ছনায় দীলটা তার কালো করে ছেড়েছে।

ছাউনী থেকে হঠাৎ তলব আসায়, উভয়ে উঠে দ্রুতপদে ছাউনির দিকে ছুটলো।

সে রাতে ঘুম এলো না নূরউদ্দীনের চোখে। রোকসানার মন অন্যখানে বাঁধা আছে আর শক্তভাবে বাঁধা আছে, এটা ভাবতেই মন তার ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগলো। নূরউদ্দীন হতাশ হয়ে পড়লো।

সোহরাবের কথাই ঠিক। রোকসানার দীল সত্যি সত্যিই কোথাও শক্তভাবে আটকে পড়ে না থাকলে, এত গঞ্জনা সত্ত্বেও শাদিটা সে নাকোচ করে দিতো না। ঘর বর সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা শাদি করতে নারাজ হয় তখনই, যখন দীল তার বাধা থাকে অন্যখানে। সাবালিকা হওয়ার পর শাদি হওয়াই যাদের স্বাভাবিক পরিণতি আর স্বতঃস্ফূর্ত আকিঞ্চণ, শাদি করতে না চাওয়ার মধ্যে এছাড়া আর কোন কারণই নেই।

অতএব, এ প্রসঙ্গ মৃত প্রসঙ্গ। রোকসানা ফিরদৌস মুহব্বতে পড়ে আছে, এটা আর অস্পষ্ট কিছু নয়। অস্পষ্ট শুধু সেই ব্যক্তিটা যার সাথে রোকসানা এমন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কে সেই ভাগ্যবান ? এত লাঞ্ছনা সয়েও যার প্রেমিকা তার অপেক্ষায় থাকে, কে সেই খোশ নসীব ইনসান ? নূরউদ্দীন নিজে যে নয়, এটা দিনের মতো পরিষ্কার। নূরউদ্দীনের মুহব্বত একতরফা মুহব্বত। রোকসানাকে দেখে নূরউদ্দীন নিজেই কেবল দিউয়ানা বনে গেছে, রোকসানা দিউয়ানা বনে যায়নি। যাওয়ার কোন কারণও ঘটেনি। প্রসঙ্গও উঠে না বা এমন কোন প্রশ্নও নেই। মুহব্বত তো দূরের কথা, নূরউদ্দীনকে রোকসানার আদৌ কিছু ভাল লাগে কিনা, তাই বা কে বলবে ? সেদিনের সেই জানালার ধারে সাক্ষাৎ কালে রোকসানার মুখে ক্ষিপ্রিৎ হাসির রেখা ফুটে উঠলেও, পরক্ষণেই তার চোখে মুখে যে বিরক্তি আর অনিহা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে, তাতে তার উপর রোকসানার কিছু মাত্র খোশনজর আছে, এমনটি ভাবা যায় না।

নূরউদ্দীন সজোরে নিঃশ্বাস ফেললো। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু সবই বৃথা। হাজার প্রশ্ন আবার তার মনের কোণে এসে কাতার ধরে দাঁড়ালো। রোকসানা শেষ পর্যন্ত মরিচিকাই হয়ে গেল কি ? তার এ আকুলতা আর নির্মল আকিঞ্চন পুরোটাই ব্যর্থ হয়ে গেল কি ? তাই যদি হবে, বিদায় নিয়ে আসার দিন রোকসানাকে এতটা করুণ দেখা যাবে কেন ? দেউটিতে সে এতক্ষণ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ? সোহরাব হোসেনের সব জানাই কি নির্ভুল ? সে ভিন গাঁয়ের লোক। এতটা সে জানলোই বা কি করে ? তার জানার মধ্যে কিছুটা ফাঁকও তো থাকতে পারে ?

www.pathagar.com

ফাঁক থাকুক, এইটেই এখন আল্লাহর কাছে নূরউদ্দীনের ঐকান্তিক আরজ। জানতে কিছু ভুল করুক সোহরাব হোসেন।

সোহরাব হোসেন। সৎ সুন্দর নওজোয়ান। সৎবংশজাত আর খোলা দীলের মানুষ। অত্যন্ত ধনাঢ্য ঘরের ছেলে। অহংকার-অহমিকা জাররা মাত্র এ নিয়ে তার মধ্যে নেই। সেও একজন লাঠিয়াল। শক্ত লাঠিয়াল। নূরউদ্দীনের সমকক্ষ না হলেও, খাটোও খুব নয়। সোহরাব হোসেনের সাথে মাদারীপুরেই নূরউদ্দীনের পরিচয়। পরিচয় এই লাঠি খেলার মাধ্যমেই।

সোহরাব হোসেনের বাড়ী যশোহরে। ইয়ারপুরের কয়েক গাঁ ফাঁকে এক গাঁয়ে। কিন্তু সোহরাব হোসেনের দিন কাটে নূরউদ্দীনদের মাদারীপুরেই অধিক। মাদারীপুরের নবীগঞ্জে। লেখাপড়ার সূত্র ধরে সোহরাব হোসেন নবীগঞ্জে তার নানাজানের বাড়ীতে এসে থাকে এবং সেখানেই লেখাপড়া করে। লেখাপড়াটা একদিন শেষ হয়, কিন্তু নানার বাড়ীতে অবস্থান তার শেষ হয় না। অধিক সময়ই সে এসে তার নানার বাড়ীতে থাকে। কারণও ছিল শক্ত ও নানাবিধ। বড় কারণ বন্ধু-বান্ধব আর খেলা। নূরউদ্দীনের মতোই লেখাপড়া শেষ হতে না হতেই লাঠিখেলার নেশা তাকেও পেয়ে বসে। খেলার ধূম এদিকেই লেগে থাকে সর্বাধিক আর এখানেই গড়ে উঠে তার বন্ধু-বান্ধবের পরিমণ্ডল।

লাঠি খেলার সুবাদেই নূরউদ্দীনের সাথে সোহরাব হোসেনের পরিচয়। দু'জনে সফেদ দীলের মানুষ। এ পরিচয় থেকে অল্পদিনেই দু'য়ের মধ্যে গড়ে উঠে গভীর বন্ধুত্ব। গভীরতম সম্প্রীতি। মাতাপিতার দুর্নিবার আহ্বানে সোহরাব হোসেন নিজের বাড়ীতে চলে গেলে, উভয়ে উভয় থেকে ফারাগ হয়ে যায়। অনেকদিন আর দু'য়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকে না। পাটনার এ উপকেন্দ্রে এসে আবার এই হঠাৎ তাদের মোলাকাত।

রাত পোহালে নূরউদ্দীন ও সোহরাব হোসেন উভয়েই দল সংক্রান্ত নিজ নিজ দায়িত্ব শেষ করলো। কুচকাওয়াজ আর ওয়াজ-নসিহত অন্তে দু' দোস্ত আবার এসে নিরিবিলিতে বসলো। অল্প কিছু কথার পরেই নূরউদ্দীন বললো—সোহরাব সাহেব, একটা কথা আমার কাছে এখনও কিন্তু পরিষ্কার হয়নি। আপনার মকান তো ইয়ারপুর থেকে অনেক খানি ফাঁকে। আপনি এসে উস্তাদ বাহার খাঁর দলের সাথে সামিল হলেন কি করে?

সোহরাব হোসেন হেসে বললো—উস্তাদ বাহার খাঁ যে আমারও উস্তাদ। লাঠি খেলার প্রসঙ্গেই তার সাথে আমার সৌহার্দ গড়ে উঠে আর আমি তাঁকে অগ্রজসম শ্রদ্ধা করি।

ঃ কি রকম?

ঃ প্রথমে ভিনগাঁয়ে লাঠি খেলতে গিয়ে তার সাথে আমার পরিচয় হয়। এরপর তার ডাকে মাঝে মধ্যেই ইয়ারপুরে খেলতে আসি আর কিছু কিছু ছবকও তার কাছে নিই।

www.pathagar.com

ঃ বলেন কি।

ঃ উস্তাদ বাহার খাঁ সাহেব যখন জিহাদের ডাক দিলেন আর লাঠিয়াল বাছাই করতে লাগলেন, সে ডাক আমার কাছেই পৌঁছে। আমার আব্বাজান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হতে পারিনি। দল নিয়ে আপনি চলে আসার পর দ্বিতীয় দল উনি যখন গঠন করতে লাগলেন, সেই সময় আমি এসে ঐ দ্বিতীয় দলে সামিল হলাম।

আবার একটু ইতস্তত করে নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—তা উস্তাদজীর বোনের শাদির ব্যাপারে এত কথা জানলেন আপনি কি করে? সেই সময় কি আপনি ঐ ইয়ারপুরেই—

ঃ জি জি। আমি ঐ ইয়ারপুরেই ছিলাম। ঠিক শাদির দিন না থাকলেও, আগে পরে সবসময়ই ছিলাম। সবই আমি শুনেছি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আপনিও যে প্রায়ই খাঁ সাহেবের মকানে যাতায়াত করতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন, তাও শুনেছি। তাঁরা যে সবাই আপনাকে খুবই প্রীতির চোখে দেখেন, তাও জেনেছি। আপনার তারিফে তো দেখলাম উস্তাদজীসহ ও বাড়ীর আর পাড়ার প্রায় সকলেই মুখর।

নূরউদ্দীন খোশদীলে বললো—সত্যি?

ঃ প্রথমে তো আপনাকে নিয়ে আমারও সন্দেহ হয়েছিল। শাদিতে রোকসানার নারাজ হওয়ার কারণটা আপনিই, এ ধারণাই হয়েছিল আমার।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হবে না? এমন লোভনীয় চেহারা নিয়ে ঐ পরিবারের একজন হয়ে থাকবেন আর রোকসানার নজর আপনার উপর পড়বে না? আর নজর একবার পড়লে মন তার টলবে না—এটা কি কোন কথা হতে পারে?

ঃ তারপর?

ঃ কিন্তু নানাভাবে খোঁজ নিয়ে দেখলাম আপনার সাথে তার গভীর মুহব্বত গড়ে উঠার তেমন কোন অবকাশ হয়নি। তেমন জটিল কোন ভাব কেউ লক্ষ্যও করেনি।

ঃ কি রকম?

ঃ আপনাকে রোকসানার বেশ পছন্দ এই পর্যন্ত জেনেছি। বেশ বলি কেন, খুবই পছন্দ। কিন্তু এত গঞ্জনা সহ্য করে শাদি নাকোচ করতে যে গভীর মুহব্বত প্রয়োজন, তার সাথে আপনার সে মুহব্বত গড়ে উঠার কোন ফাঁকই ছিল না। রোকসানার সে মুহব্বত অন্য কোনখানে আর অন্য কারো সাথে। আপনাকে তার সেরেফ পছন্দ হওয়া—ভাললাগার ব্যাপার এটা নয়।

নূরউদ্দীন বিপুল বিস্ময়ে বললেন—কি তাজ্জব! আপনি যে একদম নাড়ীর খবর করে বেড়াচ্ছেন সোহরাব সাহেব? উস্তাদজীর পরিবারের সাথে অনেকখানি অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও যে খবর আমি কিছুই জানিনে, আপনি তা এমন নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন কিভাবে? তাদের পরিবারের কেউ কি এসব বলেছেন?

www.pathagar.com

ঃ পরিবারের কেউ!

ঃ তা নাহলে এসব আপনি জানবেন কি করে ? আমাকে কিছুটা পছন্দ হয়েছে —ভাল লেগেছে তার, রোকসানার এসব ব্যক্তিগত কথা আপনি জানলেন কার কাছে ? রোকসানার সাথে কি কোন কথা হয়েছে আপনার ?

ঃ আরে ধ্যাৎ। কি যে বলেন! রোকসানাকে ভাল করে দেখিইনি আমি। নেকাব ঢাকা অবস্থায় দূর থেকে একদিনই কেবল আবছা আবছা দেখেছি। এর অধিক নয়। তার সাথে কথা হবে কি করে ?

ঃ তাহলে ? আপনার বাড়ী অন্য গাঁয়ে। কোন আত্মীয় স্বজনও ইয়ারপুরে নেই। ইয়ারপুরের এতসব নারীঘটিত ব্যাপার আপনি জানলেন কি করে ?

সোহরাব হোসেন হেসে বললো—নারীঘটিত ব্যাপার ?

নূরউদ্দীন বললো—বিলকুল। সিতারা বানু নামের কোন্ মেয়ের কোন্ মর্মজ্বালা, আমার প্রতি রোকসানার কি অনুভূতি—এসব এমন নিক্তি ধরে মেপে মেপে কি করে আপনি বলছেন ? কোন পুরুষ মানুষের তো জানার কথা নয় এসব যে, তার কাছে আপনি শুনবেন ?

সোহরাব হোসেন আবার একটু চাপা হাসি হেসে নীরব হয়ে গেল। তা দেখে নূরউদ্দীন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার! নীরব হয়ে গেলেন যে ?

ঃ ও সব কথা রাখুন তো! কি সব ফালুত আলাপ। এদিকের কথা বলুন।

নূরউদ্দীন আরো তৎপর হয়ে বললো—বটে ? এড়িয়ে যেতে চান ? বেমালুম চেপে যাওয়ার খাহেশ ? ওসব পাঁয়তারা দেখছে কে ? রহস্যটা কি বলুন।

ঃ রহস্য! রহস্য আবার কি ?

ঃ দেখুন সোহরাব সাহেব, যতই চিপবেন ততই তেঁতো হবে। ফ্যাসাদ না বাড়িয়ে সোজাসুজি বলে ফেলুন। ছেড়ে কথা নেই।

ঃ ওরে বাপরে। একদম নাছোড় বান্দা ?

ঃ হবো না ? জেনানাদের কথা মর্দানার মুখে! একি কম সাংঘাতিক কথা ? কোথায় পেলেন এসব।

ঃ ঐ একজন জেনানার কাছেই।

ঃ জেনানা!

ঃ মানে আউরত। জেনানা মানে বুঝেন না ?

ঃ মা'শা আল্লাহ! তাই বলুন। তা কে সেই জেনানা ? কি সম্পর্ক তার সাথে আপনার ?

ঃ মুহব্বতের সম্পর্ক।

ঃ খবরদার! মশকরা করবেন না। ঠিক ঠিক বলুন।

ঃ আরে মশকরা করবো কেন ? ঠিক ঠিকই তো বলছি। মুহব্বতের কথাটা কি কেবল মশকরার কথা ? আমার কি কারো সাথে থাকতে পারে না মুহব্বত ?

ঃ মারকাটারী! সত্যি ?

ঃ সত্যিই। সে আবার রোকসানার সব কথা জানে কিনা ?

www.pathagar.com

ঃ সোবহান আল্লাহ! কে তিনি ? সে ভদ্রমহিলার বাড়ী কোথায় ?

সোহরাব হোসেন ফের হেসে বললো—ভদ্র মহিলা নয়। তরুণী। নওজোয়ানী। বাড়ী ঐ ইয়ারপুরেই।

ঃ ইয়ারপুরেই ? সাব্বাস! কোন পাড়ায় ?

ঃ মধ্য পাড়ায়।

ঃ কি নাম ?

ঃ যা-ব্বাবা! এ আবার কোন উকিল ? রীতিমতো জেরা শুরু করলেন যে ?

ঃ দেখুন সোহরাব সাহেব, আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে ফের টেনে ধরবেন না। খুব খারাপ লাগে।

ঃ তার নাম সাবিহা আরজু।

ঃ সাবিহা আরজু ? মানে তার সাথে আপনার মুহব্বত? আলহামদুলিল্লাহ। তা সে মুহব্বতটা কেমন করে হলো ? কোথায় হলো ? কই, এসব তো কোনদিন কিছুই বলেননি ?

ঃ বলার মওকা হয়নি, তাই বলিনি।

ঃ হালে মুহব্বত বুঝি ?

ঃ জিনা, সাবেক। পুরাতন।

ঃ পুরাতন ? যাঃ সঙ্কট! তাহলে বহুদিন থেকেই আপনার ঐ ইয়ারপুরে যাতায়াত ?

ঃ ইয়ারপুরে নয়, আপনাদের ঐ মাদারীপুরে। মুহব্বতটা ওখানেই। ওখানেই পরিচয়, ওখানেই শুরু।

চোখ মুখ ফুটিয়ে তুলে নূরউদ্দীন বললো—কম্মকাবার। এত গভীর পানির মাছ আপনি ? এতদিন এক সাথে থাকলাম, তবু এর কোন আভাস-ইঙ্গিত পেলাম না ? তা যাক, ইয়ারপুরের মেয়ের সাথে মাদারীপুরে কি করে মুহব্বত হলো আপনার। একি ভানুমতির খেল।

ঃ জিনা, যোগাযোগের খেল্।

ঃ অর্থাৎ।

ঃ আমার নানাজানের বাড়ীর সাথে একদম লাগানো বাড়ীটাই সাবিহা আরজুর খালুজানের বাড়ী। লাগালাগি দেয়াল আর এক গলি দিয়েই দু'বাড়ীর লোকজনের দিঘীর ঘাটে যাওয়ার পথ। ঐ পথই আমার জিন্দেগীর পথ ঘুরিয়ে দিলো।

ঃ খোলাসা করে বলুন। কিভাবে ঘুরিয়ে দিলো ?

ঃ সাবিহা আরজুর খালাজান একটি সন্তান প্রসব করে একদম শয্যা নিলেন। তিনচার মাসের মধ্যে আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। সংসার তাদের ছোট। লোক সংখ্যা কম। জেনানা বলতে বাড়ীতে সাবিহার খালুজান জাবেদ মাসুদের বৃদ্ধা আম্মা আর এক কাজের বেটি। কাজের বেটিও ফের তার মেয়ের অসুখে মেয়ের বাড়ীতে আটক। এখন সদ্যজাত শিশু আর ঐ আঁধমরা প্রসূতিকে নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটি একা একা করেন কি ?

ঃ তারপর ?

www.pathagar.com

ঃ সাবিহা আরজুর খালা সাবিহা আরজুর আম্মার কোলেপিঠে মানুষ করা একমাত্র বোন। সাবিহার নানীজানও বেঁচে নেই। তাই, বহিনের শুশ্রূষায় সাবিহা আরজুর আম্মাজানকেই আসতে হলো। সাথে এলো সাবিহা। তরুণী সাবিহা আরজু।

ঃ আচ্ছা।

ঃ মাস খানেক পরে নিজের সংসার সামলাতে সাবিহার আম্মাকে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরে আসতে হলো। উঠে দাঁড়ানোর সামর্থ তখনও ফিরে আসেনি বহিনের। ফলে, বাধ্য হয়েই বহিনের খেদমতে সাবিহাকে রেখে যেতে হলো তাঁকে। সাবিহা আরজু মাদারীপুরের নবীগঞ্জে রয়ে গেল।

ঃ সাবিহা একাই রয়ে গেল?

ঃ রয়েই শুধু গেল না, একটানা তিন মাস সে সেখানে রইলো।

নূরউদ্দীন হেসে বললো—আর অমনি আপনার নজর পড়লো তার উপর?

মৃদু আপত্তির সুরে সোহরাব হোসেন বললো—আরে দূর! তাই পড়ে, না পড়াটা উচিত?

ঃ তাহলে?

ঃ ঘটনাক্রমে পড়লো। ঐ যে বললাম, একদম লাগালাগি বাড়ী আর দিঘীর পথ একটাই। যথেষ্ট সামাল সতর্ক হয়ে চলাফেরা সত্ত্বেও একে অপরের নজরে একাধিকবার পড়ে গেলাম। নিকটে নদী নেই। গোছল অজু আর মাজা ধোয়ার প্রয়োজনে হামেশাই যেতে হয় দিঘীতে। নেকাব সে কতক্ষণ আর কতবার রাখবে মুখে, আর আমিই বা কতক্ষণ মাটির দিকে নজর রেখে হাঁটবো? অতএব—

ঃ অতএব চোখাচোখী আর খড়-আগুন পাশাপাশি হওয়ার ফলে অগ্নিকাণ্ড। এই তো?

নূরউদ্দীন হাসতে লাগলো। সোহরাব হোসেনও হেসে বললো—হ্যাঁ। যা শাশ্বত তা অস্বীকার করবো কি করে? তাছাড়া আমার এই প্যাঁচামুখে কি সে দেখলো জানিনে, তার নেকাব খোলা মুখ খানা পরপর কয়েকবার দেখে আমি ঘায়েল হয়ে গেলাম। সত্যিই বড় অপূর্ব আর মায়াভরা মুখখানা। আমি মায়ার বাঁধনে আটকে গেলাম।

ঃ আর তিনি?

ঃ ঐ যে বললাম, আমার এই বাদুরচাটা চেহারাখানা তারও যে কেন এত ভাল লেগে গেলো—

ঃ ভণিতা করছেন কেন? আপনার চেহারা কি বাদুরচাটা চেহারা? এমন পাকা আপেলের মতো টসটসে চেহারা আপনি তার সামনে তুলে ধরে বেড়াবেন আর ভাল লাগবে না দেখে তার? আরে ইয়ার, আপনার এই চেহারা মোবারক ঐভাবে অনুক্ষণ কোন বাদশাজাদীর চোখের সামনে মেলে ধরে রাখলেও তো ধেঁধেঁ যাবে চোখ তার।

সোহরাব হোসেন ঈষৎ হেসে বললো—ভণিতা এবার সত্যি সত্যি আপনিই করলেন কিন্তু। আমার নিজের চেহারা সঠিকভাবে নিজে দেখতে না পেলেও আমি বুঝি, কোন বাদশাহজাদীর চোখ ধাঁধাঁনো চেহারা নির্ঘাত আমার নয়। তা সে যাক,

www.pathagar.com

এভাবে আপনাদের জেলার ঐ নবীগঞ্জে সাবিহা আরজুর সাথে আমার পরিচয় আর এই জানাশুনা বা মুহব্বত, যা-ই আপনি বলেন একে।

ঃ সাব্বাস!

ঃ এরপর আরো কয়েকবার সাবিহা আরজু তার খালার বাড়ীতে আসে—

ঃ আর লুকিয়ে লুকিয়ে আপনারা মুহব্বতের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে থাকেন?

ঃ নারে ভাই। লুকিয়ে রাখার ব্যাপার এটা নয় আর লুকিয়েও থাকেনি। অল্পদিনেই জানাজানি হয়ে যায়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমার নানাজান, সাবিহার খালুজান, এমনকি সাবিহার আম্মাও ঘটনাটা কিছুদিন পরেই ভালভাবে জেনে ফেলেন।

ঃ কি তাজ্জব! এরপরও শাদি না করে এতদিন ধরে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি? তাঁরাও তাতে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন?

ঃ পাগল! তাই কি কেউ দেয়? শাদির কথা তখনই উঠে আর সাবিহার খালুজানই সে পয়গাম নিয়ে আমার আব্বার কাছে যান।

ঃ বহুৎ খুব! তার ফলাফল?

ঃ সুখপ্রদ নয়। গোলমালটা বেধে গেল তখনই।

ঃ গোলমাল! গোলমালের বিষয়?

ঃ জাত্যাভিমান। সাবিহার আব্বারা আমাদের চলমান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাত বংশে খাটো। তারা কারিকর। অর্থাৎ তাঁতের কাজই তাদের পূর্বপুরুষের প্রধান জীবিকা ছিল। তাঁদের উপাধি জোলা। আর আমাদের জাতবংশ তার বিপরীত। আমাদের বংশ সৈয়দ বংশ। অন্তত এ পরিচয়েই পরিচিত। আরবের খোদ কোরাইশ গোত্র আমাদের পূর্ব পুরুষ বলে আমার বাপ-চাচারা ঢোল পিটেন হরওয়াক্ত। অর্থবিত্ত আর বংশ বুনিয়াদ নিয়ে কয়েকটা গাঁয়ের মধ্যে আমার বাপ-চাচাদেরই দাপট-প্রতাপ সর্বাধিক। কাজেই বুঝতে পারছেন, সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

ঃ তারপর?

ঃ চরম আপত্তি উঠলো। আমার আব্বাজান যদি বা শেষ পর্যন্ত নরম হলেন কিছুটা, আমার চাচাজানেরা, বিশেষ করে ছোট চাচা, পাহাড়ের মতো অটল হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার ছোট চাচীজান নাকি কবেকার কোন এক পাতি নবাবের বংশধর। জোলার মেয়ে ঘরে আনলে চাচাজান তার শ্বশুর বাড়ীতে আর চাচীজান তার নবাব জাতীয় পিতৃকুলে মুখ দেখাতে পারবেন না। একান্ন পরিবার। এতবড় বিরোধিতার মুখে আমার আব্বাজান কিছুটা নরম হলেও, পারিবারিক অশান্তি চিন্তা করে নীরব হয়ে গেলেন। মুখ খুলতে পারলেন না।

ঃ অর্থাৎ শাদির পয়গাম নাকোচ করে দিলেন সবাই?

ঃ সবাই নয়। আমার আম্মাজান ঐকান্তিকভাবে এই শাদির পক্ষে। আমার নানাজানও। অন্যেরা নাকোচ করে দিলেও, আমার আম্মাজান নবীগঞ্জে এসে আমার নানাজানকে সাথে নিয়ে কনেপক্ষকে সমঝালেন। সাবিহার আম্মাজান আর খালুজানকে

www.pathagar.com

আমার আম্মাজান বললেন, যেভাবেই হোক আল্লাহ চাহেতো ছেলের শাদি তিনি এখানেই দেবেন। ছেলের বাপের অমত নেই। তার চাচারা একটু নরম হলেই বা তাদের ভাঙ্গবো ভাঙ্গবো করা একান্ন পরিবারটা ভেঙ্গে গেলেই সাবিহা আরজুর সাথে ছেলের শাদি তিনি নিজে উপস্থিত থেকে পড়িয়ে দেবেন। এই কয়টা দিন ধৈর্য ধরার জন্যে আর সাবিহার শাদি অন্য কোথাও দেয়ার চেষ্টা না করার জন্যে আমার আম্মাজান কনেপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেলেন।

ঃ মারহাবা! সেই থেকেই তারা তাহলে অপেক্ষা করে আছেন?

ঃ হ্যাঁ। বেশী দিনের তো কথা নয়। আমিও সেই থেকে এন্তেজারে আছি। দেখা যাক, শিকে কবে ছিঁড়ে।

সোহরাব হোসেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। নূরউদ্দীন বললো—ঘর সংসারই করার ইচ্ছে যখন, তখন আর এ জিহাদে আশার খাহেশ হলো কেন হঠাৎ? এ. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে?

ঃ এই জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে এটাকে আমার একটা প্রতিবাদও বলতে পারেন। তাছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, হায়াত মউত আল্লাহর হাতে। ওনিয়ে ভাবতে যাবো কেন? যেখানে আর যখন আমার মউত তিনি স্থির করে রেখেছেন, সেখানে আর তখনই তা হবে। আমি ভেবে এড়াতে পারবো কি?

ঃ তা ঠিক—তা ঠিক।

ঃ ওদিকে আবার এন্তেজারে বসে বসে সময়ও কাটে না। তাই 'হক মাওলা' আওয়াজ দিয়ে ঢুকে পড়লাম মুজাহিদ দলে।

ঃ আপনার বাপ-চাচারা আপত্তি করেননি? আপনি জঙ্গী দলে আসছেন—

ঃ করেছেন। কিন্তু শুনছে কে? এটাতো আর জোলার মেয়েকে শাদি করা নয়, মহৎ কাজ। বাধা আমি মানবো কেন? লাঠি হাতে চলে এলাম ইয়ারপুরে।

ঃ বহুত আচ্ছা। ইয়ারপুরে এসে উস্তাদজীর মকানে উঠলেন?

ঃ জি। উস্তাদজীর সাথে মুজাহিদ দল গঠন করতে লাগলাম আর তার পরিবারের ঘটনা দুর্ঘটনা সবকিছু দেখতে লাগলাম।

ঃ তাহলে ইয়ারপুরের ঐ সব নারীঘটিত খবরবার্তা সাবিহা আরজু বহিনের মাধ্যমেই পেলেন?

ঃ সে তো অবশ্যই। ঐ গাঁয়েরই মেয়ে, তার উপর আবার রোকসানার বান্ধবী। সিতারা বানুর সাথেও মেলামেশা আছে। কাজেই, সেতো সব জানবেই।

ঃ তাই? তাহলে কার মুহব্বতে আটকা পড়ে রোকসানা ফিরদৌস শাদিতে নারাজ হলো। এ খবর তিনি পাননি?

ঃ না। শাদি সে করবে না একথাই বলেছে। কেন শাদি করবে না আর কাউকে সে ভালবাসে কিনা—এ ব্যাপারে রোকসানা মুখ খুলেনি। অনেক চেষ্টা করেও সাবিহা সে কথা আদায় করতে পারেনি।

নূরউদ্দীনের দীলে কিছুটা আশার আলো জ্বলে উঠলো। তার প্রতিই রোকসানা

www.pathagar.com

আকৃষ্ট কিনা, বসে বসে এ চিন্তাই সে করতে লাগলো। তাকে নীরব দেখে সোহরাব হোসেন প্রশ্ন করলো—কি হলো? চুপচাপ কি ভাবছেন?

সম্বিতে এসে নূরউদ্দীন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—না মানে, এতক্ষণে বুঝলাম। বুঝলাম মানে, আপনি এতসব কি করে জানলেন, তা এবার বুঝলাম।

ঃ বুঝলেন? বুঝলেন তো হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলেন কেন?

ঃ আনমনা? হ্যাঁ, আনমনা তো হবোই। এমন আজব ব্যাপার।

ঃ আজব ব্যাপার?

নিজেকে সামলে নিয়ে নূরউদ্দীন হাসিমুখে বললো—বিলকুল-বিলকুল। তা দোস্ত, আপনার হায়া আক্কেল দেখে তো ফের তাজ্জব বনে যাচ্ছি আমি?

ঃ কি রকম?

ঃ অনূঢ়া পত্নীর পিত্রালয়ে যাওয়াটা কি খুবই সঙ্গত কাজ আপনার?

সোহরাব হোসেন সবিস্ময়ে বললো—অনূঢ়া পত্নী!

ঃ জি। অনূঢ়া শ্বশুড় বাড়ী। শাদি হয়নি তো আরজু বহিনের সাথে আপনার। তিনি এখনও অনূঢ়া। সেই অনূঢ়া পত্নীর পিত্রালয়ে, মানে অনূঢ়া শ্বশুর বাড়ীতে, আপনার এই ঘন ঘন আর চুপি চুপি যাতায়াত—

ঃ আরে দূর! ঘন ঘন আর চুপি চুপি হবে কেন? সাবিহার আব্বা-আম্মার আহবানেই দুই একবার গিয়েছি। তাঁদেরই গাঁয়ে গিয়ে আছি।

অন্তত আমাদের কুশলাকুশল জানার জন্য তারা আমাকে একবারও আহ্বান করবেন না, একি কখনও হয়? বিশেষ করে সম্পর্কটা মোটামুটি পাকা হয়ে আছে যেখানে।

ঃ তাই আপনি গেলেন?

ঃ জি, গেলাম আর পর্দার আড়াল থেকে আমার ঐ হবু পত্নীর মুখে ঐ সব নারীঘটিত ঘটনাবলী সংক্ষেপে শুনলাম।

নূরউদ্দীন কপটরোষে বললো—তবেরে বেত্তমিজ। হবুপত্নীর সাথে যে শাদির আগে আলাপ সালাপ চলে না—এ হুঁশ আপনার হয়নি?

ঃ কই আর হলো। গরু হারালে এই রকমই হয়রে মা!

উভয়েই হেসে উঠলো।

৬

কয়েকদিন পরে মার মার রবে রায় বেরেলীর পথ ধরলেন মুজাহিদেরা। মৌলভী বিলায়েত আলী সাহেবেরাই নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেলেন। রায় বেরেলীতে পৌঁছে তারা দেখলেন, সেখানেও অনেক মুজাহিদ জমায়েত হয়ে আছেন। সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের প্রিয় সাগরিদ শাহ মুহম্মদ ইসমাইল আর শাহ আবদুল হাই সাহেবেরাও দিল্লী থেকে কয়েক শত মুজাহিদ নিয়ে এসে রায় বেরেলীতে পৌঁছেছেন। বাংলা ও

www.pathagar.com

বিহার থেকে আশাতীত পরিমাণ মুজাহিদ এসে হাজির হওয়ায় জনাব সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভী অত্যন্ত খুশী হলেন। বিলায়েত আলী সহ সবাইকে তিনি খোশ আমদেদ ও মোবারকবাদ জানালেন।

এরপর শুরু হলো সামরিক প্রশিক্ষণ। মুজাহিদদের প্রায় সকলেই বেসামরিক লোক। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই বেসামরিক লোকদের বড় হাতিয়ার লাঠি। এখানেই কেউ কেউ বড় উস্তাদ। কিন্তু ঢাল-তলোয়ার, তীর-বল্লম আর গোলাবারুদের সামনে লাঠি কোন অস্ত্রই নয়। তাই, বেশ কিছুদিন যাবত মুজাহিদদের সামরিক বিদ্যা, প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন, জান মুহম্মদ ও আরো কিছু শক্ত লাঠিয়ালরা এ সামরিক শিক্ষা খুব ভালভাবে রপ্ত করলো। টংকের আমির খানের বাহিনীতে থেকে সাইয়্যীদ আহমদ নিজে সৈন্য পরিচালনায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বিলায়েত আলী, শাহ ইসমাইল, শাহ আবদুল হাই প্রমুখ আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গভীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৈন্য পরিচালনার উপযোগী করে নেয়া হলো। প্রশিক্ষণ অন্তে মুজাহিদ নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এ সময় মৌলভী বিলায়েত আলী সাইয়্যীদ আহম্মদ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন—হুজুর কোন পথে আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাবো, তা কি চিন্তা কিছু করেছেন?

জবাবে সাইয়্যীদ আহমদ বললেন—হ্যাঁ, করেছি। সেখানে যাওয়ার পথ তিনটি। এ রায় বেরেলী হয়ে সোজাপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যেতে হলে শিকরাজা রনজিত সিং-এর পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যা কল্পনা করা যায় না। রনজিত সিং তার প্রাণ থাকতে পথ আমাদের দেবে না। জোর করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করলে, আমাদের প্রাণই থাকবে না। ঐ বৈরী পরিবেশে শিখদের সর্বাত্মক হামলায় পথেই আমাদের কবর রচনা হবে।

ঃ হুজুর।

ঃ দ্বিতীয় পথ পিণ্ডারীর টংক হয়ে রাজপুতানা ও সিন্ধু প্রদেশ ঘুরে। কিন্তু এ পথেও আবার এখান থেকে কিছুদূর এগুলেই সামনে মারাঠারাজ্য গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়র রাজ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে, এ পথেই যাওয়ার ইরাদা রাখি।

ঃ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ান? অর্থাৎ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেন?

ঃ তাহলে তৃতীয় পথ ধরতে হবে। আরো দক্ষিণ-পূর্বে ঘুরে আমাদের টংকে গিয়ে পৌছতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস, গোয়ালিয়র অধিপতি দৌলতরাও সিন্ধিয়া বাধা হয়ে না দাঁড়াতেও পারেন। তাঁর সম্বন্ধে ধারণা আমার খারাপ নয়।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে তো খুব আশার কথা।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে সাইয়্যীদ আহমদ বললেন—চলুন, আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা ঐ দ্বিতীয় পথই ধরি। দৌলতরাও বাধা দিলে তৃতীয় পথ তো রইলোই।

খোশদীলে সমর্থন দিয়ে বিলায়েত আলী বললেন—জি হুজুর, জি-জি।

www.pathagar.com

ঈসায়ী ১৮২৬ সনে সঙ্গী-সাথী ও দু'হাজার মুজাহিদ নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ তাঁর সেই কাংক্ষিত জিহাদে বেরুলেন। অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দ্বিতীয় পথে গোয়ালিয়রের সীমানায় এসে সাইয়্যীদ আহমদ দূত পাঠালেন গোয়ালিয়রের মারাঠা অধিপতি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার কাছে। পথ প্রার্থনা করলেন।

সাইয়্যীদ সাহেবের ধারণাই ঠিক। দৌলতরাও সিন্ধিয়া বেশ ভাল লোক। তার শ্যালক ও মন্ত্রী হিন্দুরাও পরিষ্কার মনের মানুষ। তাঁরা সাইয়্যীদ আহমদের আবেদন উক্ত দীলে মঞ্জুর করলেন। প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ বজায় রাখতে অতিশয় আগ্রহী হলেন। সাইয়্যীদ আহমদকে দলবল নিয়ে গোয়ালিয়রের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে যাওয়ার তারা পথ করে দিলেন। দৌলতরাওয়ের হৃদ্যতায় মুজাহিদ দল নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবেরা নির্বিঘ্নে ও সত্তর টংকে এসে পৌছলেন।

খবর পেয়ে টংকের নবাব আমির খান ছুটে এলেন। সঙ্গে এলেন তার পুত্র ওয়াজিরউদ্দৌলাহ। সঙ্গী-সাথীসহ সাইয়্যীদ আহমদকে তারা সাদর অর্ভ্যথনা জানালেন। এরপর টংকের নবাব আমির খান বললেন—মা'শা আল্লাহ! আপনি আপনার চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিলেনই?

সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব সবিনয়ে বললেন—জি জনাব। সেই চেষ্টাই করছি। কামিয়াবী আল্লাহর হাতে। জনাব আমাকে এ ব্যাপারে কি সাহায্য করতে পারেন।

নবাব আমির খানের মুখমণ্ডল ম্লান হলো। তিনি আক্ষেপ করে বললেন—ইচ্ছে তো হয় তামাম লোক-লস্কর নিয়ে আমিও আপনার সাথে শরিক হই আর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু কি করবো বলুন? বদনসীব। আশেপাশের কোন শাসকই আমার ডাকে সাড়া দিলো না। সকলেই বন্ধুত্বের নামে ইংরেজদের গোলামীর বেড়ি পায়ে পরলো। বিশাল ঐ ইংরেজ শক্তির সাথে একা আমি পেরে উঠবো কেন? বাধ্য হয়ে তাই "অধীনতামূলক মিত্রতা" (সাবসিডিয়ারী এলায়েন্স) নামের ঐ গোলামীর জিঞ্জির আমাকেও পরতে হলো। আপনি এসব দেখেই গেছেন।

ঃ জনাব।

ঃ ফলে, দীলে আমার যত খাহেশই থাক, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। তাদের অনভিপ্রেত কোন কাজ আমার আর করা সম্ভব নয়।

ঃ তার অর্থ, জনাবের কোন মদদই আমি তাহলে পাচ্ছিনে!

নবাব আমির খান অধোবদনে বললেন—তা আর পারছি কই আহমদ সাহেব! আমার লোকজন বা সৈন্য সামন্তের কিছু অংশও আপনাকে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাজানি হয়ে যাবে। ইংরেজদের মোসাহেব আমার এ চারপাশের শাসকেরা তৎক্ষণাৎ এ খবর ইংরেজদের কানে দেবে আর তাতে করে আমি বড়ই মুসিবতে পড়ে যাবো।

নবাবজাদা ওয়াজিরউদ্দৌলাহর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল সাইয়্যীদ সাহেবের সাথে। পিতার একথার প্রেক্ষিতে ওয়াজিরউদ্দৌলাহ বললেন—তাতে কি? প্রকাশ্যে মদদ দিতে না পারলেও পরোক্ষভাবে মদদ দিতে পারি আমরা। অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে

www.pathagar.com

বুদ্ধি পরামর্শ আর খবরবার্তা পৌছে দিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ ভাই সাহেবকে আমরা সাহায্য করতে পারি।

নবাব আমির খানের মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন—ঠিক ঠিক। এটা আমি করতে পারবো আহমদ সাহেব। অবশ্যই পারবো। আমার সাধ্য মতো আপনাকে আমি অর্থ যোগান দেবো আর খবরবার্তা পৌছে দিয়ে, মানে পরোক্ষভাবে যতটা সম্ভব, তা অবশ্যই আমি করবো। ওয়াজিরউদ্দৌলাহ বহুত উমদা বাত বলেছে।

সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব এতে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

নবাব আমিরখানের উষ্ণ আতিথেয়তা এড়িয়ে সাইয়্যীদ সাহেব তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারলেন না। দলবল নিয়ে কয়েকদিন টংকেই রয়ে গেলেন। এরই মধ্যে একদিন আমির খান সাইয়্যীদ আহমদকে প্রশ্ন করেন—তা আহমদ সাহেব, আপনার পরিবারবর্গ আত্মীয় স্বজন কোথায় রেখে এলেন?

সাইয়্যীদ আহমদ বললেন—রায় বেরেলীতেই রেখে আসতে হলো। নিরাপদ আশ্রয় তো আর কোথাও খুঁজে পেলাম না।

নবাব আমির খান উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন—সেকি! আপনার অভিপ্রায় ইংরেজরা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু অতপর জিহাদ যখন প্রকট হয়ে উঠবে আর আপনার আসল ইরাদা প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন তো তারা আপনার পরিবার পরিজনদের উপর জুলুম পয়দা করতে পারে। ইংরেজরা যতটা করুক আর না করুক, তাদের তাঁবেদারেরা অবশ্যই তা করবে।

ঃ জনাব।

ঃ এছাড়া জিহাদে নামার পর জানের উপর ঝুঁকিও আছে আপনার। আল্লাহ না করুন, তেমন কিছু ঘটলে তাদের অবস্থা তো তখন আরো অধিক করুণ হয়ে দাঁড়াবে। একজন পথের লোকও তাদের তখন উৎপাত করার সাহস পাবে।

সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তা কি আর আমি ভাবিনি জনাব! কিন্তু কোন সমাধান আমি পাইনি।

ঃ সমাধান জরুর আছে। যদিও হেফাজত করার মালিক আল্লাহ তায়ালা, তবু আপনার পরিবার পরিজনদের এনে আপনি আমার কাছে রেখে যান। তাদের হেফাজতে আমি যথাসাধ্য করবো।

ঃ জনাব!

ঃ এটুকু করাতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। বাঁধা পড়লেও ইংরেজদের কাছে এমন বাধা পড়িনি যে, কোন অসহায় প্রিয়জনদের আমি আশ্রয় দিতে পারবো না। কয়েকদিন দেরী হয় হোক, আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের এখানে আনিয়ে নিন। আপনিই জিহাদের মূল নায়ক। আর কারো তেমন কোন অসুবিধা হওয়ার প্রচণ্ড কারণ নেই। কিন্তু আপনার পরিবারের উপর আঘাত অবশ্যই আসবে।

আমির খানের একাগ্রতার মুখে সাইয়্যীদ আহমদ তাই করলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদের এনে টংকের নবাবের হাওলায় রাখলেন এবং অতপর

www.pathagar.com

আবার পথ ধরলেন। নবাব আমির খান ও নবাবজাদা ওয়াজিরউদ্দৌলাহ সাথে এসে মুজাহিদ বাহিনী সহ সাইয়্যীদ আহমদকে আজমীর তক পৌছে দিলেন।

অনুকূল পরিবেশ এখানেই শেষ হলো। এরপর শুরু হলো প্রতিকূল অবস্থা। রাজপুতানা হয়ে সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদে পৌছার পর ভাওয়ালপুরের নবাব আর সে এলাকার অন্যান্য আমিরদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি ধাক্কা খেলেন। শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান শুনে তারা চমকে উঠে পিছিয়ে গেলেন। রনজিৎ সিংয়ের ভয়ে এসব নবাব-আমিরেরা এতই ভীত ছিলেন যে, সবাই তারা এক বাক্যে বললেন —পাগল নাকি আপনারা ? মহাপরাক্রম রনজিৎ সিংয়ের শক্তির খবর কি রাখেন কিছু ? তাঁকে এটে উঠার শক্তি এ হিন্দুস্থানে কারো নেই। ইংরেজরাও তার সাথে আতাত করে চলে। সুতরাং, খামাখা এমন বদ-'বু' আমাদের এলাকায় ছড়াবেন না আর আমাদের তাতে করে মুসিবতে ফেলবেন না। এই মুহূর্তেই আপনারা আমাদের এলাকা ছাড়ুন।

একে জুজুর ভয়, তার উপর জ্বীনের ভর। রনজিৎ সিংয়ের চর আর দালাল-গাদ্দারেরা ভর করলো এই নবাব আমিরদের ঘাড়ের উপর। তারা কর্ণমন্ত্র দিতে লাগলো। বলতে লাগলো, সাইয়্যীদ আহমদ আর তার লোকজন ইংরেজদের চর। ইংরেজদের বদ মতলব হাসিল করার ইরাদায় এখানে তারা এসেছে। তাদের কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে আর এ এলাকায় থাকতে দিলে একদিকে মহারাজ রনজিৎ সিং ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন, অন্যদিকে তারা এ এলাকার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

এই কর্ণমন্ত্রে এসব নবাব-আমির আরো অধিক ভীত হয়ে উঠলেন এবং পড়িমরি মুজাহিদ দল সহ সাইয়্যীদ আহমদকে সিন্ধু প্রদেশ থেকে বিদায় করে দিলেন। মূলত জিহাদের কথা এই প্রথম শুনায় এর গুরুত্ব এসব শাসকেরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারলেন না।

সিন্ধুতে ব্যর্থ হয়ে দলবল সহ সাইয়্যীদ আহমদ বেলুচিস্তানে এলে বেলুচিস্তানের শাসক মাহরাব খানও সরাসরি পিঠ দেখালেন। কান্দাহারের বিরুদ্ধে রণলিপ্ত থাকায় জিহাদে শরিক হতে তিনিও প্রচণ্ডভাবে গররাজী হলেন। অবশেষে সাইয়্যীদ আহমদ আফগানীস্তানে চলে এলেন এবং সেখানের শাসকদের জিহাদে শরিক করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ তখন শাসকদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ-হানাহানীতে বেজায় উত্তপ্ত। আফগানিস্তানে এসে তিনি দেখলেন, আবদালী বা দুররানী বংশের হাত থেকে বারাকজাই উপজাতি ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর বারাকজাই ভ্রাতৃগণ এক এক এলাকার অধিপতি হয়ে বসে আছেন। পুরদীল খান কান্দাহার ; দোস্ত মুহম্মদ খান কাবুল, গজনী ও জালালাবাদ ; সুলতান মুহম্মদ খান পেশোয়ার ও তার চারপাশের এলাকা ; ইয়ার মুহম্মদ খান কোহাট এবং সাইদ মুহম্মদ খান হশ্তনগর এলাকা শাসন করছেন। সকলেই এরা সকলের ভাই, তবু কারো সাথে কারো কিছুমাত্র মিল মুহব্বত নেই। তাদের মধ্যে চরম বিদ্বেষ ও দুশমনী বিদ্যমান।

www.pathagar.com

দল নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ কান্দাহারে এলে সেখানের জনগণ জিহাদের পক্ষে বিপুল সমর্থন প্রদর্শন করলো। কিন্তু বেকে বসলেন কান্দাহারের শাসক পুরদীল খান। সাইয়্যীদ আহমদের পরিকল্পনাকে তিনি তার প্রাধান্যের উপর বিরাট এক হুমকি বলে মনে করলেন এবং সাইয়্যীদ আহমদকে সত্বর তার এলাকা ত্যাগ করার চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। তবু সে স্থানের চারশো আফগান জিহাদে শরিক হওয়ার জন্যে সাইয়্যীদ আহমদের সামনে এসে ভিড় জমালেন। ছাঁটাই বাছাই করে তিনি দুইশত সত্তরজন আফগানকে মুজাহিদ দলে ভর্তি করলেন।

গজনী হয়ে সাইয়্যীদ আহমদ মুজাহিদদের নিয়ে কাবুলে এলেন এবং মাস দেড়েক যাবত বারাকজ্বাই ভ্রাতৃগণের গোলমাল মিটিয়ে তাঁদের এক করার এবং জিহাদে অনুপ্রাণীত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিংসা ও স্বার্থপরতা তাদের দীলে এতই গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তিনি তা কিছুতেই উৎপাটন করতে পারলেন না এবং ফলে তাদের এক করতেই পারলেন না।

পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কারণে মুজাহিদ দলের মধ্যে সাময়িকভাবে খানিকটা হতাশা নেমে এলো। এ নিয়ে অনেকেই মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগলেন। কেউ কেউ একে অন্যকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। দু'চারজন আবার একেবারেই মন মরা হয়ে বসে পড়লেন। বলা বাহুল্য, নূরউদ্দীনের দলের আতাহার আলী এই মনমরাদের বিশিষ্ট একজন।

গালে হাত দিয়ে আতাহার আলীকে একা একা বসে থাকতে দেখে নূরউদ্দীন কাছে এসে প্রশ্ন করলো—কি হলো? আপনাকে এতটা নির্জীব দেখাচ্ছে কেন? এমন মনমরা হয়ে বসে আছেন যে?

আতাহার আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো—কি আর করবো? 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়'। সবই যে পণ্ডশ্রম, এটা আমি প্রথম থেকেই অনুভব করে আসছি।

নূরউদ্দীন ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আরে আরে, এতটাই হতাশ হয়ে পড়লেন আপনি?

ঃ না পড়ে কি উপায় আছে ভাই সাহেব? আসলে নিপীড়ন ভোগ করাই নসীব-লিখন আমাদের। এর প্রতিকার আমরা কিছুতেই করতে পারবো না। কখ্খনো সম্ভব নয়।

ঃ তাজ্জব! আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে!

ঃ ঐ যে বিলায়েত আলী হুজুর বলেছিলেন, ঐ কারণে। তার কথাই ঠিক। আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গজব নাজেল হয়েছে। তিনি নারাজ থাকাতক আমরা কিছুই করতে পারবো না।

ঃ হ্যাঁ, হয়তো তাই-ই। তবু আমাদের ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? কিছুই করতে পারবো না বলে আগেই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়া কি ঠিক। চেষ্টা তো করতেই হবে আমাদের?

ঃ আল্লাহ নারাজ, চেষ্টা করে করবেন কি আপনি? নইলে এতবড় বিশাল এলাকা আর এতগুলো শক্তিশালী শাসক, আমির-নবাব-সুলতান সকলেই মুসলমান, বিজাতির

www.pathagar.com

ভেজাল নেই, জনগণের মধ্যেও উদ্যম আছে চরম। এ ক্ষেত্রে এরা একজোট হয়ে ঈমানী চেতনায় হুংকার ছেড়ে দাঁড়ালেই তো স্রোতের পানা হয়ে ইংরেজ-শিখ ভেসে যায়। অথচ এরাই ভয়ে গর্তের মধ্যে মুখ লুকাতে ব্যস্ত আর নিজেরাই নিজেদের মাথা কাটতে মগ্ন। আসমানী গজব নেমে না এলে মুসলমানেরা এত বুযদীল হবে কেন আর মুসলমানদের মধ্যে এত বিভেদ থাকবে কেন?

ঃ আতাহার আলী সাহেব?

ঃ দাঁড়াবার ঠাঁইটাও এতদিনে পাবো না? স্বজাতির দেশে এসে এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবো? একি জিল্লতি।

ঃ হতাশ হবেন না ভাই সাহেব? আল্লাহর উপর ভরসা রেখে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। গজব দেয়ার মালিকও আল্লাহ্, গজব তুলে নেয়ার মালিকও আল্লাহ্। আমাদের চেষ্টা আমরা করতে থাকি। ভরসা হারিয়ে বসে থাকলে আল্লাহ্ আরো বেশী নারাজ হবেন।

ঃ তা অবশ্য ঠিক।

পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো আতাহার আলী এবং ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেলেন।

খানিকপরে মৌলভী বিলায়েত আলীকে সামনে পেয়ে নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—এ কোন মুলুকে এলাম আমরা জনাব? চেহারায় সব বাঘের বাচ্চা। কিন্তু অন্তরটা সকলের একি মুষিকের মতো ক্ষুদ্র আর নোংরা? কোন্ ভরসায় এ কোথায় আমরা এলাম?

বিলায়েত আলী সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কাদের কথা বলছো, এখানকার এ শাসকদের?

ঃ জি-জি। আপনিই তো পাটনায় একদিন বলেছিলেন, এ এলাকায় মুসলমান শাসকেরা স্বাধীন নরপতি আর শিখদের অত্যাচারে অনেকেই অতিষ্ঠ। এখানে এলে জিহাদের পক্ষে এদের উষ্ণ সহায়তা পাওয়া যাবে—মানে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু কই, এখন তো দেখি একদম সব উল্টো?

বিলায়েত আলী সাহেব ম্লান কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, আমাদের সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু এরা যে এতটা অজ্ঞ, নাদান, আর এতখানি কমজোর ঈমানের মুসলমান, তা আমরা জানতাম না।

ঃ তাহলে এখন কি বুঝছেন জনাব? আমাদের এ অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হচ্ছে?

বিলায়েত আলী সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন—আমাদের হতাশ হবার কারণ নেই। শাসকেরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও, এখানের জনগণের মধ্যে যে জিহাদের পক্ষে বিপুল সাড়া আছে, তা তো প্রায় সর্বত্রই বুঝতে পারছো? পুরদীল খানের চরম বিরোধিতার মুখেও অতগুলো লোক আমাদের দলে সামিল হতে এলো!

ঃ জি, তা বুঝতে পেরেছি। আর এক্ষেত্রে আমার মতামত, এসব বুযদীল—মানে ভীরু কাপুরুষ শাসকদের পেছনে না ঘুরে, আমাদের সরাসরি জনগণের সামনে গিয়ে

www.pathagar.com

হাজির হওয়া উচিত। তাদের কাছে জিহাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য তুলে ধরলে হয়তো আমরা সুফল পেতে পারি জনাব। মেহেরবানী করে বড় হুজুরকে এদিকটা একটু চিন্তা করে দেখতে বলুন।

বিলায়েত আলী সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন—সাব্বাস্! বলতে আর হবে না। এ নিয়েই হুজুরের সাথে কথা হলো এতক্ষণ। হুজুরের বিশিষ্ট শিষ্য সাগরিদ সকলেই সে আলোচনায় হাজির ছিলেন। হুজুর বললেন, অতপর সরাসরি জনগণের কাছেই যেতে হবে আমাদের। শাসকদের পেছনে ঘুরলে আর চলবে না।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হয় এ সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত।

তাই করলেন সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব। কাবুল থেকে পেশোয়ারে এসে আর তিনি শাসকদের শরণাপন্ন হলেন না, সরাসরি জনগণের কাছে তার আবেদন তুলে ধরলেন। সত্যি সত্যিই এতে ফল ফললো আশাতীত। এ এলাকার পাঠান উপজাতি বিপুল উৎসাহের সাথে দলে দলে এসে সাইয়্যীদ আহমদের হাতে বাইয়াত হলেন এবং সামর্থবান ব্যক্তিরা মুজাহিদ দলে ভর্তি হলেন। জনগণের মানসিকতা আঁচ করে বারাকজাই নেতা সাইদ মুহম্মদ খানও এসে বয়াত গ্রহণ করলেন।

বাতাস একবার ঘুরলে অনেক কিছুই ঘটে। এদের দেখাদেখি চারশাদা ও হশ্‌ত্‌নগরের পাঠান উপজাতিও এসে হাত মেলালেন সাইয়্যীদ আহমদের সাথে। শুধু হাতই মেলালেন না, সাইয়্যীদ আহমদকে তারা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং দলে দলে মুজাহিদ বনে গেলেন। ফলে, সাইয়্যীদ আহমদ এতদিনে এ সীমান্ত এলাকায় দাঁড়ানোর ঠাঁই পেলেন। পাঠানেরা সাইয়্যীদ আহমদের মুজাহিদ দলে যোগ দিলে তার অধীনে একটা উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তিও গড়ে উঠলো। এর মধ্যে উত্তর ভারত ও বাংলা থেকে আরো কয়েক দল মুজাহিদ এসে হাজির হলে সাইয়্যীদ আহমদের মুজাহিদ সংখ্যা বার হাজারে দাঁড়ালো। সাইয়্যীদ আহমদ 'নওশেরা' নামক এক স্থানে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করলেন।

বাংলা থেকে আরো কদল মুজাহিদ এসে পৌছার খবর পেয়ে নূরউদ্দীন ছুটে এলো, ইয়ারপুরের বা তার পরিচিত কোন কেউ তাদের মধ্যে আছে কিনা—তা দেখার জন্যে। অধিক তাকে বেগ পেতে হলো না। মুজাহিদেরা দলে দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি দলের মধ্যে কয়েকটা চেনাচেনা মুখ দেখে, সেখানে গিয়ে নূরউদ্দীন সবিস্ময়ে দেখলো, একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বরকতুল্লাহ। জেকের আলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বরকতুল্লাহ। বরকতুল্লাহ অনুসন্ধানী নজর দিয়ে এদিক ওদিক চাইছিল। সেও নূরউদ্দীনকে তখনই দেখতে পেলো। দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে সোল্লাসে বলে উঠলো—আরে এই যে নূরউদ্দীন ভাই সাহেব! আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে এত শিগ্‌গির খুঁজে পাবো, আমরা তা কল্পনাই করিনি।

নূরউদ্দীনও সবিস্ময়ে বলে উঠলো—সোবহান আল্লাহ! আপনি! আপনি এই মুজাহিদ দলে আর এই সুদূর সীমান্তে।

বরকতুল্লাহ বললো—উস্তাদ বাহার খাঁ আরো একদল মুজাহিদ এ জিহাদে

www.pathagar.com

পাঠালেন। অল্প কিছু আমাদের ইয়ারপুর এলাকার আর বাদবাকী বাইরের লোক দিয়ে আর একটা মুজাহিদদল গঠন করলেন উনি। জিহাদে আসার জন্যে বাংলার লোকদের বিপুল উৎসাহ কিনা? আমি সেই দলে যোগ দিয়ে এখানে এসেছি।

ঃ বলেন কি!

ঃ এসে তো ভাবলাম দুই এক মাসের মধ্যেও আপনার সাথে আমাদের মোলাকাত হবে না। সীমান্তের এ বিশাল এলাকায় কোন্ দলের সাথে কোন্‌খানে আছেন আপনি, আমরা হয়তো আপনাকে খুঁজেই পাবো না। নেহায়েতই কিসমতের জোরে এত জলদি জলদি পেয়ে গেলাম আপনাকে।

ঃ তাই?

ঃ অবশ্যই ভাই সাহেব। অসুবিধে তো আমারই বেশী। সবই প্রায় বাইরের লোক। তাড়াহুড়ো করে দল গুছিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নথে গোণা যে কয়জন ইয়ারপুর এলাকার লোক আমরা এসেছি, তাদেরও কারো সাথে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা নেই আমার। এক এলাকার লোক এটুকুই যা পরিচয় বা সম্পর্ক। এখানে এসে তো আমি ঘাবড়েই গেলাম। ঘনিষ্ঠ লোকজন কাউকেই শেষ পর্যন্ত না পেলে এ সুদূর এলাকায় যে কিভাবে দিন কাটবে আমার—এই ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে পৌঁছেই তাই আপনাকে আর আপনার দলের লোকজনকে হন্যে হয়ে তালাশ করছি। এত অল্পতেই যে আপনাকে—

নূরউদ্দীন হাসিমুখে বললো—সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। তা ইয়ারপুরের খবরবার্তা ভাল তো?

ঃ মোটামুটি ভাল। তবে উস্তাদজীর মকানের খবর ভাল বলা যায় না। তার বিবি সাহেবা অসুস্থ ছিলেন, এখনও শরীর তার পুরোপুরি সারেনি। ওদিকে তার চাচা-চাচীরা সেই যে মকান ছেড়ে গেছেন, এখনও ফিরেননি। মকান তার একদম ফাঁকা।

ঃ সেকি! এখনও ফিরেননি?

ঃ জিনা। আরো নাকি কি সব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ওখানে।

ঃ কি মুসিবত!

ঃ এদিকে আবার উস্তাদজীর বোনটাও যদি আগের মতো সুস্থ স্বাভাবিক থাকতো, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সেও আর ঘর থেকে বাইরেই তেমন বেরোয় না।

নূরউদ্দীন উৎকণ্ঠার সাথে প্রশ্ন করলো—কেন কেন? তিনিও কি অসুস্থ?

ঃ ঠিক অসুস্থ না হলেও, সুস্থ বলাও যায় না। ঠিক মতো নাওয়া-খাওয়াও করে না, কারো সাথে মন খুলে কথাবার্তাও বলে না। শুনি, এখন নাকি সে ঘরের মধ্যে জায়নামাজেই বসে থাকে। এবাদত-বন্দেগী নিয়েই নাকি মশগুল হয়ে আছে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ উস্তাদজী আর করবেন কি? মকানের এ অবস্থার দরুন জিহাদে আসতে না পারায় তিনি খুব মর্মাহত আছেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো, জিহাদের জন্য অর্থ ও মুজাহিদ পাঠানোর কাজ নিয়ে তৎপর থেকে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

ঃ আচ্ছা! এই অবস্থা?

ঃ জি-জি। উস্তাদজী আপনার জন্যে দোয়া পাঠিয়েছেন আর তার এসব অসুবিধের কথা আপনাকে জানানোর জন্যে আমাকে বিশেষভাবে বলেছেন।

www.pathagar.com

ঃ আল্লাহ তায়ালা তার ঘরের আর মনের শান্তি বিধান করুন—এ কামনাই কার। তা বরকতুল্লাহ সাহেব, একটা প্রশ্ন যে না করে পারছিনে ? শুনলাম, জেকের আলীর সাথে আপনারা কয়েকজন উস্তাদজীকে ত্যাগ করে সরে পড়েছেন। আপনি আবার হঠাৎ এই—

বরকতুল্লাহ মাথা নীচু করলো। অধোবদনে বললো—সে প্রসঙ্গ তুলে আর আমাকে শরমিন্দা করবেন না ভাই সাহেব। কথায় বলে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ"। ব্যাপারটা পুরোপুরি এই রকম। চরম দুর্গতি থেকে আল্লাহ যে আমাকে বাঁচিয়েছেন, এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি।

কৌতুহলী হয়ে উঠে নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—কেমন-কেমন ? বরকতুল্লাহ বললো—কাঁচকে সোনা মনে করে এতদিন এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম ভাই। জেকের আলীর স্বরূপ এ যাবত সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। এবার আক্কেলটা পুরোপুরিই হয়েছে।

ঃ অর্থাৎ

ঃ জেকের আলী মিথ্যা বলে একটা মেয়ে ধরে আনা কাজে আমাদের লাগিয়েছিল। বুঝতে না পেরে তার জন্যে দিনেদুপুরে নারীহরণ করতে গিয়ে জমিরউদ্দীন, নূরবকস, হুসেন আলী প্রভৃতি তিন চার জনের দফা একদম রফা। লোকজন ঘিরে ধরে তাদের এয়সা মার মেরেছে যে, জানটা কেবল আছে, কিন্তু হাড় বিলকুল ছাতু। আমারও ঐ দশাই হতো। নসীবের জোরে ওখানে গিয়ে পৌছতে আমার দেরী হওয়ায়, বেঁচে গেছি।

ঃ বলেন কি ? তারপর ?

ঃ তারপরের ঘটনা আরো করুণ। জেকের আলী এখন রটিয়ে বেড়াচ্ছে—এ সমন্ধে সে কছুিই জানে না। ঐ মেয়ের সাথে আর ঐ নোংরা কাজের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। যারা মার খেয়েছে ঐ বদকাজ তারাই নিজ মতলবে করেছে আর এ জন্যে তারাই সম্পূর্ণ দায়ী। নিজেদের দোষ ঢাকার জন্যে তারা এখন মিথ্যাভাবে তাকে এর সাথে জড়াচ্ছে।

ঃ কি আশ্চার্য ?

ঃ লেলিয়ে দিয়ে সে চালাকী করে ফাঁকে সরে থাকার দরুন বেঁচে গেছে। সামনে থাকলে তার হাড়েও বাতাস পেতো না।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আক্কেলটা হলো আমার। বিভ্রান্তির ঘোরটা কেটে গেল। ফিরে এসে উস্তাদজীর পায়ের উপর পড়ে গেলাম। আমাকে উস্তাদজী ভালভাবেই জানতেন। অনেকখানি স্নেহও করতেন আমাকে। ফিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করায় উস্তাদজী খুব খুশী হলেন। এরপর আমি জিহাদে আসার আগ্রহ প্রকাশ করলে। এই শেষ দলের সাথে আমাকে জিহাদে পাঠিয়ে দিলেন।

ঃ বড়ই আজব ব্যাপার। কিন্তু বরকতুল্লাহ সাহেব, আমি তো এও শুনেছি, সিতারা বানু নামের কোন এক মেয়ের সাথে জেকের আলীর আশনাই আছে। তবু জেকের আলী অন্য মেয়ের দিকে হাত বাড়ালো, মানে ?

www.pathagar.com

ক্লিষ্ট হাসি হেসে বরকতুল্লাহ বলল কি যে বলেন, ভাই সাহেব। জেকের আলীর মতো লোকেরা কি ঐ একজন মেয়ের সাথে আশনাই করে তুষ্ট থাকার লোক? আরো অনেকের সাথেই আশানাই আছে তার। বিশেষ করে, ঐ ঘটনার পর এটা আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ঃ সেকি? সিতারা বানুও কি তাহলে এটা এখন বুঝতে পেরেছে?

ঃ তাই পারে? আসলে সেও তো প্রায় ঐ কিসিমের মাল। মাথায় আছে ষাঁড়ের গোবর, অথচ বেজায় হিংসুটে আর হামবড়া স্বভাব। পরের ভাল সহ্য করতে পারে না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ অসতের পিরীতি অসতের সাথেই হয়। একটা গেঁয়ো কথা আছে—"যেতাকে তেতা মেলে, রাজাকে মেলে রাণী, ভূতোকে ভূতনী মেলে, খাক্‌শ্যাকে খাক্‌শ্যানী"। দুইয়ের সাথে দুইয়ের একদম মিলে গেছে। জেকের আলীর দোষ সিতারা বানু ধরতে যাবে কেন?

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ শক্ত ধাক্কা যেদিন খাবে কেবল সেদিনই এইসব আত্মসর্বস্ব বিটকেল মেয়েদের জ্ঞান ফিরবে, তার আগে নয়।

হন্তদন্ত হয়ে সোহরাব হোসেন এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো এবং 'জব্বোর খবর আছে' বলে নূরউদ্দীনকে তৎক্ষণাৎ একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

লোকজনের ভিড় থেকে ফাঁকে এসে সোহরাব হোসেন জেব থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো এবং নূরউদ্দীনকে হাসি মুখে বললো—এই সেই জব্বোর খবর।

সবিস্ময়ে চেয়ে নূরউদ্দীন বললো—জব্বোর খবর মানে? কি ওটা?

ঃ খত। অর্থাৎ পত্র।

ঃ পত্র! কার পত্র? কে লিখেছেন?

ঃ আমার পত্র। লিখেছেন আমার ঐ উনি। মানে হবু উনি।

ঃ হবু উনি! সাবিহা আরজু বহিন?

ঃ জরুর! হবু কি আমার হাজারটা?

সোহরাব হোসেন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো যারপর নেই উল্লসিত হয়ে উঠে নূরউদ্দীন বললো—কি সাংঘাতিক! কি তাজ্জব! সাবিহা আরজু বহিন খত পাঠিয়েছেন আপনাকে? সেই সুদূর বাংলা থেকে এ সীমান্ত প্রদেশে?

ঃ তো আর বলছি কি?

ঃ সোবাহান আল্লাহ! সত্যিই তো জব্বোর খবর! পত্রটা এলো কিভাবে? এই দুর্গম দূরত্বে?

ঃ মানুষেই এনেছে, জ্বীন পরীতে নয়।

ঃ কে সে মানুষ?

www.pathagar.com

ঃ সাবিহা আরজুর এক মামা। ইয়ারপুরের ঐ অঞ্চলেই বাড়ী। মামা হলেও বয়স কম আর সাবিহার সাথে সম্পর্কটা অনেকখানি বন্ধুর মতো। তাঁর হাতেই খত পাঠিয়েছে সাবিহা।

ঃ এও তো আর এক তাজ্জব কথা। সেরেফ ঐ এক খত পৌছাতেই এত কষ্ট করে এত দূরে উনি এসেছেন?

ঃ তাই কি কেউ আসে? উনিও এ জিহাদের সাথেই সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি। মুজাহিদ নন, বেসামরিক এক কর্মী। জিহাদের জন্যে ঐ এলাকার অনুদানের অর্থ নিয়ে এসেছেন। উস্তাদ বাহার খাঁ ভাই সাহেবই এই মুজাহিদ দলের সাথে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। দাঁও পেয়ে সাবিহা আরজু খত পাঠিয়েছে তাঁর হাতে।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! কি লিখেছেন সাবিহা আরজু বহিন?

সোহরাব হোসেন চোখ ঠেরে বললো—উহু, সব কথা বলা যাবে না। বলতে মানা। তবে কেমন আছি, কোথায় আছি, আহার-বিরাম ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, ফিরে যেতে কত দেরী—এসব খবর জানতে চেয়েছে।

ঃ তারপর?

ঃ বলেছে, মওকা পেলেই আমার হালতের খবর জানিয়ে তাকে পত্র পাঠাতে হবে। খবর পেতে দেরী হলে সে লাচার হালে থাকবে।

সোহরাব হোসেন পুনরায় হাসতে লাগলো। সেই হাসিতে অল্প একটু যোগ দিয়েই নূরউদ্দীন কপট ক্ষোভে বললো—নসীব উমদা হলে এ রকমই হয়। খবর করার লোকও থাকে, খবরের আশায় লাচার হয়ে অপেক্ষা করার লোকও থাকে। আমার মতো পোড়া-নসীবের লোকেরা কুল্লে লাওয়ারিশ। অপেক্ষা-এন্তেজার পড়ে মরুক, একটু খবর নেয়ার কোন কেউও এ দুনিয়ায় নেই।

সোহরাব হোসেন আওয়াজ দিয়ে বলে উঠলো—আছে আছে, আলবত আছে। কে বললে নেই। অমনি কি আর বলছি খবরটা জব্বোর খবর? আপনার খবরও জানতে চেয়েছেন একজন।

ঃ আমার খবর জানতে চেয়েছেন! কে তিনি?

ঃ রোকসানা ফিরদৌস।

ঃ আরে ধ্যাৎ! এমন শুকনো ঠাট্টা করেন কেন ভাই? সবসময় কি সবকিছু ভাল লাগে?

সোহরাব হোসেন প্রতিবাদ করে বললো—আরে, শুকনো ঠাট্টা হবে কেন? শুকনো ঠাট্টা কোথায় দেখলেন আপনি? যা ঘটনা তাইতো আমি বলছি।

ঃ যা ঘটনা তাই বলছেন কি রকম? রোকসানা ফিরদৌস আমার খবর জানতে চেয়েছেন—এ আবার কেমন ঘটনা? কোথায় শুনলেন এ গুজব?

ঃ শুনবো কেন? এ পত্রেই তা আছে।

অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে নূরউদ্দীন বললো—কেমন কথা! আপনার ঐ পত্রেই আছে?

www.pathagar.com

ঃ জি! সাবিহা আরজু লিখেছে, রোকসানা ফিরদৌস তার কাছে এসেছিল। পত্র লেখার কথা শুনে সাবিহাকে সে বিশেষভাবে বলেছে, আপনি কেমন আছেন আর কি হালতে আছেন, তা যেন আমি খোঁজ নিয়ে সাবিহার পত্রের জবাবে জানাই। সাবিহা তার পত্রে এ অনুরোধ করুক আমাকে—এ জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে সাবিহাকে সে ধরেছে আর তা লিখিয়ে নিয়ে ছেড়েছে। আপনার ব্যাপারে রোকসানার আকুলতা দেখে সাবিহা আরজু কৌতুহলী হয়ে উঠলে আর রহস্য কি জানতে চাইলে, রোকসানা মোখতাছার বলেছে, "এর মধ্যে রহস্য কি দেখলে? ভিন এলাকার লোকটা আত্মীয় স্বজনহীন অবস্থায় এসে আমাদের এখানে থাকলো আর ভাইজানের উৎসাহে ঐ ঝুঁকির মধ্যে গেল। তার জন্যে একটা আহা শব্দ করার লোকও কাউকে তেমন দেখিনে এখানে। এমতাবস্থায় তার একটু খবরবার্তা আমরাও যদি না করি, তাহলে তা কি মানুষের কাজ হয়? মানবিকতা বলেও তো কথা আছে একটা?"

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে নূরউদ্দীন বললো—বলেন কি! একথা আরজু বহিন লিখেছেন? দেখিদেখি খতখানা? আপনাদের গোপন কথা পড়বো না। শুধু একথাগুলো কোথায় আছে, তাই একটু দেখবো।

নূরউদ্দীন পত্রের দিকে হাত বাড়ালো। পত্রটা সরিয়ে নিয়ে সোহরাব হোসেন বললো দেখাচ্ছি–দেখাচ্ছি। শুধু একথাই নয়, আরো কথা সাবিহা আরজু লিখেছে। সে লিখেছে, "যদিও সেরেফ ঐ কথা বলেই রোকসানা আমার কৌতুহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলো, তবু তার ব্যাকুলতা দেখে আমার সন্দেহ হলো, ঐ টুকুই তার মনের কথা নয়। ভেতরে আরো অনেকখানি আছে। এই আরো অনেকখানিটা কি আর কতটা, আমি তা বুঝে উঠতে পারছিনে। এত চাপা মেয়ে যে, তার কাছে কিছুই পাচ্ছিনে। যদিও শাদিতে তার নারাজ হওয়ার লক্ষ্যবস্তু নূরউদ্দীন ভাই সাহেব কস্মিনকালেও নয়, সে ব্যাপারে রোকসানার মন আছে অন্য খানে, তবু নূরউদ্দীন ভাই সাহেবকে নিয়ে তার এ আগ্রহ আমার কাছে কেমন যে বিসাদৃশ্য লেগেছে।"

সোহরাব হোসেন থামতেই নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—এত কথাই আরজু বহিন লিখেছেন?

ঃ লিখেছে কিনা, এই দেখুন। এই যে এই অংশটুকু পড়ে দেখুন—

নূরউদ্দীনের সামনে সে পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু মেলে ধরলো। নূরউদ্দীন পরম আগ্রহে ঐ অংশটুকু বার বার পাঠ করলো। তার পড়া শেষ হলে পত্রখানা ভাঁজ করে জেবের মধ্যে রাখতে রাখতে সোহরাব হোসেন বললো—এবার বিশ্বাস হলো?

নিজের অজান্তেই কিছুটা লাল হয়ে উঠে নূরউদ্দীন নতমস্তকে বললো—জি, হলো।

ঃ ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? আপনাদের ভেতরে রহস্য কিছু আছে কিনা, ঠিক-ঠিক বলুন তো?

ঃ রহস্য! রহস্য কি?

ঃ গোপন মুহব্বত। আমার আর সাবিহা আরজুর মতো আপনি আর রোকসানও গোপনে মুহব্বত চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা, বলুন দেখি?

নূরউদ্দীন বিস্মিতকণ্ঠে বললো—আপনাদের মতো মুহব্বত!

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমরা যেমন একে অন্যের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে আছি, মানে সাবিহা আরজু যেমন আমার অপেক্ষায় আছে, রোকসানা ফিরদৌসও কি তেমনি আপনার অপেক্ষায়—

ঃ কি তাজ্জব! রীতিমতো খোয়াব দেখতে শুরু করলেন যে দেখছি!

ঃ খোয়াব।

ঃ তেমন ঘটনা হলে, মানে আপনাদের মতো তাঁর সাথে আমারও একই রকম মুহব্বত থাকলে, আপনি তা জানবেন না কেন? আপনার কাছে আমি তা লুকিয়ে রাখবো কেন আর লুকানোর কারণ-টাই বা কি আমার?

ঃ দোস্ত!

ঃ তাঁর সাথে একটা কথাও এ জিন্দেগীতে হয়নি আমার! মুহব্বত হবে কি করে?

সোহরাব হোসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললো—তা বটে তা বটে। মুহব্বত হলে আমার কাছে সত্যিই আপনার তা লুকিয়ে রাখার সংগত কারণ নেই আর সেটা এমন একেবারেই না-জানা কারো থাকতো না। কেউ না কেউ জানতোই।

ঃ তাহলে?

ঃ বুঝার ভুল। রোকাসানার ঐ ব্যস্ততার ভেতরে ঠিকই অন্য কিছু নেই। নেহায়েত মানবিকতার খাতিরেই আপনার খবর জানতে চেয়েছে রোকসানা। সাফদীলের মানুষ তো ওরা সবাই। ওদের বিবেকটাও তাজা আর পবিত্র। আমার আর সাবিহার এ কৌতূহল আসলেই এক অমূলক কৌতূহল।

এই বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করলো সোহরাব হোসেন। এরপর সে বরকতুল্লাহদের খবর নিতে দ্রুতপদে চলে গেল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ শেষ হলো না নূরউদ্দীনের অন্তরে। অন্তর তার এ খবরে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। যে রোকসানার জন্যে এত তার আকুলতা, সে রোকসানা তার প্রতি আদৌ কিছু প্রসন্ন কিনা—এই ভেবেই এতদিন পেরেশান ছিল নূরউদ্দীন। আজ তার সে পেরেশানী বিপুল অংশে লাঘব হয়ে গেল। রোকসানা তার কথা ভাবে। অন্য যেখানেই দীলটা বাধা থাকুক রোকসানার, রোকসানা তার খবর জানতে চায়। সে জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। নূরউদ্দীনের কাছে এ খবর মোটেই কিছু মামুলী খবর নয়। তার কাছে এ খবর এক মস্তবড় খবর। তার এক মস্তবড় সান্ত্বনা। এক মস্তবড় আনন্দ!

নূরউদ্দীনের দীল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সজীব হয়ে উঠলো তার ম্রিয়মান হৃদয়। নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সে নিজের কর্তব্যে মানোনিবেশ করলো।

৭

সাইয়্যীদ আহমদ নওশেরাতে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে শক্তভাবে বসতে না বসতেই বেজে উঠলো রণবাদ্য। ইংরেজরা তার জিহাদ আন্দোলনের প্রতি অনেকটা উদাসীন থাকলেও, শিখেরা তা ছিল না। সাইয়্যীদ আহমদের গতিবিধির উপর পাঞ্জাবের শিখরাজা রণজিৎ সিংয়ের সবসময়ই সজাগ নজর ছিল। যখন তিনি

www.pathagar.com

দেখলেন, তার চর আর দালালদের প্রচণ্ড তৎপরতা সত্ত্বেও মুজাহিদ দল নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব দাঁড়াবার স্থান পেয়ে গেলেন, তখন আর রণজিৎ সিং নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলেন না। সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের অবস্থান অংকুরেই বিনাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তার সেনাপতি বুধ সিংয়ের অধীনে দশ হাজার সুশিক্ষিত শিখ সৈন্য প্রেরণ করলেন। শিখ বাহিনী এসে 'আকোরা' নামক এক স্থানে ছাউনি ফেলে বসলো।

খবর পেয়ে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবও সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, শিখ বাহিনী বৃটিশ সমরবিদদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী। এও জানতেন, এই পয়লা লড়াইয়ের ফলাফলের উপরই অনেকখানি নির্ভর করছে তার এই অভিযান ও আন্দোলনের ভবিষত সাফল্য ও ব্যর্থতা। এদের সাথে লড়াই করার জন্যেই তিনি এ জিহাদে বেরিয়েছেন। কাজেই, শিখ বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন, কিছুমাত্র ভীত বা শংকিত হলেন না। তার বিশিষ্ট অনুসারীদের নিয়ে তিনি তখনই আলোচনায় বসলেন এবং শিখবাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আল্লাহ বকশ খান নামক এক বাহাদুর মুজাহিদ এই অতর্কিত হামলা পরিচালনা করার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে, নয়শত বাছাই করা মুজাহিদ সহ তাকে এই অতর্কিত হামলায় প্রেরণ করা হলো।

অতর্কিত হামলার এই পরিকল্পনা আশাতীতভাবে সফলকাম হলো। আল্লাহ বকশ খানের অতর্কিত হামলায় শিখ বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সাতশত শিখ সৈন্য ময়দানেই নিহত হলো। আহত হলো তার দুই গুণেরও অধিক। এ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা মোট বিরাশী জন।

সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব ঠিকই চিন্তা করেছিলেন। এই পয়লা যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে তার অবস্থান আরো অধিক মজবুত হয়ে গেল। এ বিপুল সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো। সীমান্তের উপজাতির যে সমস্ত লোক ও নেতা দোটানায় ভুগছিলেন, তারা ছুটে এসে সাইয়্যীদ আহমদের সাথে যোগ দিলেন। যোগদানকারী উপজাতীয় নেতাদের মধ্যে হণ্ডের শাসনকর্তা খাদেখান, জাইদার আশরাফ খান ও 'পাঞ্জতর' শাসনকর্তা ফতে খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের সাথে বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় লোক দলে দলে এসে মুজাহিদ দলে ভর্তি হওয়ার ফলে মুজাহিদ বাহিনী বিশাল আকার ধারণ করলো।

কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর এই বিশাল আকার নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দের ব্যাপার ছিল না। এটা জটিলতাও সৃষ্টি করলো। সেরেফ জটিলতাই নয়, সাফল্যের অনেকখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, এই বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় মুজাহিদেরা সকলেই সাইয়্যীদ আহমদের হিন্দুস্তানী মুজাহিদদের মাতো জিহাদের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসে মুজাহিদ দলে যোগদান করলো না। অধিকাংশেরাই যোগ দিলো লড়াই অন্তে লুটতরাজের মওকা নেয়ার জন্যে। বিষয়টি অতি শীঘ্রই উলঙ্গভাবে ধরা পড়লো।

আকোরার বিজয়ের অল্পদিন পরেই মুজাহিদ বাহিনী শিখদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হাজু আক্রমণ করলো। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে মুজাহিদ বাহিনী হাজুতেও শিখবাহিনীকে পরাজিত করলো। শিখবাহিনী পিছু হটে গেল। কিন্তু

www.pathagar.com

বদনসীবা বিজয়টা সুসংহত করার আগেই উপজাতীয় মুজাহিদেরা উন্মত্তভাবে লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে গেল। মুজাহিদ বাহিনীর সালারগণ প্রাণপণ করেও উপজাতীয় মুজাহিদদের লুটতরাজ বন্ধ করতে পারলেন না এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেন না। মুজাহিদ বাহিনীর শৃঙ্খলা ও প্রতিরোধ শক্তি একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো।

আর যায় কোথায় ? পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেলেও শিখ সৈন্যেরা অদূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। মওকা বুঝে আবার তারা সংঘবদ্ধ হলো এবং মার মার রবে ফিরে এসে বিশৃঙ্খল মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

চোখের পলকে মহাবিপর্যয় ঘটে গেল। মুজাহিদ বাহিনীর কিছু মাত্র প্রতিরোধ শক্তি না থাকায় মুজাহিদেরা মুষিকের মতো নিহত হতে লাগলো। বাহিনীটা গোটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, কিন্তু সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের বদৌলতে পরিস্থিতিটা অধিক করুণ হলো না।

বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী, সাইদ মুহম্মদ আলী, শাহ ইসমাইল, শাহ আবদুল হাই, ইমাম উদ্দীন ও উপজাতীয় অন্যান্য বিশিষ্ট শিষ্য সাগরিদ নিয়ে যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষায় সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। এ সময় এক দূত এসে উপজাতীয় মুজাহিদদের লুটতরাজের কথা ও তার ফলে লড়াইয়ের ঐ করুণ অবস্থার কথা পেশ করলে, সাইয়্যীদ আহমদ সঙ্গে সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। বিচলিত না হয়ে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলেন, এ বিপর্যয় উৎরানোর একমাত্র উপায় নিবেদিত প্রাণ হিন্দুস্থানী মুজাহিদদের অবিলম্বে রণস্থলে প্রেরণ করা।

যুদ্ধের অবস্থার কথা শুনে তার সাগরিদদের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সাইয়্যীদ আহমদ তখনই বিলায়েত আলী, শাহ ইসমাইল প্রভৃতি সাগরিদদের উদ্দেশ করে বললেন—ভেঙ্গে পড়ার অবকাশ নেই ভাই সাহেবেরা। এই মুহূর্তেই আপনারা আমাদের হিন্দুস্তানী মুজাহিদদের একটি তুখোড় দল হাজুতে প্রেরণ করুণ। আল্লাহ চাহে তো একমাত্র তারাই এ বিপর্যয় ঠেকিয়ে দিতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে ধরলো বিলায়েত আলী ও শাহ ইসমাইল সাহেবদের। তারা দৌড়ের উপর উঠে গেলেন এবং পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ হিন্দুস্তানী মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে হাক দিলেন। হাক শুনেই "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর" হুংকার তুলে ময়দানের দিকে ছুটতে লাগলেন বাংলা, বিহার ও দিল্লী থেকে আগত একদল লড়াকু মুজাহিদ। বলা বাহুল্য, এই দলে বাংলার মুজাহিদেরাই সংখ্যায় ছিলেন অধিক আর অগ্রভাগে ছিল নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন, আতাহার আলী, জান মুহম্মদ প্রমুখ ডানপিটে জোয়ানরা। সৈন্যপত্যেও ছিলেন হিন্দুস্তানের কয়েকজন দক্ষ মুজাহিদ।

ঠেকে গেল বিপর্যয় এই হিন্দুস্তানী বাহিনী গিয়ে প্রাণপণে লড়ে শিখ বাহিনীকে আবার বিধ্বস্ত করে দিলো। অনেক সৈন্য ডালি দিয়ে অবশিষ্ট শিখেরা ফের পড়িমরি পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো।

এতে করে জিহাদ আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে, দলে দলে লোক এসে প্রতিদিন মুজাহিদ বাহিনী ফাঁপিয়ে তোলার কারণে এবং সর্বোপরি জিহাদ সঠিকভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজনে, রাষ্ট্রভিত্তিক

www.pathagar.com

একটি সুসংহত শাসন কাঠামো অপরিহার্য হয়ে পড়লো। এই লক্ষ্যে ঈসায়ী ১৮২৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে (জমাদি ১১, ১২৪২ হিজরী) এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। এ সমাবেশে যোগদিলেন উপজাতীয় প্রধানগণ, উপজাতীয় জনগণ ও সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের ব্যক্তিগত লোকেরা। এ সভায় সাইয়্যীদ আহমদ (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী) সর্বসম্মতিক্রমে সম্মিলিত উপজাতীয়দের ও তাদের ভূ-খণ্ডের খলিফা এবং ইমাম নির্বাচিত হলেন।

এই সমাবেশেই একবাক্যে সাব্যস্ত হলো, সামরিক বাহিনী ও জিহাদ পরিচালনা খলিফার হাতে থাকবে। উপজাতীয় নরপতিগণ তাদের নিজ নিজ ভূ-খণ্ড শাসন করবেন এবং তাঁদের ভূ-খণ্ড এই খিলাফতের এক একটি অংশ (ইউনিট) রূপে বিবেচিত হবে। প্রত্যেকটি ইউনিট জিহাদ পরিচালনার জন্যে নির্ধারিত অর্থ ও লোক খলিফাকে যোগান দেবে। পেশোয়ারে এই নতুন রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো। এই নতুন খিলাফতের খলিফার নামে শুক্রবারে খোত্‌বা পঠিত হলো।

সাইয়্যীদ আহমদ এবার খলিফা হিসেবে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া ও ভারতের মুসলিম শাসকদের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। অত্যাচারী শিখ ও আগ্রাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগদান করার জন্যে তাঁদের আহ্বান জানালেন। কিন্তু এতে তিনি সাড়া তেমন পেলেন না। তবে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ খুবই ফলপ্রসু হলো। জিহাদের মতবাদ প্রচারে এবং জিহাদের জন্যে অর্থ ও মুজাহিদ সংগ্রহের লক্ষ্যে খলিফা তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের হিন্দুস্তানের নানা এলাকায় প্রেরণ করলেন। বিলায়েত আলী গেলেন সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে, ইনায়েত আলী গেলেন বিহারে ও বাংলায় এবং সাইদ মুহম্মদ আলী গেলেন উত্তর ভারতে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অধীনে অনুরূপ আরো দল গেল বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে।

এতে করে অত্যন্ত সুষ্ঠু পদ্ধিতির মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকে অর্থ ও মুজাহিদের এক স্বতঃস্ফূর্ত স্রোত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো। ইতিমধ্যে নবাব আমিরখানের পুত্র ওয়াজিরউদ্দোলাহ টংকের নবাবের আসনে বসেছিলেন। প্রচুর অর্থ প্রদানের পরও নবাব ওয়াজিরউদ্দৌলাহ নিজে বাহিনী নিয়ে সীমান্তে যাত্রা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁতে তাঁর মুসিবত হতে পারে বিবেচনায় সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব তাঁকে নিষেধ করে পাঠালেন। পরিবর্তে তাঁকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ করার পরামর্শ দিলেন।

সাইয়্যীদ আহমদের বাহিনীতে এখন মুজাহিদ সংখ্যা প্রায় এক লাখ। পরিস্থিতি অনুধাবন করে পেশোয়ার ও কোহাট এলাকার শাসনকর্তা সুলতান মুহম্মদ খান, পীর মুহাম্মদ খান এবং ইয়ার মুহম্মদ খানসহ ইউসুফজায়ী ভূ-খণ্ডেরও কিছু কিছু প্রধান এসে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের আনুগত্য স্বীকার করলেন। খিলাফত এখন একটি বাস্তব ও মজবুত অস্তিত্ব লাভ করলো। এর সীমানা পূর্বে কাশ্মীর ও পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পুষ্পের মধ্যেই কীটের বীজানু বাসা বেঁধে ফেললো। কিছু বারাকজাই ভ্রাতৃবৃন্দ বিশেষ করে সুলতান মুহম্মদ খান ও ইয়ার মুহম্মদ

www.pathagar.com

খান হৃদয়ের টানে এই খিলাফতে যোগদান করলেন না। পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাঁরা খিলাফতে যোগ দিলেন। খিলাফতের প্রতি তাঁরা কখনো আন্তরিক ছিলেন না। বরং খিলাফতকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভুত্বের উপর চরম এক আঘাত বলে মনে করতে লাগলেন। ফলে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই তাঁরা খিলাফতের ধ্বংসের মানসে তৎপর হয়ে গেলেন। বাইরে থেকে যোগ দিলেন খিলাফতের সাথে, কিন্তু ভেতর থেকে খিলাফত উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা শিখদের সাথে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগলেন। মূলত কুমন্ত্রণা দিয়ে এবং টোপ লোভ দেখিয়ে শিখেরাই তাদের এ ব্যাপারে উন্মত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে রাখলো।

এসব স্বার্থপর আর গাদ্দার শাসনকর্তাদের সন্দেহজনক চালচলন ও গতিবিধি অচিরেই অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শিখদের চর হিসেবে সন্দেহভাজন এমনকি চিহ্নিত চরদের সাথেও এদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে অনেকেই বিস্মিত হতে লাগলেন। সর্বোপরি, এঁদের বাসভবনে শিখ নরপতি রণজিৎ সিংয়ের কিছু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের গোপন যাতায়াতও কারো কারো নজরে পড়ে গেল। বিষয়টি উপজাতীয় মুজাহিদের মোটা মগজে তেমন একটা না ঢুকলেও বা তাদের নজর এতটা অনুসন্ধানী না হলেও, হিন্দুস্তানী মুজাহিদেরা এদের এই বিপজ্জনক আচরণ গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন এবং এ নিয়ে গুঞ্জরণ শুরু করলেন।

নূরউদ্দিন ও সোহরাব হোসেন এই প্রসঙ্গে কথা বলার কালে তাদের সামনে এলেন বাংলার জিহাদ নেতা মৌঃ ইমামউদ্দিন। তিনি এসে তাদের সামনে দাঁড়াতেই নূরউদ্দীন প্রশ্ন করলো—আচ্ছা জনাব, একটা বিষয়ে বড় হুজুরসহ আপনাদের এতটা উদাসীন দেখা যাচ্ছে কেন?

বুঝতে না পেরে ইমামউদ্দিন সাহেবও প্রশ্ন করলেন—কোন্ ব্যাপারে?

ঃ এই যে কিছু বারাকজাই নেতারা, বিশেষ করে ইয়ার মুহম্মদ খান আর সুলতান মুহম্মদ খানদের মতো কিছু নেতারা যে এই খিলাফতের প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত নয়, আপনারা তা এখনও অনুভব করতে পারছেন না কেন?

মৃদু প্রতিবাদের সুরে ইমামউদ্দিন সাহেব জবাব দিলেন—কে বললে আমরা তা অনুভব করতে পারছিনে? কম বেশি সবাই তা অনুমান করতে পেরেছি। বড় হুজুরও পেরেছেন।

সোহরাব হোসেন একথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে বললো—পেরেছেন? তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না কেন? খিলাফত থেকে এখনও তাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে না কেন?

ঃ তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। এখন তারা গোপনে আর ভয়ে ভয়ে চলছে। এদের গায়ে হাত দিলে এরা প্রকাশ্যে আর সামলা সামনি দুশমনী শুরু করবে।

ঃ হুজুর!

ঃ জানোই তো, সেরেফ ঐ কয়জনই নয়, এই উপজাতীয় নেতারা বেশীর ভাগই এই খিলাফতকে ভালবেসে বা জিহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই খিলাফতে যোগ দেয়নি। যোগ দিয়েছে অগত্যা। অল্প সংখ্যক নেতা ছাড়া অন্যেরা এই খিলাফতের প্রতি অধিক আন্তরিক নয়। কাজেই, ইয়ার মুহম্মদ-সুলতান মুহম্মদেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

www.pathagar.com

থাকবে তা মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে এদের প্রতিপন্ন করার এখনও কোন উপযুক্ত সূত্র পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া সন্দেহের উপর এদের খিলাফত থেকে বহিষ্কার করলে আর না হোক, এরা অন্যান্য নেতাদের আর উপজাতীয় মুজাহিদদের ক্ষেপিয়ে তুলবে এবং খিলাফত থেকে তাদেরও সরিয়ে নেবে। চরিত্রতো সবারই এদের নড়বড়ে। মজবুত নয়।

ঃ জিহাদ আন্দোলন সফল করে তুলতে হলে এসব নেতাদের সমর্থন আমাদের খুবই প্রয়োজন। নইলে এই উপজাতীয় মুজাহিদেরা অধিক একান্তভাবে আমাদের পক্ষে থাকবে না। থাকবে না মানে, এই অসৎ নেতারা থাকতে তাদের দেবে না। সুতরাং, এই নেতাদের আন্তরিক সমর্থন পাওয়া না গেলেও, সরাসরি বিরোধিতা করা থেকে এদের বিরত রাখা অপরিহার্য।

কথাটা বুঝতে পেরে সোহরাব হোসেন নিস্তেজ কণ্ঠে বললো—জি, তা বটে। কিন্তু—

ইমামউদ্দীন সাহেব আরো বললেন—তাছাড়া সুলতান মুহম্মদ খান—ইয়ার মুহম্মদ খানেরাও সবসময়ই সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছে। বলছে, পাঞ্জাবের কিছু শিখ ব্যবসা উপলক্ষে আগেও তাদের কাছে এসেছে এখনও আসছে। এরা রণজিৎ সিংয়ের লোক নয়, রাজনীতির সাথে এদের কোনই সংশ্রব নেই।

ঃ এদের কথা বিশ্বাস করেন হুজুর?

ঃ করিনে।.এরা যে বেঈমান তা পরিষ্কার হয়ে যেতে হয়তো অধিক সময় লাগবে না। তবু এক্ষণে কিছু করার নেই। এ অবস্থা মেনে নিয়েই এগুতে হবে আমাদের।

ঃ অধিক সময় যে লাগবে না, আপনারাও তাহলে তা অনুমান করেন?

ঃ কেন করবো না? দুরাচার শিখেরা যেভাবে এ খিলাফতের পেছনে লেগেছে আর ওদের যে হারে ব্যবহার করা শুরু করেছে—

কথার মাঝেই নূরউদ্দীন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো—শিখদের দোষ দিয়ে লাভ কি জনাব? ওদের উপর দোষারোপ করার সংগত কারণ নেই।

একথায় ইমামউদ্দীন সাহেব বিস্মিত হলেন। বললেন—কারণ নেই! এ তুমি কি বলছো?

ঃ কেন থাকবে? আমরা মুলমানেরা জাতি হিসেবে আমাদের সুবিধে দেখছি, শিখেরা, অর্থাৎ অমুসলমানেরা জাতি হিসেবে তাদের সুবিধে দেখছে। এজন্যে তাদের বড় একটা দোষ দেয়া যায় না।

ঃ নূরউদ্দীন!

ঃ কে কতটা ন্যায়ভাবে দেখছে আর অন্যায়ভাবে দেখছে—সে প্রসঙ্গ আলাদা। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুবিধে দেখছে, মোদ্দাকথা এইটেই। নিজের সুবিধে সবজাতিই দেখবে—এইটেই স্বাভাবিক আর মোটেই তা যুক্তিহীন নয়। কিন্তু মুসলমান নামের যে ব্যক্তিরা অমুসলমানদের দালাল হয়ে কেবল অমুসলমানদেরই সুবিধের দিক দেখে আর নিজের জাতি, ধর্ম ও দেশের স্বার্থ অমুসলমানদের কাছে বিকিয়ে দেয়, তাদের এ আচরণের পেছনে কি যুক্তি আছে, তাতো মাথায় আমার ঢোকে না।

www.pathagar.com

ইমামউদ্দীন সাহেব এবার খোশকণ্ঠে বললেন—সাব্বাস! তাই বলো?

নূরউদ্দীন ফের বললো—নিজের ভাল নাকি পাগলেও বোঝে। নিজের জাতিকে অন্যজাতির দাস বানিয়ে দিলে যে নিজেকেও সেই জাতির দাসেই পরিণত হতে হবে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিরাও যে তাদের দাসত্ব করা ছাড়া জিন্দেগীতে মাথা তুলতে পারবে না—এ বোধটুকুও কি এই নামধারী মুসলমানদের থাকতে নেই? কই, এমন দালালীতো কোন অমুসলমান মুসলমানদের জন্যে করে না বা মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না? স্বজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আর ইসলামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করা ছাড়া, কোন অমুসলমান স্বার্থের লোভে মুসলমানের দালালী করেছে, এমন নজীর তো আমার জানা নেই?

সোহরাব হোসেন বলে উঠলো—ঠিক ঠিক। বড়ো গুরুত্বপূর্ণ কথা!

ইমামউদ্দীন সাহেবের দিকে চেয়ে নূরউদ্দীন বলেই চললো—নিজেদের রক্ষাকবচ এই খিলাফত এই সুলতান মুহম্মদ—ইয়ার মুহম্মদেরা বানচাল করে দিলে শিখ আর ইংরেজেরা যে এরপর অনায়াসেই তাদের মাথার উপর পা তুল দিয়ে দাঁড়াবে, একথা কি এরা একটুও ভাবে না?

ইমামউদ্দীন সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না, ভাবে না। এ নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমানেরা যে তা ভাবে না, এ নজীর পলাশীর অনেক আগে থেকেই আছে।

নূরউদ্দীনও নিঃশ্বাস চেপে নিস্তেজকণ্ঠে বললো—জি-জি, তা অবশ্য ঠিক।

ইমামউদ্দীন সাহেব সখেদে বললেন—এটিই হলো আমাদের এই মুসলমান জাতির চরম দুর্ভাগ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মুসলমান জাতির যখনই যে ক্ষতি এর দুশমনেরা করতে চেয়েছে, তার জন্যে তখনই তারা এই মুসলমান জাতির ভেতর থেকে পেয়েছে অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দার। এই মুসলমান নামধারী গাদ্দারেরা বক্তব্য দিয়ে, লেখনি দিয়ে, হাত-পা দিয়ে, তরবারি ও বন্দুক দিয়ে আপন জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে দুশমনের সেবা করেছে। সামান্য কিছু অর্থ, পদমর্যাদা আর সুযোগ-সুবিধে দেখলেই তারা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে সেই দিকে ছুটেছে আর নিজের ধর্ম, ঈমান, বিবেক, আত্মসম্মানবোধ এবং দেশ ও জাতির স্বার্থ নির্দ্বিধায় বিকিয়ে দিয়ে বিজাতি-বিধর্মী দুশমনদের আজ্ঞা পালন করেছে।

ঃ বড়ই মর্মান্তিক।

ঃ মুসলমানদের যে ঈমান একদা দুনিয়ার তামাম সম্পদের বিনিময়েও কেনা যেতো না, এখন তা সামান্য একটু নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, এমন কি দু'চারটে বাহবা শব্দের বিনিময়েও কেনা যায় আর হরহামেশাই তা বিক্রি হতে দেখা যায়। এ দুর্ভাগ্যই আমাদের জাতিকে বার বার নিঃসীম অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। এই উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের গাদ্দারীও যে আমাদের আবার কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে, আল্লাহ মালুম।

ঃ জনাব!

ঃ আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিজের কাজ নিজেরা তোমরা করে যাও আর আমরাও হুজুরকে এ ব্যাপারে আরো সতর্ক করার চেষ্টা করে দেখি, উনি কি পদক্ষেপ নেন।

www.pathagar.com

ইমামউদ্দীন সাহেবদের চেষ্টা ইমামউদ্দীন সাহেবেরা করলেন, কিন্তু হুজুর কোন পদক্ষেপ নিলেন না। নিলেন না মানে, নিতে তিনি পারলেন না। ইমামউদ্দীন সাহেবেরাও জানতেন, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নেয়ার সুযোগ তার নেই। কিন্তু এ সুযোগ না থাকাটা কিংবা কিছুটা অস্বাভাবিকভাবেই এ সুযোগ করে না নেয়াটা অচিরেই বিষফল প্রসব করলো।

আকোরা ও হাজু যুদ্ধের পর শিখ সেনাপতি বুধ সিং 'শাইদু' নামক স্থানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করলো। মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে এবার সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব নিজে বীর বিক্রমে শিখ বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। শিখেরা এ আক্রমণ সামাল দিতে পারলো না। যুদ্ধে বুধ সিং নিহত হলো এবং শিখবাহিনী পরাজয়ের সীমানায় ও মুজাহিদ বাহিনী বিজয়ের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছে গেল।

ঠিক এ সময়েই শুরু হলো গাদ্দারদের গাদ্দারী। ইয়ার মুহম্মদ খান তার গোটা বাহিনী ও অনেক উপজাতীয় মুজাহিদদের নিয়ে এ সময় রণস্থল ত্যাগ করলো এবং বিপক্ষে গিয়ে মদদ জোগাতে লাগলো। বেঈমানীর এখানেই শেষ নয়। এই সাথে দেখা গেল ইয়ার মুহম্মদ খানের চক্রান্তে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। বিষের ক্রিয়ায় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সৈন্য চালনা করার সাধ্য তাঁর আর নেই। অথচ এ লড়াইয়ের তিনিই সিপাহসালার। এ দুর্ঘটনার ফলে মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে চরম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা পয়দা হলো। কিছু নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদেরা প্রাণপণ করেও বিপর্যয় রোধ করতে পারলেন না। মুজাহিদ বাহিনী করুণভাবে মিস্‌মার হয়ে গেল। প্রায় ছয় হাজার মুজাহিদ এ লড়াইয়ে শাহাদতবরণ করলেন।

পেটের মধ্যে শত্রুকে জিয়িয়ে রাখার নিদারুণ খেশারত জিহাদ নেতাদের দিতে হলো। এ লড়াইয়ের পর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সাইয়্যীদ আহমদ তাঁর সদর দপ্তর হণ্ড থেকে পাঞ্জতরে স্থানান্তরিত করলেন। ইয়ার মুহম্মদ খান সেই থেকেই তার শত্রুতা চালিয়ে যেতে লাগলো। তার ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে দূরদূরান্তের অর্থ ও মুজাহিদ দল খলিফার কাছে আসতে গেলে, ইয়ার মুহম্মদ শুধু বাধাই সৃষ্টি করলো না, নানাভাবে তাদের বিপর্যয় ঘটিয়ে যেতে লাগলো।

এতেও সে থামলো না। শিখদের প্ররোচনায় ও মদদে অন্যান্য উপজাতি নেতাদের সাথে নিয়ে সে খলিফার অনুগত ভূখণ্ডগুলোর উপর পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে লাগলো। বাধ্য হয়ে খলিফা এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক উপজাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। একের পর এক তাদের পরাস্ত করে পেশোয়ার পর্যন্ত ধাবিত হওয়ার উদ্যোগ নিলেন!

কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বেঈমানীর শিকড় অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল। সাঈয়্যীদ আহমদকে আরো অধিক অগ্রসর হতে দেখে উপজাতীয় মুজাহিদদের মস্তবড় এক দল সাঈয়্যীদ আহমদের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর বাহিনী থেকে বেরিয়ে গেল। সাইয়্যীদ আহমদ থমকে গেলেন। পরিস্থিতি ঘোলাটে দেখে তিনি অভিযান স্থগিত করে ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

ফিরে এসে তিনি চিন্তা করে দেখলেন, খিলাফতের প্রতি এই সমস্ত উপজাতির আন্তরিক সমর্থন পেতে হলে, এদের মনের অন্ধকার আগে দূর করা প্রয়োজন। মুখে ছাড়া অন্তরে এদের আদৌ ইসলাম নেই। এদের মধ্যে ইসলামকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, জিহাদ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রতি এরা দরদী হবে না।

সাইয়্যীদ আহমদ ধর্মীয় সংস্কার কাজে হাত দিলেন। এসব উপজাতিরা নামাজ, রোজা ও ইসলামের অন্যান্য অনুশাসন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। খিলাফতের মধ্যে ইসলামের অনুশাসন শক্তভাবে চালু করার ইরাদায় তিনি আলেম—উলামাদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠান করলেন। এ সভায় উপজাতি নেতা হণ্ডের খাদে খান, পাঞ্জতরের ফতে খান এবং জাইদার আশরাফ খান যোগ দিলেন। সকলেই একমত হয়ে সাব্যস্ত করলেন, খিলাফতের মধ্যে অতপর শরীয়তের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চালু করা হবে। উপজাতি প্রধানগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডে কঠোরভাবে শরীয়ত চালু করার ওয়াদা দিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, খিলাফতের মধ্যে ইসলামের নির্দেশ ও বিধিবিধান সঠিকভাবে চালু ও তদারক করার জন্যে কাজী, মুহ্তাসিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! উপজাতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ও শরীয়ত চালু করার তামাম চেষ্টা উল্টা এসে সাইয়্যীদ আহমদকেই আঘাত করলো। উচ্ছৃঙ্খল ও বল্গাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত উপজাতি শরীয়তের বাধা বন্ধন মোটেই আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারলো না। শরীয়ত প্রয়োগকারী অনেক কর্মচারীও বাড়াবাড়ি করে উপজাতিদের অনুভূতি অনেকখানী ক্ষুণ্ন করলো। ইসলামিক কর, বিশেষ করে জাকাত আদায় করতে শুরু করলে, কাঠমোল্লাদের স্বার্থে ভীষণভাবে আঘাত লাগলো। এর আগে এগুলো তারাই ভোগ করতো। এ নিয়ে মোল্লারা কলহে প্রবৃত্ত হলো ও শরীয়তের বিরুদ্ধে উপজাতিদের চরমভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। ইতিমধ্যে কিছু হিন্দুস্তানী মুজাহিদ উপজাতি তরুণীদের শাদি করে বসায়, উপজাতিদের গোত্রীয় অহংকারে ও আত্মসম্মানে ঘা লাগলো। তাতেও অনেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এই সাথে যোগ হলো রণজিৎ সিংয়ের চরদের প্ররোচনা আর উপজাতিদের মজ্জাগত হিংসা, বিদ্বেষ ও দোদুল্যমান চরিত্র।

যে খাদে খান সভায় উপস্থিত থেকে শরীয়ত চালু করার ওয়াদা করলো, সে-ই শেষে শরীয়তের বিরুদ্ধে চরম দুশমনী করা শুরু করলো। হণ্ড থেকে খিলাফতের কেন্দ্রীয় দপ্তর তার ব্যক্তিগত দুশমন ফতে খানের পাঞ্জতরে পার করায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। শিখ সেনাপতি ভেঞ্চুরাকে সাথে নিয়ে খাদে খান পাঞ্জতর আক্রমণ করে বসলো। আক্রমণ প্রতিহত করে সাইয়্যীদ আহমদ বাধ্য হয়েই খাদে খানের হণ্ড আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে খাদে খান পরাজিত ও নিহত হলো। কিন্তু হণ্ড দখল করা সাঈয়্যীদ আহমদ সাহেবের ইচ্ছে নয়, এটা বুঝাতে তিনি হণ্ড খাদে খানের আত্মীয়দের ফেরত দিলেন।

কিন্তু এ জাতির তবুও বোধোদয় হলো না। খাদে খানের আত্মীয়েরা কোহাটের ইয়ার মুহম্মদ খানের সাথে একত্র হয়ে সাইয়্যীদ আহমদকে আক্রমণ করলে, যুদ্ধে ইয়ার মুহম্মদ খানও পরাজিত ও নিহত হলো।

www.pathagar.com

এতেও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলো না। ইয়ার মুহম্মদ খানের মৃত্যুতে তার ভাই পেশোয়ারের সুলতান মুহম্মদ খান, তামাম বারাকজাই উপজাতি ও খাদে খানের আত্মীয়েরা জোট বেঁধে ফেললো। দাঁও বুঝে রণজিত সিংও সাতশত বাছাই বাছাই শিখ সৈন্য এদের সাহায্যে পাঠালে, এ জোট খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ও হণ্ড দখল করে নিল।

ফলে, ঈসায়ী ১৮৩০ সন গোটা এই উপজাতি জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং কর্মকেন্দ্র কাশ্মীরে সরিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিতে কেটে গেল। কাশ্মীরের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং শিখদের অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ ছিল। কাশ্মীরের সাথে কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড কাঘান এবং চিত্রোলের অধিবাসীরাও খিলাফতের সাথে একাত্ম হওয়ার ও খলিফা সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবকে সাহায্য করার ওয়াদা করে পাঠালো। কাশ্মীরে পৌঁছতে পারলে সাইয়্যীদ আহমদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় হতো।

কিন্তু কাশ্মীরে যাওয়ার পথ 'অম্ব' এর মধ্যে দিয়ে। অম্বের শাসক পায়েন্দা খান পথ দিতে এবং সাঈয়্যীদ আহমদের সাথে যোগ দিতে সরাসরি অস্বীকার করলো। সাঈয়্যীদ আহমদ অগত্যা তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করলেন। এরপর তিনি তাঁর ভাতিজা আহমদ আলীর অধীনে কাশ্মীরের দিকে পথ করার উদ্দেশ্যে এক অগ্রিম বাহিনী প্রেরণ করলেন।

কিন্তু চারদিকে গাদ্দার ও দুশমনের আধিক্য থাকলে কোন কাজেই গোপনীয়তা আর নিরাপত্তা থাকে না। খবর গেল রণজিৎ সিংয়ের কাছে। মুজাহিদেরা যাতে করে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিং তাঁর সেনাপতি আলার্দ ও হাজারীর শাসনকর্তা হরি সিংয়ের অধীনে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বিশাল শিখ বাহিনীর অতর্কিত ও আকস্মিক হামলায় মুজাহিদেরা পরাজিত হলেন এবং আহমদ আলী শাহাদত বরণ করলেন।

এদিকে সুলতান মুহম্মদ খান ও তার জোট মুজাহিদদের ঘাঁটির উপর পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে থাকলে, সাইয়্যীদ আহমদ বাধ্য হয়ে সাত হাজার মুজাহিদ নিয়ে পেশোয়ার আক্রমণ করলেন। বিপদ অবশ্যম্ভাবী দেখে এবং নিরুপায় হয়ে সুলতান মুহম্মদ খান এতে আবার আনুগত্য স্বীকারের আবেদন জানালো সাইয়্যীদ আহমদ স্বজাতির রক্ত ঝরাতে চাইলেন না। তাঁর অনুসারীদের প্রবল আপত্তির মুখে তিনি তাই সুলতান মুহম্মদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তাতে করে এক মস্ত বড় ভুল করলেন।

কারণ, পেশোয়ার থেকে মুজাহিদ বাহিনী সরে আসার সাথে সাথে সুলতান মুহম্মদ খান আবার দুশমনী শুরু করলো। ঈসায়ী ১৮৩১ সনের প্রথম দিকে সে শিখদের বিপুল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে এ এলাকার নয় নয়টি শক্ত ঘাঁটি, যা তখনও মুজাহিদদের দখলে ছিল, একের পর এক অধিকার করে বসলো। সুশিক্ষিত শিখবাহিনী নিয়ে রণজিত সিংয়ের জীবনপণ হামলার সাথে সম্মিলিত উপজাতি নেতারা ও উপজাতি জনগণ চারদিক থেকে এক যোগে পুনঃ পুনঃ হামলা চালাতে থাকায়, মুজাহিদেরা আর তা সামাল দিতে পারলেন না।

www.pathagar.com

এ সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে অনেক নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ শাহাদত বরণ করলেন। এরা অধিকাংশই বাংলা ও পাটনা থেকে আগত মুজাহিদ। শেষের দিকে যাঁরা শহীদ হলেন আতাহার আলী ও জান মুহম্মদ তাঁদের মধ্যে দুইজন।

এই সম্মিলিত দুশমনেরা মুজাহিদদের শেষ ঘাঁটি দখল করে নেয়ার সময় নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন, জান মুহম্মদ প্রমুখ বাংলার ক্ষুদে ক্ষুদে অধিনায়ক বা দলপতিরা নিজ নিজ দল নিয়ে প্রাণপণে দুশমনদের বাধা দেয়। এই বাধা দানকালে বেশ কয়েকজন মুজাহিদের সাথে শহিদ হলো জান মুহম্মদ নিজে আর নূরউদ্দীনের দলের মরণজয়ী মুজাহিদ আতাহার আলী।

লড়াই শেষে সঙ্গীদের খোঁজ নিতে গিয়ে নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন ও অন্যান্যেরা দেখলো, দুশমনদের কিছু লাশের সাথে কয়েকজন মুজাহিদ ও জান মুহম্মদ লাশ হয়ে পড়ে আছে। তাদের প্রাণবায়ু অনেক আগেই দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে। তারা আরো দেখলো, সেখান থেকে একটু দূরে আতাহার আলী মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থেকে কাতরাচ্ছে। তার জান তখনও আছে। তার দুই পাশে পড়ে আছে দুই তিন জন চিহ্নিত উপজাতীয় গাদ্দার নেতাদের লাশ।

দেখামাত্র নূরউদ্দীন ছুটে গিয়ে আতাহার আলীকে কোলের উপর তুলে নিলো। কিন্তু আতাহার আলীর তখন একেবারেই অন্তিম অবস্থা। তা দেখে নূরউদ্দীন কেঁদে উঠে বললো—হায় হায়! নিজের একি সর্বনাশ করলেন আপনি? বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখেই আপনি ফাঁকে সরে এলেন না কেন? এভাবে জান দিতে গেলেন কেন খামাখা? কি করুণ ব্যাপার! আপনার ব্যর্থ জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল!

আতাহার আলী চোখ মেলে অতি কষ্টে বললো—আফসোস করবেন না ভাই সাহেব। আমার জীবন আমি কানায় কানায় সার্থক করে নিয়েছি। আর আমার দুঃখ নেই।

ঃ ভাই!

তার দু'পাশে পড়ে থাকা দু' তিনটি লাশের প্রতি ইশারা করে আতাহার আলী ফের টেনে টেনে বললো—কোন ইংরেজ, নীলকর বা জমিদার মারতে না পারলেও, এই কয়জন গাদ্দারকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছি। ওদের মারার চেয়ে এ গাদ্দারদের মারতে পারায় আমি অধিক আনন্দ পাচ্ছি।

ঃ আতাহার আলী সাহেব!

ঃ এদের মতো গাদ্দারেরাই পলাশীর প্রান্তরে আমাদের এ জাতির চরম সর্বনাশ করেছে। সেদিন গাদ্দারেরা গাদ্দারী না করলে আজ আমাদের এ অবস্থা হতো না। আমাদের বড় দুশমন এরাই। এ গাদ্দারেরাই। ইংরেজ বা অন্য কেউ নয়। প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম, প্রতিশোধ আমি যথাযথই নিয়েছি। জীবন আমার সার্থক।

ঃ ভাই সাহেব।

আতাহার আলীর শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই ঘন হয়ে এলো। কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলো না। এর পর অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—আমার জন্যে একটু দোয়াকালাম পাঠ করুন—

www.pathagar.com

উপস্থিত সকলেই বেদনাভরা কণ্ঠে কলেমা পাঠ করতে লাগলো। তারই মধ্যে আতাহার আলীর প্রাণবায়ু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

আহাজারীর সাথে শহীদদের লাশগুলো নিরাপদ স্থানে এনে দাফন করার পর নূরউদ্দীনেরা ব্যর্থ চিত্তে ময়দান থেকে ফিরে এলো। মুজাহিদদের ঘাঁটিগুলো সবই দুশমনের দখলে চলে গেল।

আর দাঁড়াবার স্থান নেই। পরিস্থিতি যারপর নেই প্রতিকূল হয়ে উঠায় এবং চরম মুসিবত সন্নিকট হওয়ায়, সাইয়্যীদ আহমদ অগত্যা অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে দুর্গম চুমলা উপত্যকা বেয়ে কাশ্মিরের পথ ধরলেন। কিন্তু এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তিনি কাশ্মিরে পৌছতে পারলেন না। পেছনে সম্মিলিত উপজাতি এবং সামনে শিখদের প্রায় সমুদয় সৈন্য নিয়ে শের সিং ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিখ সেনাপতিরা সাইয়্যীদ আহমদকে ঘিরে দাঁড়ালো। মুজাহিদদের নিয়ে সাইয়্যীদ আহমদ এ সময় নামাজে রত ছিলেন। অস্ত্র তাদের পাশেই ছিল। (উল্লেখ্য যে, সাইয়্যীদ আহমদ সবসময় সৈনিকের মতো হাতে বন্দুক ও কোমরে ছোরা নিয়ে ঘুরতেন। আত্মরক্ষার মতো অস্ত্র মুজাহিদেরাও সাথে রাখতেন)।

নামায শেষ হতে না হতেই তারা টের পেলেন, বিশাল দুশমন বাহিনীর আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁরা অবস্থান করছেন। সরে যাওয়ার পথ নেই। বিশেষ প্রস্তুতি নেয়ারও সময় নেই। সামনের বালাকোট নামক স্থানে তাঁর নিতান্তই সীমিত শক্তি নিয়ে ঐ বিশাল ও সম্মিলিত দুশমন বাহিনীর বিরুদ্ধে সাইয়্যীদ আহমদ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। জয় এবং আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আত্মসমর্পন না করে তিনি বীরের মতো লড়তে লাগলেন। অকুতোভয় সিংহের মতো লড়তে লড়তে ঈসায়ী ১৮৩১ সনের ৬ই মে তারিখে সাইয়্যীদ আহমদ (সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহঃ) বালাকোটের ময়দানে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য ও সৈনিক শাহ ইসমাইল এবং বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ তাঁর সাথে শহীদ হলেন। মুজাহিদ বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং সেই সাথে বালাকোটের ময়দানে জিহাদ আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। তাৎক্ষণিকভাবে লড়াই করার মতো কোন মুজাহিদ বাহিনী ও সংগঠন রইলো না।

বিশিষ্ট সাগরিদ শাহ ইসমাইল ও প্রচুর সংখ্যক মুজাহিদসহ সাইয়্যীদ আহমদ সাহেব শাহাদাত বরণ করার পর যাঁরা জীবিত ছিলেন এবং হেথায় হোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, লড়াই শেষে সেসব নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদগণ সবাই এসে এক নিরাপদ স্থানে একত্রিত হলেন। শাহ্ ইসমাইল বাদে সাইয়্যীদ আহমদ সাহেবের বিশিষ্ট সাগরিদেরা অল্পবিস্তর আহত অবস্থায় প্রায় সকলেই জীবিত ছিলেন। যে অল্প সংখ্যক মুজাহিদ জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সামান্য আহত অবস্থায় নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন ও বরকতুল্লাহও ছিল।

সকলে একত্রিত হওয়ার পর যে প্রসঙ্গ নিয়ে প্রথমে অনেক কথা হলো, তাহলো —সাইয়্যীদ আহমদ (রহঃ) রণক্ষেত্রে নিহত হননি (তার লাশ কেউ শনাক্ত করতে

www.pathagar.com

পারেনি), তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন। সময় মতো আবার তিনি আবির্ভূত হবেন। এ বিশ্বাস অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে রইলো। অপর পক্ষে, কেউ কেউ এটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এ প্রসঙ্গ শেষ হলে মৌঃ বিলায়েত আলী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে বললেন এবং জিহাদ আন্দোলন নতুন করে গড়ে তোলার আবেদন রাখলেন।

এ প্রেক্ষিতে নূরউদ্দীন বিলায়েত আলী সাহেবকে প্রশ্ন করলো—আপনি ফিরে যাবেন না জনাব?

বিলায়েত আলী সাহেব বললেন—না। আমরা কয়েকজন এখানেই 'সিত্তানা'য় কিছু দিন থাকবো। সিত্তানাতে থেকে নতুন করে এখানে আবার জিহাদ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখবো।

নূরউদ্দীন করুণ কণ্ঠে বললো—হুজুর!

বিলায়েত আলী বললেন—ভুলে যেও না, জিহাদ আন্দোলন এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এর প্রথম প্রবাহটা বাধাপ্রাপ্ত হলো মাত্র। এ জিহাদ অতপর চলবেই আর আমাদের তোমাদের সবাইকে এ আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

ঃ তাহলে আমরা কেন ফিরে যাবো হুজুর?

ঃ আমার সাথে কিছু লোক আছে। আমাদের প্রাথমিক চেষ্টাটা ওদের দিয়েই চলবে। এক্ষণে তোমাদের আর প্রয়োজন নেই।

ঃ হুজুর।

ঃ নতুন করে এখানে আবার যদি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তখন অবশ্যই তোমাদের স্মরণ করা হবে। এখন তোমরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাও আর সেখানে গিয়ে এ আন্দোলন আবার জোরদার করে তোলার চেষ্টা করো। এ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে চলবে না। একে জিয়িয়ে রাখা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন না করলে, মরহুম হুজুরের সাথে আমাদের বেঈমানী করা হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নূরউদ্দীন ফের দুঃখিত কণ্ঠে বললো—এমনটি যে হবে, এটা আমরা কল্পনাও করিনি হুজুর। এই সীমান্তের এরা যে সবাই এভাবে গাদ্দারী করবে আর আমাদের সংগ্রাম যে হঠাৎ করে মাঝপথে এভাবে থেমে যাবে—

বিলায়েত আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কি করবে বলো? সবই আমাদের নসীব! সীমান্ত এলাকার এ নির্বোধেরা যে কি ভুল করলো আর এই তামাম হিন্দুস্তানের মুসলমানদের যে কি এক বিরাট সম্ভাবনা এখানে বরবাদ হয়ে গেল, তা বলে শেষ করা যাবে না। নবী করিম (সা) যেমন মদিনাতে স্থান ও আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিলেন, আমাদের নিয়ে আমাদের মরহুম হুজুর সাইয়্যীদ আহমদ (র)-ও যদি এই সীমন্ত এলাকায় নিরাপদ স্থান আর উপজাতিদের আন্তরিক সমর্থন পেতেন, জিহাদের মূল্য যদি এ নির্বোধ উপজাতিরা উপলব্ধি করতে পারতো, তাহলে তাঁর

www.pathagar.com

খিলাফত আর না হোক, সমগ্র হিন্দুস্তানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই, এই হিন্দুস্তান থেকে চিরতরে উৎখাত হতো বিজাতীয় নির্যাতন ও আগ্রাসন আর দখলদার ইংরেজ বেনিয়ারা। এখানকার উপজাতিদের কমজোর ঈমান অজ্ঞতা আর হিংসুটে স্বভাবের জন্যেই এই বিপুল সম্ভাবনাটা মাটিচাপা পড়ে গেল। এ সম্ভাবনা আবার আমরা পুনর্জীবিত করে তুলতে পারবো কিনা, কে জানে!

বেলায়েত আলী সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। অন্যেরা কেউ কথা না বলে নীরবে বিলায়েত আলী ও নূরউদ্দীনের কথোপকথন শুনছিলেন। এবার তাঁরাও সকলেই সবলে নিঃশ্বাস চাপতে লাগলেন।

এরপর শুরু হলো বিদায়ের পালা। সে এক করুণ দৃশ্য। শহীদদের স্মৃতিতে এবং দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের নিকট থেকে বিদায় নিতে প্রত্যেকেই বেদনায় ভেঙে পড়তে লাগলেন। অনেকক্ষণ আহাজারী করার পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর চোখের পানি মুছতে মুছতে অবশেষে সবাই নিজ নিজ গন্তব্য পথে রওনা হলেন।

৮

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছুটে। বালাকোটের বিপর্যয়ের খবরও বিদ্যুৎবেগে ছুটে এলো বাংলায়। বাংলার অবশিষ্ট মুজাহিদেরা ফিরে আসার আগেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো বাংলার সর্বত্র। খবর এলো ইয়ারপুরেও। ইয়ারপুরে এসেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো এ খবর অনেকখানি অতিরঞ্জিত হয়ে গেল। ইয়ারপুর গ্রামবাসীরা শুনলো, জিহাদ আন্দোলন সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থে ধুলোয় মিশে গেছে। সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভীসহ তামাম নেতা তামাম মুজাহিদ বিলকুল খতম। একজন লাকরী-পানির যোগানদাতাও প্রাণে বাঁচতে পারেনি। বিশেষ করে, বাংলার যারা লড়াই করতে গিয়েছিল, তারা সাকুল্যে কাবার। শেয়াল-শকুনের পেটে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ তো মানুষ, বাংলা মুলুকে ফিরে আসার মতো একটা কাকপক্ষীও আর সীমান্ত এলাকায় নেই।

খবরের এ অতিরঞ্জনটুকু জেকের আলীর উল্লাসের ফসল। 'জিহাদ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সাইয়্যীদ আহমদ বেরলভী সহ মুজাহিদেরা অধিকাংশই শহীদ হয়ে গেছেন—এ চুম্বক খবরটা ইয়ারপুরের তিন চার জন লোক দূরবর্তী এক গঞ্জ থেকে শুনে এলো। ইয়ারপুরের 'দরবার-ই-আম' আদু শেখের বাহির আঙ্গিনা। তামাকের টানে তাদের দু'জন সেখানে এসে এ খবর আদু শেখকে শুনালো। জেকের আলীরও এখন এ দরবারেই অধিক আনাগোনা। অন্যখানে পাত্তা আর তার নেই তেমন। সেও এ সময় হাজির ছিল এখানে। এদের মুখে এ খবর শুনামাত্রই উল্লাসে নেচে উঠলো জেকের আলী। ঢোল নিলো কাঁধে। ইচ্ছে মতো রং চং লাগিয়ে খবরটা সে পাড়ায় পাড়ায় বিতরণ করতে লাগলো। মুজাহিদ দলের নেতা হতে না পেরে যে জিহাদে সে অংশ গ্রহণ করেনি, সে জিহাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো সুখবর জেকের আলীর কাছে আর হতে পারে কি?

www.pathagar.com

মনের আনন্দে সে খবরটাকে টেনেটুনে হাত কয়েক লম্বা আর মনের ক্ষোভ মিটিয়ে আরো খানিক করুণ করে গাঁয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগলো। নূরউদ্দীনের কথা উঠলেই, "আরে তার লাশ তো সবার আগেই শেয়াল কুকুরে খেয়েছে। আব্বাগো আম্মাগো বলে সেকি কান্নাকাটি, তবুও নিস্তার পায়নি।" প্রত্যক্ষদর্শীর মতো সে নির্দ্বিধায় এসব কথা শুনিয়ে গেল সবাইকে। এতে করে, গঞ্জ থেকে শুনে আসা লোকদের খবরটা জেকের আলীর তুফানে গৌণ হয়ে হারিয়ে গেল। জেকের আলীর পরিবেশিত খবরটাই মুখ্য হয়ে গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো।

রোকসানা ফিরদৌসেরও কানে এলো খবরটা। পাশের বাড়ির মেয়েরাই ছুটে এলো খবর নিয়ে। বাহার খাঁ বাদে সকলেই এ সময় বাড়িতে ছিলেন। বাহার খাঁ সাহেবের চাচা-চাচীরা ফিরে এসেছেন এর মধ্যে। তারাও ছিলেন, বাড়ির কাজের ঝি কাজের লোকও ছিলো। রোকসানার ভাবীসহ প্রাথমিক ধাক্কায় সকলেই বিহ্বল হয়ে গেলেন। রোকসানা বাদে সকলেই 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কারো মুখে বাক্যস্ফূরণ হলো না।

এ খবরে মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা হলো রোকসানার। প্রথমে তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো। এরপর, "নূরউদ্দীনের লাশও শেয়াল কুকুরে খেয়েছে"—একথা কানে যাওয়া মাত্র সে ডুকরে কেঁদে উঠতে গেল। কিন্তু লোকজন সামনে থাকায় কেঁদে উঠতে পারলো না। নিতান্তই দৃষ্টিকটু ও বিষাদৃশ্যবোধে সে সবলে কান্নার বেগ দমন করতে লাগলো আর থর থর করে কাঁপতে লাগলো অবিরাম। বন বন করে ঘুরে উঠলো মাথা। দু'চোখ তার আঁধার হয়ে এলো।

এ অবস্থা আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে, পড়েই যেতো রোকসানা। মূর্চ্ছাই যেতো সেখানে। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা কানে আসায় সে আবার শক্তি খুঁজে পেলো। আশার আলো জ্বলে উঠলো অন্তরে। খবরের উৎস সম্পর্কে তার ভাবী রাবিয়া বেগম পরশীদের প্রশ্ন করলে তারা জানালো, জেকের আলীর মুখে তারা এ খবর শুনেছে। জেকের আলীই পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে এ খবর।

ভাবীসহ রোকসানা এতে অনেকখানি আশ্বস্ত হলো। গুজব ছড়াতে জেকের আলী উস্তাদ, মিথ্যা ছাড়া সত্যের সাথে জেকের আলীর সম্পর্ক বড়ই কম—একথা তারা জানতো। বিশেষ করে, সেবারের ঐ নারীহরণের ঘটনাসহ তার অন্যান্য আরো অনেক অপকীর্তিকে নির্জলা মিথ্যা করে রটানোর পর থেকে এ ব্যাপারে তারা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এতে করে ভাবী ননদ দু'জনই এই ভেবে আশ্বস্ত হলো যে, এ ঘটনাও নির্জলা মিথ্যা হতে পারে। জিহাদের প্রতি জেকের আলী চরম বিদ্বেষী বলেই মিথ্যা করে এ খবর রটাচ্ছে। খবরটা তলিয়ে না দেখেই এতটা ঘাবড়ানোর কারণ নেই। খাঁ সাহেব বাইরে আছেন। সত্য হলে ঘটনাটা কানে তার পড়বেই। তিনি ফিরে এলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ফিরে এলেন বাহার খাঁ সাহেব। ঐ গঞ্জের দিকেই এক গাঁয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খবর শুনে তিনিও টলতে টলতে ফিরে এলেন বাড়ীতে।

ঐ চুম্বক খবরটাই বাহার খাঁ শুনলেন। জিহাদ আন্দোলন বরবাদ হয়ে গেছে, সাইয়্যীদ আহমদ হুজুরসহ অধিকাংশ মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছেন—এ খবর তিনি

www.pathagar.com

পর পর কয়েকজন পথিকের মুখে শুনলেন। এদের মধ্যে দু'জন পথিক বাহার খাঁর খুব পরিচিত মানুষ। দানাদার লোক। কোন গুজব গেয়ে বেড়ানোর লোক নন।

খবরটা শুনে প্রথমে তিনিও চমকে গেলেন। সহসা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু পরপর আরো লোকের মুখে, বিশেষ করে দু' দু'জন দামী লোকের মুখে ঐ একই খবর শুনে, তার আর অবিশ্বাসের কারণ কিছু রইলো না। নিদারুণ আফসোসে তিনি পথের ওপরই বসে পড়লেন। আহাজারী করতে লাগলেন। তামাম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল তার, এতবড় এক মহান উদ্যোগ বরবাদ হয়ে গেল এবং সর্বোপরি, তার পাঠানো মুজাহিদেরা ঐ বিভুঁই বিদেশে গিয়ে মারা পড়লো দল ধরে, হয়তো বা সকলেই—এ বেদনায় কিছুক্ষণ তিনি বুক চাপড়ালেন বসে বসে। যে জায়গায় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন, সেখানে আর যাওয়া তার হলো না। অতপর উঠে তিনি উদ্ভ্রান্তভাবে বাড়ীর দিকে ফিরে আসতে লাগলেন এবং ফিরে আসার পথেও অনেকের মুখে ঐ আলোচনাই শুনতে শুনতে ফিরে এলেন।

বাহার খাঁ সাহেবের বাড়ী ফেরার অপেক্ষায় ভাবী-ননদ উভয়েই বুক বেঁধে ছিল। তিনি ফিরে এলেই জেকের আলীর এ প্রচারণা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে, এই ছিল দৃঢ় আশা তাদের। কিন্তু দেউটি দিয়ে বাহার খাঁকে টলতে টলতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখে আঁতকে উঠলো উভয়েই। ছ্যাঁৎ করে উঠলো তাদের বুকের ভেতর। তবে কি জেকের আলীর রটনাটাই সত্যি ? সব রটনাই তার মিথ্যা রটনা হয়, সত্যি হলো কি একমাত্র তাদের বেলাতে এসেই ?

পেরেশান অবস্থায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বাহার খাঁ সাহেব কারো সাথে কোন কথা বললেন না। সরাসরি ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর থপ করে বসে পড়লেন। তা দেখে ভাবী ননদ শংকিতভাবে সেই দিকে ছুটলো। রাবিয়া বেগম পড়িমরি ঘরের মধ্যে ঢুকলো আর রোকসানা এসে দরজার বাইরে দাঁড়ালো।

ঘরে ঢুকেই রাবিয়া বেগম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি হয়েছে আপনার ? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ? তবে কি যা শুনলাম তা সত্যি ?

তারা কি শুনেছে আর শুনেনি বাহার খাঁ সাহেব সে কথায় গেলেন না। তিনি তার নিজের ভাবে বললেন—আশা-ভরসা তামামই বরবাদ হয়ে গেল। এতদিনের এত তকলিফ আমার সব মিথ্যে হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ বলে আমাদের আর কিছুই রইলো না।

একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে রাবিয়া ফের প্রশ্ন করলো—কিসের কথা বলছেন আপনি ? কোন্ ঘটনার কথা ?

ঃ জিহাদ। জিহাদ আন্দোলন খতম হয়ে গেছে। সাইয়্যীদ আহমদ হুজুর আর ইহ দুনিয়ায় নেই। তার সাথে মুজাহিদেরা প্রায় সবাই শেষ। অল্প কিছু বাদে সকলেই ঐ দূর এলাকায় শহীদ হয়ে গেছেন।

ঃ এ্যাঁ। একি বলছেন ? এ খবর তাহলে সত্যি ?

ঃ সত্যি মানে কি ? এ খবর এখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে। এতবড় ঘটনা কি চাপা থাকার জিনিস ?

www.pathagar.com

ঃ সেকি! তাহলে নূরউদ্দীন সাহেব, সোহরাব হোসেন সাহেব, এদের খবর কি? এদের খবর কি কিছু জানেন?

ঃ কি আর জানবো? প্রায় সকল মুজাহিদই শহীদ হয়েছে যেখানে, সেখানে এরা জিন্দা থাকবে, এ ধারণা করার কোন অর্থই নেই।

ঃ মানে?

ঃ অন্যের কথা হলে হয়তো কিছুটা আশা করা যেতো। কিন্তু যে ডানপিটে ছেলে ওরা, ওদের নিয়ে কোন আশাই নেই। ওদের কি মৃত্যু ভয় বলে কিছু ছিল? সবার আগে ওরাই যে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিয়েছে—আমার কাছে এটা দিনের মতো পরিষ্কার। ওরা কেউ আর বেঁচে নেই। খতম হয়ে গেছে।

ঃ হায় আল্লাহ! একি নিদারুণ কথা বলছেন!

ঃ নিদারুণ তো বটেই। ওদের মউতের জন্যে আমিই দায়ী। নিজেই আমি এ জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আমার কথায় আর আমার উৎসাহেই এই জিহাদে শরিক হয়েছে ওরা। নিজের তরফ থেকে এতটা হয়তো হতো না। আমিই ওদের মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিলাম।

ঃ হায় হায়! একি গর্জব!

ঃ বিশেষ করে নূরউদ্দীনের জন্যেই আমি বিবেকের দংশনে অধিক বিক্ষত হচ্ছি। আহা বেচারা! নিজের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সে এখানে এসে ছিল আর বাঁশী বাজিয়ে বেড়াতো। তার কেন এ সর্বনাশ করলাম আমি? নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেব প্রশ্ন করলে, কি জবাব দেবো আমি তাঁকে?

বাহার খাঁ টান হয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্য দেখে আর এসব কথা শুনে রোকসানা ফিরদৌস ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। শব্দ বেরুনোর আগেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সে উন্মাদিনীর মতো নিজের ঘরে ছুটে গেল। ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে বিছানার উপর পড়ে গেল। এতদিন ধরে লালন করা স্বপ্ন তার একেবারেই মিথ্যা হয়ে গেল ভেবে অনেকক্ষণ যাবত সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। নূরউদ্দীনের মনের কথা যা-ই হোক আর নজর তার যার দিকেই থাকুক, নূরউদ্দীন ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আজ পর্যন্ত স্থান পায়নি তার অন্তরে। আকিঞ্চন তার পবিত্র, একনিষ্ঠ আর দুর্নিবার হলে, নূরউদ্দীন তার দিকে উদাসীন হয়ে থাকতে পারবে কতদিন—এই ছিল রোকসানার অন্তরের ভাষা। সেই নূরউদ্দীন শেষ পর্যন্ত দুনিয়া ছেড়েই চলে গেল? মরিচিকার মতোই সে মিলিয়ে গেল বিলকুল? রোকসানার জন্যে আর তাহলে থাকলো কি এ দুনিয়ায়?

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে নিজেকে সামলে নিলো রোকসানা ফিরদৌস। উঠে বসে স্থিরচিত্তে সে চিন্তা করে দেখলো, অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও আশা করার ফাঁক তো কিঞ্চিৎ আছেই। নূরউদ্দীন যে মরেই গেছে, বেঁচে নেই, এটা তো চোখে কেউ দেখেনি। সকলেরই শোনা খবর আর সব টুকুই অনুমান। সব মুজাহিদ শহীদ হয়নি। অল্প কিছু বেঁচে আছেন এখনও। খবর যখন এই, তখন এমনও তো হতে পারে—তাদের মধ্যে বেঁচে আছে সেও? আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে কিনা হতে পারে? এ নিয়ে তার নিরন্তর আহ্বান আল্লাহ তায়ালা কি একটুও শুনেননি?

www.pathagar.com

এরপর সে ভাবলো, সবার আগেই তার লাশ শেয়াল-কুকুরে খেয়েছে—একথা তো তার ভাইয়ের মুখে একবারও আসেনি ? একমাত্র জেকের আলীই একথা এমন নিশ্চিতভাবে বলছে। কিন্তু জেকের আলী তো লড়াইয়ের ঐ সুদূর ময়দান থেকে দেখে এসে বলছে না ? সেও বলছে অনুমানের উপর। তার ব্যক্তিগত ঈর্ষার কারণেই সে হয়তো এটা এত জোর দিয়ে বলছে। আসলে তার এ জোর দেয়ার পেছনে বাস্তব কোন উৎস বা সূত্র কিছু আছে, না নিছক ঈর্ষার বশেই সে এতটা ছড়াচ্ছে, এটা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। সিতারার কাছে গেলেই এর একটা সুরাহা হয়। বাইরে বাইরে জেকের আলী যা-ই বলে বেড়াক না কেন, ভেতরের খবর সিতারাকে সে বলতেও পারে। জেকের আলীকে নিয়ে মাতামাতিতে সিতারার তো কমতি কিছু নেই ?

ডুবে যাওয়া মানুষ এক গোছা খড়-কুটাও আঁকড়ে ধরে। 'নূরউদ্দীন লাশ হয়ে গেছে,' জেকের আলীর এ খবর যাচাই করে দেখাটাই এখন রোকসানার বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। এটা মিথ্যা হলে রোকসানার আশা ভরসার ফাঁক কিছু থাকে। সত্যি হলে, তার চারদিক অন্ধকার।

উঠে দাঁড়ালো রোকসানা। বোরকা এঁটে ঘর থেকে সে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো। পাশের বাড়ির ছোট্ট ছেলে মাহমুদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে সে সিতারার খোঁজে রওনা হলো। খবরটা সে যাচাই করে দেখতে চায়।

সিতারাদের বাড়ীর কাছে এসে রোকসানা ফিরদৌস সিতারা বানুকে সামনেই আর বেশ আড়ালেই দেখতে পেলো। এতে করে, মাহমুদ আলীকে একটু ফাঁকে সরিয়ে রেখে রোকসানা ব্যস্তভাবে সিতারার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

কিন্তু এই ছুটে আসা তার মরীচিকার পেছনে ছুটে আসারই সামিল হলো। কারণ, সিতারার মানসিকতা তখন একেবারেই বিপরীত। জিহাদের এ বিপর্যয়ের খবরে সিতারা বানু ছিল খুশীতে ডগমগ। রোকসানার লাল মুখ কালো হয়ে গেছে এবার, এ পুলকেই সে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। বিশেষ করে জেকের আলীকে জব্দ করার উচিত শিক্ষা পেয়েছে তারা, এ আনন্দ সামাল দেয়া তার সাধ্যের ওপারে গিয়েছিল। তাই, রোকসানাকে সামনে আসতে দেখেই সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। রোকসানা তার কাছে আসতেই সৌজন্যের কিছুমাত্র পরোয়া না করে সিতারা বানু টিপ্পনী কেটে বললো—কিরে, তোর সেই বীর বাহাদুর শেষ পর্যন্ত শেয়ালের পেটেই গেল ?

এ প্রশ্নে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও, সিতারার এ হৃদয়হীনতার দিকে নজর দেয়ার অবকাশ রোকসানার ছিল না। সে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কি খবর ভাই ? জিহাদের ব্যাপারে কি সঠিক খবর কিছু জানিস ?

সিতারা বানু কলকণ্ঠে বললো—জানবো না মানে ? আসল যা ঘটনা সব আমি জানি। জেকের আলী ভাইয়ের কাছে সব আমি শুনেছি।

ঃ জেকের আলী সাহেব যা বলে বেড়াচ্ছেন, তাকি সত্যি ?

সিতারা বানু এ প্রশ্নে রুষ্ট হলো। সে রুষ্ট কণ্ঠে বললো—তার মানে ? জেকের আলী ভাইয়ের কথা সত্যি হবে না কেন ? সে কি মিথ্যা বলার লোক ?

ঃ তা কথা হলো—

www.pathagar.com

ঃ তাকে কি মিথ্যা বলতে শুনেছে কেউ কখনো, না একট বর্ণ মিথ্যা ভুলেও সে বলে ? তোরাই কেবল ভিন্ন নজরে দেখিস তাকে।

ঃ না-মানে, আমি বলছিলাম, নূরউদ্দীন সাহেব বেঁচে নেই, লাশ হয়ে গেছেন, জেকের আলী সাহেবের একথাটা কতখানি সঠিক ? উনি তো আর লড়াইয়ের ময়দান থেকে দেখে এসে বলছেন না ?

ঃ তাতে কি হয়েছে ? যা ঘটনা, তা কি না দেখলেই মিথ্যে হয়ে যাবে ?

ঃ ঘটনা! নূরউদ্দীন সাহেব তাহলে—

ঃ সাবাড় হয়ে গেছে। তার হাড় হাড্ডির চিহ্নও শেয়াল কুকুরে রাখেনি।

রোকসানা ফিরদৌস আকুলকণ্ঠে বললো—ঠিক ঠিক বল ভাই ? এ খবরটা কতখানি সত্যি ? জেকের আলী সাহেব এ সম্বন্ধে তোকে কি আর কিছুই বলেননি ? মানে, নূরউদ্দীন সাহেবের খবরটা নিশ্চিতভাবে সত্যি খবর নয়—সবই তাঁর শোনা কথা—এ ধরনের কিছু ?

সিতারা ক্ষেপে গেল। জেকের আলীকে এক কথায় বিশ্বাস এরা করে না দেখে সিতারা বানু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো—কি বলতে চাস তুই ? জেকের আলী ভাই মিথ্যে বলে বেড়াচ্ছে ? তার কথা মিথ্যো, এই বলতে চাস ? দিন দুপুরের মতো জিহাদের এই পরিষ্কার আর জাজ্জিল্যমান ঘটনাটা—

সিতারার ব্যবহারে রোকসানা আহত হলো। কিন্তু গরজ বড় বালাই। এতদসত্ত্বেও সে সবিনয়ে বললো—আমি পুরো ঘটনা জানতে চাচ্ছিনে ভাই! শুধু নূরউদ্দীন সাহেবের খবরটা জানতে চাই। তাঁর খবর কি ? সত্যিই কি তিনি শহীদ হয়ে গেছেন ? বেঁচে থাকলে থাকতেও পারেন, এ রকম কিছু জেকের আলী সাহেব কি একবারও বলেননি ?

রোকসানা ফিরদৌস আকুলীবিকুলী করতে লাগলো। এর জবাবে সিতারা বানু ধিক্কার দিয়ে বললো—আহারে! ঢং আর দেখাবি কত! ঐ যে কেউ কেউ বলে, "বন্ধুর আমার আলগা ফুটানী, বাকসো নাই আছে বন্ধুর কাঠের ছোড়ানী"। এতটার পরও তোর ভাব দেখে বাঁচিনে।

এতে করে রোকসানাও ক্ষুণ্ন হলো। সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—এ তুই কি বলছিস সিতারা ?

ঃ কি আবার বলবো ? বলছি, নূরউদ্দীন তবু যদি ঠুক্‌তো তোকে! তোর দিকে ফিরেও একটু তাকাতো।

ঃ সিতারা!

ঃ "কেউ বা নাচে ধনে জনে, কেউ বা নাচে বোঁচা কানে।"—সেই কথারই হাল করে ছাড়লি। যার মন আছে অন্যখানে বাঁধা, তাকে নিয়ে এই ঢলাঢলি কোন্ শরমে করিস তুই! আমি কি কিছু শুনিনি ?

রোকসানা ফিরদৌস আর সহ্য করতে পারলো না। যে ইরাদা নিয়ে সে এসেছিল তা নস্যাত হয়ে গেল দেখে, উচিত জবাব দিতে সেও আর কুণ্ঠাবোধ করলো না। সেও এবার শক্তকণ্ঠে বললো—জেকের আলী সাহেবকে নিয়ে তুইও তাহলে এত ঢলাঢলি কোন শরমে করিস ? তাকে নিয়ে এতটা মাতামাতি তুই করিস কোন

www.pathagar.com

আক্কেলে ? জেকের আলী সাহেবের মন কি অন্যদিকে নেই ? একাধিক জনের প্রতি কি তিনি আসক্ত নন ? এটা জানতে কি সারা গাঁয়ের বাকী আছে কারো ?

সিতারা বানু দমার পাত্রী নয়। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সে সতেজে জবাব দিলো—আমার কথা আলাদা। অন্যের দিকে মন থাকলেও, জেকের আলী ভাইয়ের মন আমার দিকেও আছে। তোর নূরউদ্দীনের মন কি এতটুকু তোর দিকে আছে যে, তুই এত ফেটে পড়ছিস দরদে ?

ঃ তা না থাকুক। যার মন অন্যদিকে থাকবে, একই সাথে আবার তার মন আমার দিকেও থাকবে— এটা কোন রুচি বা গৌরবের কথা নয়। এমন অবস্থা নিয়ে তোর মতো গর্ব কোন রুচিবানেরা করে না। এক সাথে হাজার ফুলের গন্ধ শুকে বেড়ায় যে, সে কারো গর্বের সম্পদ নয়।

ঃ রোকসানা!

ঃ আমার মন তার দিকে থাকতে পারে, তাকে আমার পছন্দ হতে পারে, কিন্তু সে একই সাথে সবাইকে নিয়ে খেলবে, তার এটা গৌরবের দিক নয়। আমি এতে এক ফোঁটাও গর্ববোধ করিনে বা করতেও তা পারিনে।

ঃ সে তাকত থাকলে তো পারবি ? সেজন্যেও তাকত লাগে। জেকের আলী ভাইয়ের মন আরো দশটা মেয়ের দিকে পড়ে থাকুক না কেন, তাতে কি ঘাবড়ানোর কিছু আছে আমার।

ঃ তাদের তো শাদি করতেও পারেন তিনি ?

ঃ করুক।

ঃ তাহলে তো সতীনের ঘর করতে হবে তোকে ?

ঃ তাতে কি আমি ডরাই ? আসুক না কোন্ বাপের বেটি সতীনগিরি করতে আসবে আমার সাথে, আসুক। তাদের আমি এমন ছ্যাঁকাই দেবো যে, দু'দিনের মধ্যেই বাপ বাপ করতে করতে বাপের বাড়ীতে পালিয়ে যেতে পথ পাবে না সবাই। সতীনের ঘর করা নিয়ে চিন্তে কিসের আমার ?

ঃ তোর যদি কোন চিন্তা না থাকে, আমার চিন্তে থাকবে কেন ? সতীনের ঘর করার জন্যে তুই যদি প্রস্তুত থাকতে পারিস, আমি তা পারিনে ? নসীবে থাকলে, আমিও তাই করবো।

ঃ তুই ?

ঃ জি। জেকের আলী সাহেবের মতো নূরউদ্দীন সাহেবের নজর হাজার জনের দিকে নেই। থাকলে বড়জোর একজনের দিকেই আছে। তুই যদি হাজারটা সতীন সামাল দিতে পারিস উনি বেঁচে থাকলে আমি একটা সতীন সামাল দিতে পারবো না ?

ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ বিকৃত করে সিতারা বানু বললো—আহা! কি আশারে! কুঁজো বলে, এখন থেকে চিৎ হয়ে শুবো আমি।

ঃ সিতারা।

ঃ 'মা ভাত দেয়ইনে, অতিথি বলে আতপ ছাড়া খাইনে'। সতীনের ঘর করার সেই সুযোগটাই পাচ্ছিস তুই কোত্থেকে ? আমার জেকের আলী ভাই যেমন সিতারা বলতে অজ্ঞান, তোর নূরউদ্দীন কি তাই ? নূরউদ্দীন তোকে কোনদিন ঠুক্‌লে তো ?

www.pathagar.com

রোকসানা ফিরদৌস এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো—দ্যাখ, ঠুকাঠুকির প্রশ্নটা বিলকুল আল্লাহ তায়ালার হাতে। নূরউদ্দীন সাহেব আমাকে ঠুক্‌বেন কিনা সে চিন্তা করার আগে জেকের আলীই শেষ পর্যন্ত ঠুক্‌বে কিনা তোকে, সেই চিন্তাই করগে। ঐ হাজার জনের তুফানে নিজেই তুই লাপাত্তা হয়ে যাবি কিনা, সেই ভাবনাই এখন থেকে ভাবতে শুরু কর।

আর কথা না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালো রোকসানা এবং দ্রুত পদে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। মরার উপর খাড়ার ঘা মারার মতো সিতারার এ আচরণে ক্ষোভে দুঃখে সে অবিরাম বিক্ষত হতে লাগলো।

সাবিহা আরজুরও এ দশাই হতো। সোহরাব হোসেন জিন্দা আছেন, না শহীদ হয়ে গেছেন, এই হদিস করার জন্য তাকেও দিউয়ানা হয়ে ছুটোছুটি করতে হতো। কিন্তু এ সময় সে প্রত্যন্ত এক এলাকায় আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকায় এবং সেখানে এ খবর না পৌছায়, এ পেরেশানী থেকে সাবিহা আরজু রেহাই পেয়ে গেল। তার পিতামাতারা ইয়ারপুরে থাকলেও, বিশেষ এক কারণে এ খবরে তারা আদৌ চঞ্চল হলেন না।

এদিকে রোকসানার এই অবস্থা, ওদিকে নূরউদ্দীনের অবস্থাও হলো প্রায় তদ্রূপ। হতাশায় সেও ভেঙে পড়লো। নূরউদ্দীনের ফুফাতো বোনের স্বামী জাইদুর রহমান জাহিদ নূরউদ্দীনের ভগ্নিপতিও বটেন, আবার খানিকটা বন্ধুও বটেন। পাটনার পথে রওনা হওয়ার কালে এ জাহিদ সাহেবকেই নূরউদ্দীন চিঠি লিখে গিয়েছিলো। রোকসানার সাথে তার শাদির পয়গাম পাঠানোর জন্যে এ জাহিদ সাহেবকেই চিঠিতে সে অনুরোধ করে গিয়েছিল।

কার্যোপলক্ষ্যে জাহিদ সাহেব মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। জিহাদ আন্দোলনের এ বিপর্যয়ের খবর এখানে এসেই পেলেন। সেই সাথে, বাংলার কিছু মুজাহিদ পাটনা ও রাজ মহলের পথ হয়ে এদিকেই আসছেন শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং নূরউদ্দীনের খবর করতে মুর্শিদাবাদের কিছুটা উত্তর দিকে এগিয়ে এলেন। ঘটনাচক্রে পথেই তিনি বাংলার কয়েকজন মুজাহিদের সাক্ষাৎ পেলেন। তাদের কাছে জানলেন, নূরউদ্দীন জিন্দা আছে আর সেও এ পথেই ফিরে আসছে। অল্প কিছু এগুলেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

সেই মোতাবেক আর কিছুটা এগিয়েই জাহিদ সাহেব দেখলেন, নূরউদ্দীন ও আর একজন লোক এক খেয়াঘাট পার হয়ে তার পথেই এগিয়ে আসছে। নূরউদ্দীনের সাথের এ লোক সোহরাব হোসেন। এরা এসে সামনা সামনি হতেই নূরউদ্দীনকে দেখে জাহিদ সাহেব আর জাহিদ সাহেবকে দেখে নূরউদ্দীন উল্লাসে চীৎকার দিয়ে উঠলেন। ছুটে এসে তারা কোলাকুলি করার সাথে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। সোহরাব হোসেনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে, জাহিদ সাহেব তার সাথেও কোলাকুলি করলেন।

এরপর জাহিদুর রহমান জাহিদ সাহেবের আগ্রহের প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে জিহাদের কথা বর্ণনা করে নূরউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এবার আপনারা কে কেমন আছেন, তাই বলুন। আপনার বাড়ীর খবর ভালো তো?

www.pathagar.com

জবাবে জাহিদ সাহেব বললেন—মোটামুটি ভালই আছি। আপনি জিহাদে গেছেন শুনে আপনার বহিন তো কেঁদেই সারা। বলে, ও আর বাঁচবে না। বাড়িতেও স্থান হলো না, কোন নিরাপদ আশ্রয়ও পেলো না। আমাদের এখানে এনে রাখলে তো মামুজান গোস্বায় আমার মুখ দেখাই বন্ধ করে দিতেন।

নূরউদ্দীন ঈষৎ হেসে বললো—আচ্ছা। তা তার মামুজানের খবর কি?

ঃ কে, আপনার আব্বাজানের?

ঃ জি-জি। তারা কে কেমন আছেন?

ঃ অল্পদিন আগেই জেনেছি, সকলেই তারা সুস্থ আর সহিসালামতেই আছেন।

ঃ আমার জিহাদে যাওয়ার খবর তো নিশ্চয়ই তারা শুনেছেন। তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

ঃ আপনার একগুয়েমীর জন্যে আপনার আব্বাজান আগের মতোই প্রথমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরে অবশ্য কিছুটা দুঃখ করেই বলেছিলেন, 'যাকগে, ওকে আল্লাহর রাহে খয়রাত করে দিয়েছি, ও যেখানে ইচ্ছে যাক, যা ইচ্ছে করুক, ও নিয়ে আর ভাবিনে'।

আবার মুখে হাসি টেনে নূরউদ্দীন বললো—আলহামদুলিল্লাহ। তা দুলাভাই, জিহাদে যাওয়ার সময় যে খত আপনাকে দিয়েছিলাম, তা কি আপনি পেয়েছিলেন?

জাহিদ সাহেব খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।

ঃ তাতে যে অনুরোধ আপনাকে করেছিলাম—

ঃ সে চেষ্টা আমি যথাযথই করেছি। কিন্তু ফল হয়নি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ইয়ারপুরে যাওয়ার আগেই আমি তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলে দেখেছি। সবাই তারা একবাক্যে আমাকে 'না' করে দিয়েছেন। বলেছেন, যা হবার নয়, অনর্থক সে চেষ্টা করতে আপনি যাবেন না। ও মেয়ে অন্য কোথাও শাদি কবুল করবে না। বহু জায়গা থেকেই শাদির পয়গাম এসেছে, শাদি করতে এসেও বরযাত্রী সহকারে এক বরকে উঠে যেতে হয়েছে, ও মেয়ে শাদি করতে রাজী নয়।

ঃ রাজী নয়?

ঃ না। কোথায় যেন কার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে আছে। ঐ ব্যক্তি ছাড়া ও মেয়ে দ্বিতীয় আর কাউকেই শাদি করবে না জান গেলেও। ওখানে শাদির পয়গাম নিয়ে যাওয়া মানেই বেইজ্জত হতে যাওয়া।

নূরউদ্দীন উদাস কণ্ঠে বললেন—ও আচ্ছা।

জাহিদ সাহেব ফের বললেন—এরপরও আমি ও এলাকার অনেকের সাথেই কথা বলেছি। তাঁরাও ঐ একই কথা বলেছেন। একজন তো গোস্বাভরেই বললেন, 'কেন যে আপনারা সবাই ঐ মেয়ের দিকেই ছুটে আসেন খামাখা, তা বুঝিনে। ও মেয়ে যে গোপনে অন্যকে শাদি করে বসে আছে। কিংবা ঐ রকমই একটা কিছু কুকীর্তি বাধিয়ে রেখেছে—এটা কি এখনও কানে পড়েনি আপনাদের? এ নিয়ে তামাম এলাকায় ঢি ঢি পড়ে আছে, আর আপনারা তার কোন খোঁজই রাখেন না?

www.pathagar.com

নূরউদ্দীন নিঃশ্বাস চেপে বললো— হুঁউ।

ঃ কি আর করবো ? এসব শোনার পর বাধ্য হয়েই চুপ মেরে গেছি।

এরপর চুপচাপ। নূরউদ্দীন আর কোন কথাই বললো না। তার মুখমণ্ডল আস্তে আস্তে কালো হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে জাহিদ সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন —আরে আরে। ও নিয়ে এত চিন্তা করছেন কেন ? মেয়ের কি অভাব আছে দেশে ? ওটা ছাড়া আর যাকেই আপনার পছন্দ হবে বলবেন, যেভাবেই হোক আল্লাহ চাহে তো কাজ আমি হাসিল করে দেবো। এবার বলুন, কোনদিকে যাবেন এখন ?

স্বপ্নোত্থিতের মতো নূরউদ্দীন বললো— এ্যাঁ ?

জাহিদ সাহেব বললেন— ইয়ারপুরে যাবেন, না বাড়ীতে ফিরে যাবেন ?

নূরউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বললো— না-না, ইয়ারপুরেই যেতে হবে আগে। ওখানকার দলের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। সব কথা তাদের আগে বুঝিয়ে না বলে আমি কোথাও যেতে পারিনে।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ আপনি বাড়িতে গিয়ে আমি জিন্দা আছি, এ খবর সবাইকে দিন। সময় সুযোগ মতো অবশ্যই আমি আপনাদের ওদিকে যাবো।

জাইদুর রহমান জাহিদ সাহেব অগত্যা পথ থেকেই বিদায় নিলেন। জাহিদ সাহেব চলে যাওয়ার পর নূরউদ্দীন সোহরাব হোসেনকে দুঃখ করে বললো— এবার কি বুঝলেন ইয়ার ? আপনারা তো খোয়াব দেখেই খুন। আমার জন্যে রোকসানা হাপিত্তেস করে আছে, আমার চিন্তায় ঘুম আসছে না চোখে তার— এমনই কত কথা।

সোহরাব হোসেন এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার সে বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো— কি তাজ্জব! আমি যে কোন মাথামুণ্ডুই করতে পারছিনে এর। সাহিবা আরজুর পত্র পড়লে মনে হয় আপনাকে সে সত্যি সত্যিই ভালবাসে। অথচ বাস্তবের দিকে তাকালে তখনই আবার মনে হয়, সব ভুল। ও মেয়ের আসল লোক অন্যজন।

ঃ তাহলে ?

ঃ হয়তো বা ঐ জাহিদ সাহেবের কথাই ঠিক। ঐ অন্যজনের সাথে গোপনে তার শাদিও হয়ে গেছে। হয়তো সেজন অবাঞ্ছিত আর অগ্রাহ্য লোক। খাঁ সাহেবের নিতান্তই বিরাগভাজন কেউ। তাই খাঁ সাহেবের ভয়ে রোকসানা মুখ খুলে তা প্রকাশ করতে পারছে না।

ঃ তাই হয়তো হবে। যাক গে, খামাখা ঐ খোয়াব আর দেখতে চাইনে।

ঃ না চাইলেই হলো ? অন্তত সেই অন্যজন কোন্‌জন তার হদিস এবার না করে ছাড়ছিনে। চলুন, এবার গিয়ে এ সন্ধানই করতে হবে জোরদার ভাবে। মন রাখবে অন্যখানে আবার আপনাকে নিয়েও খেলবে, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

ঃ থাক দোস্ত। ওসব অপ্রীতিকর কাজে নাই বা গেলাম।

সোহরাব হোসেন সাহস দিয়ে বললো— আরে আপনাকে করতে হবে না কিছুই। যা করার সাবিহার সাহায্যে আমিও করবো। না করে কিছুতেই এবার ছাড়বো না, দেখবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা সবসময়ই হয় না। যা করতে চায়, তা করতে পারে না। সেই সন্ধান করার মওকা সোহরাব হোসেন পেলো না। ইয়ারপুরে না পৌঁছতেই আকস্মিক এক ধাক্কায় তার সব চিন্তা উলট পালট হয়ে গেল। সে শুনতে পেলো, মাস ছয়েক আগে তার আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় সোহরাব হোসেনকে এক নজর দেখার জন্যে তিনি নিদারুণ হা-হুতাশ করে গেছেন। সোহরাব হোসেন ফিরে এলে সে যেন মায়ের কবর জিয়ারত করে কিছু দোআ কালাম পাঠ করে— একথা সবাইকে বিশেষভাবে বলে গেছেন।

খবরটা শুনামাত্র সোহরাব হোসেন আর্তনাদ করে উঠলো। নূরউদ্দীনের নিকট থেকে দু' এক কথায় বিদায় নিয়েই সে উন্মাদের মতো নিজের বাড়ীর পথে ছুটে গেল। ইয়ারপুরের পথ ধরে নূরউদ্দীন একা একাই হাঁটতে লাগলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই রোকসানার চেহারা পোড়া কাঠের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। সদ্য বিধবার মতো তার জিন্দেগীর স্রোতধারা শুথ হয়ে গেল। থেমে গেল বেগ। জীবনধারণের উৎসাহ তার ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। আগে ছিল শংকাকুল ও চিন্তাগ্রস্ত। এখন সে নির্লিপ্ত। কোন কিছুতেই মন নেই। কামনা বাসনার কিছু নেই। জীবনের প্রতি দরদ নেই। সর্বক্ষণ সে আওয়ারা। নিভৃতে নির্জনে সরে থাকে সব-সময়। ঘর ছেড়ে পারতপক্ষে বাইরে আসতে চায় না।

রোকসানার আচরণে তার ভাই বাহার খাঁ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিলেন দীর্ঘদিন। সেভাব আর তার এখন নেই। দিনে দিনে বদলে গেছেন তিনিও। এত শাসন সয়েও পরাস্ত যে হয় না, তাকে নিয়ে কি আর করবেন তিনি ? রেগে রেগে রাগ তার ফুরিয়ে গেছে। বহিনের হালত দেখে এখন তিনি নিঃশ্বাস ফেলেন। ইদানিং আবার নিঃশ্বাসও শেষ হয়ে গেছে। বহিনের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসই পান না। দূর দিয়ে হাঁটেন।

ভাবী রাবিয়ারও তিরস্কার তর্জন আর নেই। ভাই তার রাগ করবেন—চাই কি তুলে আছাড় মারবেন, এসব বলা শেষ হয়েছে। দীলে এখন পয়দা হয়েছে দরদ। রোকসানার হালত দেখে সে এখন হামেশাই খেদ করে বলে, "হায়রে অভাগী! এমন মজাই মজেছিলি!"

এমনই অবস্থার মধ্যে একদিন অকস্মাৎ বাহার খাঁর বাহির আঙ্গিনা উল্লাসে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। "নূরউদ্দীন-নূরউদ্দীন" বলে তুমুল শোরগোল উঠলো সেখানে। রোকসানা ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। এ শব্দ কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো। খোয়াব দেখলো কিনা, আকস্মিকভাবে উঠে বসে সে এই সন্দেহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। কিন্তু নূরউদ্দীনের নামটা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হতে থাকায়, তার সন্দেহের ঘোর কেটে গেল। উন্মাদিনীর মতো লাফিয়ে উঠে সে বাহির আঙ্গিনার দিকে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলো। কোথায় রইলো নেকাব বোরকা আর কাকে বলে সাবধান সর্তকতা এসবের কোন খেয়াল রোকসানার রইলো না। গায়ে মাথায় জড়ানোর নামে ঘাড়ের ওড়না পেঁচে পেঁচে জামায় ঢাকা বুক-পিটটাই কোনমতে

www.pathagar.com

ঢাকলো, ওড়নার আঁচল মাথার নাগাল পেলো না। আষাঢ়ের মেঘের মতো তার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম ও মুখমণ্ডল—তামামই অনাবৃত রইলো।

বাহির আঙ্গিনায় প্রচুর জনসমাগম দেখে দেউটির মুখে না গিয়ে রোকসানা দৌড়ের উপর এসে বৈঠকখানায় ঢুকলো। তার গতি ছিল দুরন্ত। দৌড়ের বেগ সামাল দিতে দিতেই সে একদম বৈঠকখানার বাইরের দিকের খোলা দরজায় চলে এলো। ঠিক ঐ দরজার সামনেই বারান্দা ঘেঁষে বাহির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছিল নূরউদ্দীন। দীর্ঘ পথের পর এ বৈঠকখানাই নূরউদ্দীনের শেষ গন্তব্য ছিল। রোকসানা চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকাতেই তার চোখ পড়লো নূরউদ্দীনের উপর। নূরউদ্দীনকে সশরীরে দেখতে পাওয়া মাত্রই বিশ্বের তামাম আলো রোকসানার মুখে এসে ঠিকরে পড়লো। তামাম উল্লাস এসে তার মুখমণ্ডলে লুটোপুটি খেতে লাগলো। পরম স্বস্তি ও তৃপ্তিতে 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে বুক উজাড় করে দম ছাড়লো রোকসানা। হাসি মুখে আওয়াজ দিলো—আল-হামদুলিল্লাহ।

ঐ দরজা সোজা এ সময় একমাত্র নূরউদ্দীন ছাড়া আর কেউ ছিল না। কে যেন ছুটে এলো মনে হওয়ায় আর একটা তৃপ্তির আওয়াজ কানে যাওয়ায়, চকিতে নূরউদ্দীন সেই দরজার দিকে তাকালো। তাকিয়েই সেও রোকসানার হাস্যোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত মুখমণ্ডল সরাসরি দেখতে পেলো। দেখতে পেলো বিরল এক সুষমা। এক অফুরন্ত খুশীর প্রস্রবণ। অনুপম তৃপ্তির সমারোহ। একদম কাছাকাছি। দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব ঐ একফালি বারান্দাটুকু মাত্র।

নূরউদ্দীন যারপর নেই বিস্মিত হলো। থমকে গেল সে। অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো, রোকসানার এই এত খুশীর কারণ কি এক কল্পনাতীত ইস্ট লাভের মতো রোকসানার এই অপরিসীম তৃপ্তিবোধ কি জন্যে? কার জন্যে?

আবার সে চোখ তুলে রোকসানার দিকে তাকালো। দেখলো উন্মুক্ত দরজার দুই পাল্লা দুই হাতে ধরে এবং সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে ঐ একইভাবে চেয়ে আছে রোকসানা। শংকাহীন-সংকোচহীন। যেন বন্ধন ও অনুশাসনের তামাম বালাই সে জয় করে নিয়েছে। সে এখন স্বাধীন ও পরোয়াহীন। সেই সাথে নূরউদ্দীন আরো খেয়াল করে দেখলো, দেহের অবস্থা রোকসানার বর্ণনার অতীত। মৃত্যুপথ যাত্রী এক বিশীর্ণ রুগী। হাড়-চামড়া আছে। এই দু'য়ের মাঝে আর কোন বস্তু নেই। অথচ সেই মুখে এত আলোর উৎস কি? এত উল্লাস ও বিহ্বলতার হেতু কি? তার জন্যই কি? দীর্ঘদিন যাবত তারই পথ চেয়ে থাকার কোন প্রতিক্রিয়া কি? কিন্তু তাই বা হয় কি করে? তার কল্পনাটাই সত্য আর নির্মম বাস্তবটা বিলকুল মিথ্যা?

ছেদ পড়লো নূরউদ্দীনের চিন্তায়। এক পলক সময়ের মধ্যে সে বিশ্বজোড়া চিন্তার জাল বিস্তার করে দিলেও, তখনই আবার সে জাল তাকে একটানে গুটিয়ে নিতে হলো। ক্রমবর্ধমান জনতা হাজার প্রশ্ন নিয়ে তার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগলো। রোকসানা ও তার মাঝে মুহূর্তকালের জন্যে যে নির্জনতা বিরাজমান ছিল তা আবার তখনই জনাকীর্ণ হয়ে গেল। দু'য়ের মধ্যে ফাঁকটুকু পূরণ হয়ে গেল। দেয়াল উঠলো উভয়ের দৃষ্টি পথের মাঝখানে। অনেকেই একসাথে প্রশ্ন করতে লাগলেন—কি হলো

www.pathagar.com

নূরউদ্দীন সাহেব ? থেমে গেলেন কেন? বলুন, হঠাৎ আপনি কখন এখানে, মানে কিভাবে কি করে—

প্রশ্ন মুখর কয়েকজন তার আরো নিকটবর্তী হতেই সম্বিতে ফিরে এলো নূরউদ্দীন। সকলের অলক্ষ্যে সে রোকসানার দিক থেকে ক্ষিপ্রবেগে নজর ফিরিয়ে নিয়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো।

সম্বিতে ফিরে এলো রোকসানাও। তার দৃষ্টিপথে অন্য লোকদের আসতে দেখেই সে হাতে ধরা দরজার পাল্লা তখনই ভিড়িয়ে দিলো এবং আড়ালে দাঁড়িয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো।

নূরউদ্দীন মরে গেছে, বেঁচে নেই—এই ছিল এ এলাকার সকলের জানা। সেই নূরউদ্দীন হঠাৎ এসে সশরীরে হাজির হওয়ায় জনগণের কৌতূহলের অবধি ছিল না। তাই শুরু হলো সকলের এলোপাহাড়ি প্রশ্ন। নূরউদ্দীনও প্রশ্নগুলোর যথাসাধ্য জবাব দিতে থাকলো।

প্রথম দিকে বাহার খাঁ সাহেব অপরিসীম বিস্ময়ে এলোমেলো কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতেই তিনি ফের উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলে উঠলেন—ওহো, সেকি! তুমি একা কেন ? সোহরাব হোসেন ? সোহরাব হোসেনকে দেখছিনে কেন ? সে কোথায় ? সে জিন্দা আছে, নাকি—

প্রশ্নের মাঝেই নূরউদ্দীন তড়িঘড়ি জবাব দিলো—জি-জি, আল্লাহর রহমে তিনিও জিন্দা আছেন। বাংলার অন্যান্যদের মতো তিনিও ফিরে এসেছেন—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাহার খাঁ সাহেব বললেন—আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে সে কোথায় ?

ঃ রাস্তা থেকেই বাড়ীর দিকে ছুটে গেছেন। তার আম্মাজানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে—

ঃ সে খবর কি সে ইতিমধ্যেই পেয়েছে ?

ঃ জি হ্যাঁ। পথেই তার এক প্রতিবেশী এ খবর তাকে দিলেন।

ঃ আহা বেচারা! দুঃখের উপর দুঃখ।

বাহার খাঁ দম নিলেন। এরপর অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তা তুমি একদম একা যে ? অন্যান্য মুজাহিদেরা, মানে যারা জিন্দা আছেন—

ঃ তারা অধিকাংশেরাই বিহারের দলের সাথে আসছেন। মৌঃ রকিবুল্লাহ সাহেবও বাংলার আর এক দল নিয়ে আমাদের পেছনেই পাটনা থেকে রওনা হয়ে বাংলায় পৌঁছেছেন। বরকুতুল্লাহ মিয়াও তাদের সাথে আছেন। আমাদের সাথে যে কয়জন মুজাহিদ ছিলেন, রাজমহল পেরিয়ে এসেই তারা বিভিন্নপথে যে যার বাড়ীর দিকে ছুটেছেন। মুর্শিদাবাদে না পৌঁছতেই আমি আর সোহরাব হোসেন সাহেব ছাঁটাই হয়ে গেছি।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি। ওদিকে আবার এই ইয়ারপুরের কাছাকাছি এসেই সোহরাব হোসেন সাহেবও দুঃসংবাদ পেয়ে বাড়ির দিকে ছুটলেন। এতে করে আমি একদম একা পড়ে গেলাম।

www.pathagar.com

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ ক্ষোভে-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে এই সুদূর পথ আমরা যে কে কোন্ ভাবে আর কোন দলের সাথে অতিক্রম করে এসেছি, দিশে রাখা অনেকেরই সম্ভব হয়নি। দল হিসেবে কোন দলেরই একক অস্তিত্ব কিছু না থাকায়, এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে জিন্দা যারা আছেন তারা যে সবাই সহিসালামতে বিহারতক পৌঁছেছেন, এ খবর জানি।

এরপর জিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানাজন নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন আর নূরউদ্দীন ধৈর্যের সাথে সেসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে লাগলো। খবর পেয়ে নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবও ছুটে এসেছিলেন। এ প্রশ্নোত্তরের এক পর্যায়ে তিনি কিছুটা বিব্রতকণ্ঠে সবাইকে বললেন—ঢের হয়েছে। আজকের মতো এই থাক। বহুদূর থেকে বেচারা তেতে পুড়ে এসেছে। এখন বিশ্রাম দরকার। পরে আপনারা যার যা জানার আছে জেনে নেবেন।

বাহার খাঁ হুঁশে এসে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ঠিক-ঠিক। মেহেরবানী করে আপনারা এখন আসুন। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

অত্যন্ত সঙ্গত কথা। সকলেই ক্ষান্ত হলেন। ধীরে ধীরে সকলেই বিদায় নিলেন। শাহ সাহেব ইতস্তত করে বাহার খাঁকে বললেন—নূরুউদ্দীন কয়েকদিন তোমার এখানে থাকলে বেশী অসুবিধে হবে কি? মানে, আমার বিবি সাহেবা খুবই অসুস্থ। বাড়ীর অন্যান্যেরাও এক্ষণে কেউ নেই। নূরউদ্দীনের একটু তদবির নেয়া দরকার। দু'তিন দিনের মধ্যেই আমার বাড়ীর সবাই ফিরে আসবে আর তখন কোন অসুবিধে থাকবে না। অবশ্য তোমার যদি খুবই অসুবিধে হয়—

বাহার খাঁ কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারলেন না। এরপর বুঝতে পেরেই তিনি চমকে উঠে বললেন—আরে বলেন কি—বলেন কি? অসুবিধে হবে কেন? নূরউদ্দীন এখানেই থাকুক এই আমি চাচ্ছি। আমিই এই এযাজত আপনার কাছে চাইবো চাইবো করছিলাম। একটা দলের দায়িত্ব তার উপর ছিল। এ নিয়ে কোন কথাই এখনও হয়নি। অনেক কথা অনেক কাজ তাকে নিয়ে আছে আমার এখন। বেশ কিছুদিন তার এখানে থাকা খুবই প্রয়োজন।

এখানেই, অর্থাৎ বাহার খাঁ সাহেবের বাড়ীতেই থেকে গেল নূরউদ্দীন। প্রাসঙ্গিক ঝুট ঝামেলা মিটিয়ে সে রাতে যখন নূরউদ্দীন নিরিবিলিতে শয্যা গ্রহণ করলো তখনই আবার ঐ একই চিন্তা এসে ঝাপটে ধরলো তাকে। অন্তরে তার পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জাগতে লাগলো—রোকসানার এই উৎফুল্লতার অর্থ কি? তাকে দেখে, না কি ঐ জনতার মধ্যে তার সেই গোপন জনকে হাজির দেখে? কিন্তু নজরটা তো রোকসানার তার উপরই স্থির ছিল সর্বক্ষণ? একবিন্দুও এদিক ওদিক নড়েনি? তাহলে?

এ প্রশ্ন দিলে নিয়েই রাত পোহালো নূরউদ্দীনের। সমাধান কিছু পেলো না। তবে সমাধান নয়, সান্ত্বনার একটা অস্পষ্ট সূত্র পেলো পরের দিন সকালে। বাহার খাঁর বৈঠকখানাতেই নূরউদ্দীনের থাকার স্থান হয়েছিল। সূর্যোদয়ের খানিকপরে বৈঠকখানা থেকেই নূরউদ্দীন অন্দরের হাওয়া বাতাস অল্প অল্প পেতে লাগলো। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু

www.pathagar.com

কথপোকথনও তার কানে এসে পড়তে লাগলো। তাতে করে তার মনে হলো, রোকসানা আজই খুব খুশীর মধ্যেই আছে। আনন্দ মুখরভাবেই সে চলা ফেরা করছে। মনে কোন দুঃখ নেই।

এ নিয়ে যা কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, তা দূর করলো পাশের বাড়ীর ঐ ছোট্ট ছেলে মাহমুদ আলী। নাস্তার সময় চাকর চাকরানীর সাথে সে বাটিটা বর্তনটা এনে নূরউদ্দীনের নাস্তার আনযাম দিচ্ছিলো। নাস্তা শেষে নূরউদ্দীন মাহমুদ আলীকে কাছে ডেকে নিয়ে গল্প জমিয়ে তুলতে লাগলো।

এই সুযোগটা মাহমুদ আলীই করে দিলো। নূরউদ্দীন যুদ্ধে গেছে, যুদ্ধে গিয়ে মরে গেছে—একথাই মাহমুদ আলী পুনঃ পুনঃ শুনেছিল। নূরউদ্দীন ফিরে আসায় তারও কৌতুহলের অবধি ছিল না। মরে গেল তো ফিরে এলো কি করে—এ প্রশ্ন বাড়ীতে সে করায় বাড়ীর সবাই তাকে বুঝিয়েছে, এটা তাদের শোনার ভুল। নূরউদ্দীন মরেনি, মরেছে দুশমনেরা। নূরউদ্দীন লড়াই করে অনেক দুশমন মেরেছে। সে একজন মস্তবড় বীর।

ছেলে মানুষের মন। রূপকথায় বীরের গল্প অনেক সে শুনেছে। স্বাভাবিকভাবেই এ বাস্তব বীর দেখার তার প্রবল আগ্রহ হলো। সেই ইরাদায় এসে বাটি বর্তন এনে দিয়ে নূরউদ্দীনের আশেপাশে সে ঘুর ঘুর করতে লাগলো।

ছেলেটাকে তার প্রতি আকৃষ্ট দেখে নূরউদ্দীনও ছেলেটার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো। কাছে ডেকে বসিয়ে আর সাহস-উৎসাহ দিয়ে নূরউদ্দীন তার সাথে গল্প শুরু করলো। ছেলেটাও এতে করে উৎসাহী হয়ে উঠলো এবং গল্প করার নামে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো। নূরউদ্দীন কয়টা দুশমন মেরেছে, কয়টা তলোয়ার ভেঙ্গেছে, ঘোড়াটা তার কতবড় ছিল, লাফ দিয়ে কত উপরে উঠতো, এক লাফে কত দূরে যেতো—এমনই সব প্রশ্ন।

পছন্দমতো উত্তর দিয়ে নূরউদ্দীন ছেলেটার সাথে খাতির জমিয়ে নিলো এবং এরপর সে নিজে ছেলেটাকে প্রশ্ন করা শুরু করলো। শুরুতে সে বললো—আচ্ছা, তোমার নাম মাহমুদ আলী আর ঐ পাশের বাড়ী তোমাদের বাড়ী, এইতো?

মাহমুদ আলী হৃষ্টচিত্তে জবাব দিলো—জি জি।

ঃ তুমি এ বাড়ীতে কখন এলে?

ঃ ঐ যে রোকসানা আপারা যখন আপনার নাস্তাপানি তৈয়ার করে নিলেন, তখন।

নূরউদ্দীন খেই পেলো। প্রশ্ন করলো—রোকসানা আপারা মানে? তোমার রোকসানা আপাও নাস্তাপানি তৈয়ার করলেন?

ঃ করলেন তো। আপা, ভাবী, পরীর মা, মওলা চাচা—সবাই করলেন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ রোকসানা আপাই তো ঐ সব বাটি বর্তন আমার হাতে দিলেন।

ঃ রোকসানা আপাই দিলেন?

www.pathagar.com

ঃ জি। পরীর মা আর মওলা চাচা সবগুলো তো এক সাথে নিয়ে আসতে পারলো না? তাই আপা কিছু নিয়ে এলেন, আমার হাতেও কিছু দিলেন।

ঃ তোমার আপাও নিয়ে এলেন?

ঃ আরে নিয়ে এলেন মানে কি? ঐ দুয়ারের ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আপাই তো মওলা চাচাকে সবকিছু বুঝিয়ে-বুঝিয়ে দিলেন।

বৈঠকখানার অন্দরমুখী দুয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো মাহমুদ আলী। নূরউদ্দীন উজ্জীবিত হয়ে উঠলো এবং ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলো—অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন?

ঃ অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ। আপনার নাস্তা করা অর্ধেকটা হয়ে গেল তখনও আপা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ঃ বলো কি! তা তোমার আপার তো খুব অসুখ হয়েছিল, তাই না?

মাহমুদ আলী চোখ মুখ ফুটিয়ে তুলে বললো—অসুখ বলে অসুখ? একেবারে মরো মরো অবস্থা। সবাই বললেন—ও আর বেশী দিন বাঁচবে না।

ঃ তাজ্জব! কতদিন আগে সে অসুখটা তার হয়েছিল?

ঃ ঐ যে যেদিন আপনার মরার খবর এলো মানে জেকের আলী মিয়া যেদিন বললো, আপনাকে শেয়াল শকুনে খেয়ে নিয়েছে, সেইদিন থেকে।

ঃ সেইদিন থেকে?

ঃ জি হ্যাঁ। ঐ দিনই আবার রোকসানা আপার ভাইজান এসে যখন বললেন, ঘটনা সত্যি, তখন ঘরে ছুটে এসে বিছানার উপর পড়ে আপার সেকি কান্নাকাটি। সব আমি দেখেছি। অসুখটা মনে হয় ঐ থেকেই হয়েছে। অতবেশী কান্নাকাটি করলে অসুখ-বিসুখ তো হবেই।

ঃ বলো কি?

ঃ আপনার মরার খবর শুনে সকলেরই মন খারাপ হলো। কারো কারো চোখে পানিও এলো। কিন্তু এতবেশী কান্নাকাটি কেউ করেনি। আর সেজন্যই অন্য কারো অসুখ-বিসুখ হয়নি।

ঃ তোমার আপাকে কান্নাকাটি করতে তুমি নিজে দেখেছো?

ঃ নিজেই দেখেছি। ভাইয়ের কাছে সত্যি খবর শুনে আপা আমার সামনে দিয়েই দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলেন যে। দরজার কাছে এসে সবই আমি দেখেছি।

নূরউদ্দীন হতবাক হয়ে গেল। ভাবতে লাগলো, এ কি বিচিত্র ব্যাপার। মাহমুদ আলী ছেলে মানুষ। বানিয়ে বলার প্রশ্নই তার উঠে না। এর উপর তার মৃত্যুর খবর যে জেকের আলী রটিয়েছিল, এখানে এসেই নূরউদ্দীন তা শুনেছে। সবই মিলে যাচ্ছে। মিল নেই কেবল এক জায়গায়। রোকসানার এই আচরণ আর তার অন্তর্নিহিত ইরাদার মধ্যে। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর নূরউদ্দীন আবার প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, তোমার আপাতো খুবই অসুস্থ ছিলেন। উনি আবার নাস্তাপানি বয়ে আনলেন কি করে? অসুখটা তাঁর ভাল হলো কবে থেকে?

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মাহমুদ আলী বললো—এইটেই তো বুঝে উঠতে পারছিনে। কাল দুপুরেও আপা ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলেন। একই রকম বিমারী—মানে

www.pathagar.com

ঐ একই রকম মরো মরো অবস্থা। কিন্তু বিকেল থেকেই, মানে যখন আপনি এলেন, সেই সময় থেকেই কি করে যে উনি ভাল হয়ে গেলেন, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনি এসেছেন শুনে, আমি ছুটে এসে দেখি, আপার মুখে হাসি। অনেকদিন আপার মুখে একটুও হাসি দেখিনি। কেবল কাল থেকেই দেখছি।

ঃ সত্যি বলছো ?

ঃ মিথ্যা বলবো কেন ? যান না, বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখুন, এখন আপার কত আনন্দ। কত হাসি খুশী ভাব। শরীর সারেনি, ভাবীও নিষেধ করছেন, তবু আপা জোর করেই খানাপিনার যোগান দিতে লেগে যাচ্ছেন। ঘরে গিয়ে আর শুয়ে থাকতে পারছেন না।

মোহাবিষ্টের মতো নূরউদ্দীন আবার নীরব হয়ে গেল। মাহমুদ আলীর দিকে মোটেই আর নজর দিতে পারলো না। দেখে শুনে আর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে মাহমুদ আলীও ধীরে ধীরে উঠে গেল।

এই আজব রহস্য নূরউদ্দীনকে কয়েকদিন আচ্ছন্ন করে রাখলো। রোকসানা যে তার প্রতি দরদী এটা আর প্রচ্ছন্ন কিছু নয়। কিন্তু রোকসানার মন আছে অন্যখানে বাঁধা, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এর সাক্ষী ও প্রবক্তা আছে অনেক। যুক্তিও আছে অকাট্য। নূরউদ্দীন শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, যে যতই আর যেভাবেই সন্ধান করুক না কেন, রোকসানা মুখ না খুললে, এ জট খোলার নয়। এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে রোকসানার সাথেই কথা হওয়া দরকার আর সে নিজেই সে চেষ্টাটা করে একবার দেখতে পারে। নূরউদ্দীন অতপর সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

অনুকূল স্রোতে নাও বাইতে গেলে সবসময় বৈঠা টানতে হয় না। হাল ধরে থাকলেও, স্রোতের টানেই সামনের দিকে এগিয়ে যায় নৌকা। সুযোগের জন্যে নূরউদ্দীনকে অধিক পেরেশান হতে হলো না। সুযোগটা চলে এলো আপছে আপ। রোকসানাই তার দিকে ঝুঁকে পড়লো দিনে দিনে।

রোকসানার ভাবীই এই ঝুঁকে পড়ার সহায় হলো অনেকখানি। ঠেলে না দিলেও, রোকসানার ভাবী এতে বাধাও দিলো না আর দেখেও দেখলো না। তার ভাবী রাবিয়া বেগমের কথা হলো, ঝুঁকে পড়ছে পড়ুক। অভাগীটা যখন নূরউদ্দীন ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, দু'টো কথা বলুক নূরউদ্দীনের সাথে। কথা বললেই মোহটা কেটে যাবে রোকসানার। নূরউদ্দীন তো আর তার মতো পাগল হয়নি তাকে নিয়ে ? নূরউদ্দীনের মন আছে অন্যখানে। কথা বললেই এই মিথ্যার ঘোর কেটে যাবে হতভাগীর। বাস্তবটা এরপর মেনে নিতে শিখবে।

ঝুঁকে পড়লো রোকসানা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় রোকসানা বার বার নূরউদ্দীনের কাছাকাছি হতে লাগলো। বাড়িতে কোন ছেলে পুলে নেই। স্থায়ী চাকর মওলা বকশ বয়স্ক মানুষ। অভিজ্ঞ কিষাণ। হাল লাঙ্গলের তদারকীটা মোটামুটি তাকেই করতে হয়

www.pathagar.com

আর এতে করে মাঠে ক্ষেতেই তার সময় কাটে অধিক। কাজের মেয়ে পরীর মা আটকে থাকে পাকঘরে। ফলে, নূরউদ্দীনের অজুর পানি, খাওয়ার পানি, নাস্তার আনযাম, এটা ওটা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রোকসানাকেই অনেক সময় এগিয়ে দিতে হয়। বৈঠকখানার অন্দরমুখী দরজার কাছে বয়ে আনতে হয়। সবসময় আবার বয়ে আনলেই হয় না। বয়ে আনা দ্রব্যাদির দিকে নূরউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে রোকসানাকে গলা ঝাড়তে হয়, মৃদুকণ্ঠে দু' একটা কথাও বলতে হয়। রোকসানা রেখে যায়, নূরউদ্দীন নিয়ে যায়। কোন কোন সময় দ্রব্যাদির দিকে নূরউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ হলো কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে রোকসানা। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। দ্রব্যাদি নিতে এসে নূরউদ্দীন তা বুঝতে পারে।

কয়েকদিন কেটে যায় এভাবে। একদিন বাইরে থেকে এসে নূরউদ্দীন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দেখে বৈঠকখানায় রোকসানা একা। ঘরের মেঝে ঝাড় দিচ্ছে রোকসানা। চমকে উঠে বেরিয়ে যায় নূরউদ্দীন। শরম পেয়ে বেরিয়ে আসে রোকসানাও।

অন্য একদিন অমনিভাবে ঘরে ঢুকে দেখে, নূরউদ্দীনের বিছানাপত্র ঠিক করছে রোকসানা। "সোবহান আল্লাহ" বলে হাসি মুখে বেরিয়ে যায় নূরউদ্দীন। ফিক করে হেসে উঠে দৌড়ে পালায় রোকসানা।

এরপর সময়ে-সুযোগে আর প্রয়োজনে-প্রসঙ্গে দরজার এপার ওপার থেকে দু'চারটে কথা হয় দু'জনের মধ্যে। সংযত প্রশ্নের আর সংযত জবাবের আদান প্রদান চলতে থাকে।

শেষ অবধি একে অন্যের কাছে বেশ সহজ হয়ে যায়। আব্রু আড়াল বজায় রেখে দু'য়ের মধ্যে এখন গল্প চলে মাঝে মধ্যেই। পাঁচমিশালী গল্প। জিহাদের গল্প। কোন কোনদিন অনেক সময় ধরেই গল্প চলে তাদের। এমনই এক গল্পের মাঝখানে রোকসানা একদিন নূরউদ্দীনকে কটাক্ষ্য করে বললো—তা মুজাহিদ সাহেব, এভাবে আর ভেসে বেড়াবেন কতদিন? দেখেশুনে ঘর সংসার পেতে বসুন। অসুখে-অদিনে নিজের লোক ছাড়া তো অন্য কেউ হরওয়াক্ত আর একান্তভাবে আপনার খেদমত করতে পারবে না?

এই প্রসঙ্গের অপেক্ষাই এতদিন ধরে করে আসছে নূরউদ্দীন। সুযোগ পেয়ে সে মৃদু খেদের সাথে বললো—তা কি আর বুঝিনে? কিন্তু নসীব বড়ই মন্দ। সে মওকা আমার নেই।

ঃ কেন, নেই কেন?

ঃ এমন লোক পাবো কোথায়, বলুন? আমার মতো বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছন্নছাড়া লোকের সাথে সংসার পাততে রাজী হবে কে?

রোকসানা সবিস্ময়ে বললো—সেকি! আপনার নাকি খুবই পছন্দ করা কোন্ এক মেয়ে আছে? তার জন্যেই আপনি নাকি বাড়ি ছাড়া হয়েছেন?

ঃ বলেন কি! আপনি তা শুনেছেন?

ঃ কথাটা কি ঠিক?

www.pathagar.com

ঃ জি, ঠিক।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে আর কি? আমার সেই পছন্দ করা জনতো আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী নয়। তার মন আছে অন্যখানে। ঘর বাঁধলে তাকে নিয়েই বাঁধবে।

রোকসানা একথায় যারপরনেই তাজ্জব হলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সেকি!

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে রোকসানা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। তা দেখে নূরউদ্দীন বললো—কি হলো, চুপ হয়ে গেলেন যে?

অন্য মনস্কভাবে রোকসানা বললো— এমন অদ্ভুত মিল! এ কি করে হলো?

ঃ মিল! কিসের মিল?

রোকসানা সজাগ হয়ে বললো—না, কিছু না।

নূরউদ্দীন বললো—কিছু নয়?

ঃ সে অন্য কথা। আমি যাই—

নূরউদ্দীন ইতস্তত করে বললো—কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

ঃ কি প্রশ্ন?

ঃ যদি এযাজত দেন, মানে সাহস দেন, তাহলে বলি।

ঃ বলুন।

ঃ আপনি নাকি তামাম শাদিই নাকোচক করে দিচ্ছেন। এর কারণ কি? আপনারও কি কোন পছন্দের জন আছে?

রোকসানা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলো না। সে চুপ হয়ে রইলো। নূরউদ্দীন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—এতে আপনি নারাজ হবেন, এ ভয়ই করছিলাম আমি।

রোকসানাও নিঃশ্বাস ফেলে বললো—না, নারাজ নয়। আপনার ধারণা ঠিক। তা না থাকলে এত গঞ্জনা সইতে যাবো কেন আমি? কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি?

ঃ ঐ যে বললাম মিল? এখানেই আপনার সাথে আমার একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পাচ্ছি। আমারও যাকে পছন্দ, তার মন আছে অন্য মেয়ের দিকে, আমার দিকে নেই। নসীবের কি পরিহাস!

রোকসানা ক্লীষ্ট হাসি হাসলো। নূরউদ্দীন বিপুল বিস্ময়ে বললো—সেকি-সেকি! সত্যিই তো বড় অদ্ভুত মিল। তা কে সে আপনার পছন্দের জন? সে কথাটা কি আমাকে বলতে আপনি পারেন না?

রোকসানা বিষণ্ন অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো—না, পারিনে। আপনাকে সে কথা বললে আমার লজ্জা আর গ্লানীই বৃদ্ধি পাবে কেবল।

এরই মধ্যে শোরগোল করে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন বাহার খাঁ সাহেব। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অচেনা দুই ভদ্রলোক। শোরগোল শুনেই রোকসানা দরজার নিকট থেকে দ্রুতপদে সরে গেল। নূরউদ্দীনও সরে আসতেই বাহার খাঁ হাসিমুখে বললেন —বুঝলে নূরউদ্দীন, জিহাদ আসলে থেমে যায়নি। বাংলার আনাচে কানাচে জিহাদ আন্দোলন চলছেই।

নূরউদ্দীন থতমত করে বললেন—জি?

www.pathagar.com

বাহার খাঁ বললেন—আমাদের বাড়ীর পাশেই শুরু হয়েছে নয়া জিহাদ। এবার এ জিহাদে নিজে আমি যাবো। তোমাদের এবার ছুটি।

৯

সেইদিনই সাঁঝরাতে নয়া জিহাদের আলোচনায় বাহার খাঁ সাহেবের বৈঠকখানা গরম হয়ে উঠলো। শোরগোল করে যে দুইজন নতুন লোক সহ বাহার খাঁ এসে বৈঠকখানায় ঢুকলেন আর নূরউদ্দীনকে নয়া জিহাদের বার্তা দিলেন, সেই দুই ভদ্রলোকই এই নয়া জিহাদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। এ জিহাদ শুরু হয়েছে পাশের জেলা চব্বিশ পরগনায়। এ জিহাদের উদ্যক্তা ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ঐ চব্বিশ পরগনারই লোক। ঐ জেলার হায়দরপুর এলাকার চাঁদপুর গ্রাম নিবাসী মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর সাহেব।

এই দু'ভদ্রলোক সেই তিতুমীরেরই কাসিদ বা দূত। একজনের নাম ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ। বাড়ী বাহার খাঁ সাহেবদেরই যশোহর জেলায়। অপরজন ফকির মিসকীন শাহ। থাকেন তিতুমীর সাহেবের সাথেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দু'জনই ফকির নেতা মজনু শাহর ফকিরবাহিনীর লোক।

স্থানীয় জমিদারদের সাথে তিতুমীরের লড়াই আসন্ন হয়ে উঠেছে। এ লড়াই বা জিহাদ শেষ পর্যন্ত জমিদারদের প্রভু ও দেবতা ইংরেজ সরকার পর্যন্তও গড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন। প্রয়োজন কিছু লড়াকু মুজাহিদের।

ইয়ারপুরের বাহার খাঁ সাহেব জিহাদী লোক। মরহুম সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভী (র)-এর জিহাদ আন্দোলনের তিনি একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও মদদদাতা। এ খবর যশোহর নিবাসী ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ জানেন। বালাকোটের লড়াই ফেরত বাংলার মুজাহিদগণ জিহাদ আন্দোলন চালু রাখতে আগ্রহী, সে আভাসও মুনিরউদ্দীন শাহ পেয়েছেন। তিতুমীর সাহেবের জিহাদ সরাসরি সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভী (র)-এর জিহাদ আন্দোলনের পরবর্তী অংশ না হলেও, কাজটা ঐ একই। তিতুমীর সাহেব সাইয়্যীদ আহমদ (র) ও আরবের শেখ মুহম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহাবের আদর্শ ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তি। তাঁদের ভাবশিষ্য। তাঁদের মতোই তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে হাত দিয়ে এদেশের অত্যাচারী শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষের মুখোমুখী হয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিতুমীরের আন্দোলন বেরেলভী সাহেবের জিহাদ আন্দোলনেরই নতুন এক সংস্কার এবং ঐ প্রেরণা ও প্রয়োজনেরই লাগাতার এক সংযোজন। তাই, ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ ও মিস্‌কীন শাহ অনেকটা নিজ গরজেই বাহার খাঁর কাছে এসেছেন তিতুমীর সাহেবের আসন্ন জিহাদে শরিক হওয়ার দাওয়াত নিয়ে।

ইয়ারপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জিন্দা মুজাহিদগণ নূরউদ্দীনের ও অন্যান্যদের পিছে পিছেই বালাকোট থেকে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। এদের কেউ

www.pathagar.com

কেউ জিহাদ আন্দোলন চালু রাখার বাসনার কথাও ইতিমধ্যেই এসে বাহার খাঁ সাহেবকে জানিয়ে গেছেন। আদর্শগত দিক ছাড়াও, জমিদার ও নীলকরদের নিত্য নতুন অত্যাচার এঁদের এই বাসনাকে চিরজাগ্রত রেখেছে। ফকির মুনির উদ্দীন শাহ সাহেবেরা যেদিন এলেন, বাঁহার খা সাহেব সেই দিনই খবর পাঠালেন এদের কাছে। খবর পাঠালেন অন্যান্য উৎসাহী ও আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছেও। নয়া জিহাদের খবর নেয়ার জন্যে এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সেইদিনই সাঁঝরাতে বাহার খাঁর বৈঠকখানায় সমবেত হলেন। কিছু হুজুগপ্রিয় লোকও ঘটনা কি জানার জন্যে সেখানে এসে ভিড় জমালো। বাহার খাঁর বৈঠকখানা ও বাহির বারান্দা জনাকীর্ণ হয়ে গেল।

বাহার খাঁ সাহেব প্রথমে এই নয়া জিহাদের ভাবাদর্শ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের নাম পরিচয় দিলেন। এরপরে বললেন—আপনাদের যা জানার-জিজ্ঞাসার থাকে আমাদের এই সম্মানিত মেহমানদ্বয়কে প্রশ্ন করলে, বিস্তারিত জানতে পারবেন।

জেকের আলীর সাবেক সঙ্গী মুজাহিদ বরকতুল্লাহ সরল সহজ ও উৎসাহী নওজোয়ান। শুরুতেই সে ফকির মুনিরউদ্দীন সাহেবকে প্রশ্ন করলো—আপনারা তাহলে ফকির নেতা মজনু শাহ সাহেবের ফকির বাহিনীর লোক জনাব ? সেই বাহিনীর সাথে আপনারাও লড়েছেন ?

জবাবে মুনিরউদ্দীন শাহ বললেন—জি। তবে আমি সে লড়াইয়ে সরাসরি অংশ গ্রহণ করিনি। করেছেন আমার বাপ চাচারা। আমি কিছুটা ছোট তখন। যোগানদার ছিলাম মাত্র। সরাসরি আর আপ্রাণ লড়েছেন আমার সঙ্গী এই ফকির মিসকীন শাহ সাহেব। সে লড়াইয়ে তিনি শেষতক লেগে ছিলেন।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে উনি ইংরেজদের কোপনজরে পড়েননি ? শুনেছি, সে লড়াই ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজ সরকার অনেক ফকিরদের ধরে ফাঁসী দিয়েছে, জেল দিয়েছে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। উনার উপর কোন গজব আসেনি ?

এবার জবাব দিলেন ফকির মিস্‌কীন শাহ সাহেব নিজেই। বললেন—হ্যাঁ এসেছিল। আমাদের উপর দিয়েও ছোটখাটো অনেক ঝড় গেছে। তবে ফকিরের সংখ্যা অনেক ছিল তো ? তাই ইংরেজ সরকার সবাইকে সনাক্ত করতেও পারেনি, ধরতেও পারেনি। আমি, আর আমার মতো কিছু লোক অনেক তাবাল তুফান তরিয়ে আজও টিকে আছি।

ঃ তাহলে এরপর আবার এই ঝুঁকির মধ্যে এলেন কেন জনাব ? মানে, এই মীর সাহেবের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কি কারণে ?

ঃ দেখুন, আমরা ন্যায়ের সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করা লোক। ঘর-সংসারে মনোনিবেশ করিনি। জিন্দেগীভর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এসেছি। ঝুঁকি বা মুসিবতের ভয় দীলে আমাদের নেই। তিতুমীর সাহেব যে মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন আর তাতে করে এদেশে আমাদের কওমের বুনিয়াদী দুশমনেরা যেভাবে তার পেছনে লেগেছে—এটা দেখে চুপ থাকি কি করে, বলুন ? তাই শেষের দিনগুলোও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে কাটানোর ইরাদাতেই স্বগরজে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছি।

www.pathagar.com

একথায় উপস্থিত জনতা সোল্লাসে আওয়াজ দিলো—মারহাবা-মারহাবা!

নূরউদ্দীন এবার ফকির মুনিরউদ্দীন শাহকে লক্ষ্য করে বললো—তা জনাব, জুলুম এদেশে সর্বত্রই আছে। ওদিকেও যে হচ্ছে আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও গড়ে উঠছে, এ খবর ভাসাভাসা কেউ কেউ আমরা শুনেছি। এবার এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা দিন। এই প্রতিবাদের উৎস। আর এর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানালে আমরা বড়ই বাধিত হই।

ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ সঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—তা কথা হলো, আপনি ঠিক কি জানতে চাচ্ছেন, মানে কোন্ কথাটা বললেন—

নূরউদ্দীন বললো—আমি বলছি, এসব মহৎ কাজে যাঁরা হাত দেন, দেখা গেছে, তাঁরা সবাই সাধারণের অনেক উপরের লোক। ফকির নেতা মজনুশাহ সাহেবের কথা আপনারা নিজেরাই সবিশেষ জানেন। আমাদের জিহাদ নেতা মরহুম বেরেলভী হুজুরও ছিলেন একেবারেই এক ক্ষণ জন্মা পুরুষ ও অনন্য ব্যক্তিত্ব। আপনাদের তিতুমীর সাহেব কি—

বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠে মুনিরউদ্দীন শাহ বললেন—জি জি, তিনিও এক অন্য ব্যক্তি। জবরদস্ত আলেম মানুষ। বিরল পণ্ডিত লোক।

ঃ তাই? তাহলে আগে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ঃ জন্মগতভাবে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর সাহেব এক বিশেষ ঐতিহ্য ও পবিত্রতার অধিকারী। তিনি হযরত আলী (রা)-এর বংশধর। তার পিতার নাম মীর হাসান আলী। তাঁদের পূর্ব পুরুষ হযরত আলী (রা)-এর বংশের সৈয়দ শাহাদত আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক দিন আগে বাংলায় আসেন। সৈয়দ শাহাদত আলীর নাতী সৈয়দ আবদুল্লাহকে দিল্লির তৎকালীন শাসক জাফরপুর বিভাগের 'মীর-ই-ইনসাফ' (প্রধান বিচারক) নিয়োগ করেন। দীর্ঘদিন তিনি সুনামের সাথে এ 'মীর-ই-ইনসাফ'গিরি করার সুবাদে তাঁরা "মীর" উপাধি লাভ করেন আর তাঁদের বংশ মীর বংশ রূপে পরিচিত হয়।

ঃ আচ্ছা। তারপর?

ঃ এরপর তাঁর শিক্ষা। সে এক অসাধারণ ব্যাপার। নিজের চেষ্টায় আর কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে তাঁদের মদদে, তিতুমীর সাহেব বাংলা ও বিহারের সেরা আলেমদের কাছে কুরআন, হাদিস, ভাষা, সাহিত্য এবং ইসলামিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বিরল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর মতো আলেম অর্থাৎ পণ্ডিত লোক খুব কমই এদেশে আছেন। কুরআন শরীফ তাঁর মুখস্ত, প্রধান হাদিসগুলোর প্রায় সকল দিকই তাঁর নখদর্পণে এবং তিনি এক সাথে আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা—এই চার ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এর সাথে দৈহিক শক্তিতেও তিনি অসাধারণ। বিদ্যা শিক্ষার সাথে তিনি খেলাধুলা ও শরীর চর্চার দিকেও বিরল পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি একজন

www.pathagar.com

অতুলনীয় কুস্তিগীর বা মল্লযোদ্ধা। কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা আবেদ আলীকে পরাজিত করে মল্লযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিরোপা তিনিই অর্জন করেছেন এবং এখন তা তাঁরই দখলে।

ঃ বলেন কি!

ঃ তাঁর বংশ পরিচয়, পাণ্ডিত্য আর বহুমুখী প্রতিভার কারণে খানপুরের বিশিষ্ট ভূস্বামী ও খানদান আদমী রহিমুল্লাহ সিদ্দিকী ওরফে মুনশী আমির তাঁকে পরম আগ্রহে জামাই করে নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধনাঢ্য বণিক জামালউদ্দীন আফেন্দী আর মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার উৎসাহে ও অর্থনৈতিক মদদে তিনি মক্কায় হজ্ব পালনে যান। হজ্ব পালনের সাথে সেখানে গিয়েও তিনি ইসলামিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় আরো উচ্চতর বিদ্যা হাসিল করে আসেন।

উপস্থিত জনতার মধ্যে আবার আওয়াজ উঠলো—তোফা-তোফা!

ঃ এই মক্কায় থাকার সময়েই তিনি শেখ মুহম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহাবের ও তৎপরে ঘটনাচক্রে সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভী (র)-এর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। এতে করে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

এবার বাহার খাঁ সাহেব প্রশ্ন করলেন—এসেই তিনি সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন?

ঃ জি হাঁ, প্রায় তা-ই। মুসলীম সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার, বিদায়াত ও তৌহিদের নীতিমালার প্রতি অবহেলা আগেই তার দীলে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। এবার এসব মনীষী ব্যক্তিদের প্রভাবে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি চূড়ান্তভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। ঈসায়ী ১৮২৭ সনে মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি বারাসতের হায়দুরে বসতি স্থাপন করলেন এবং এর পরেই সংস্কার কাজ শুরু করলেন।

ঃ যেমন?

ঃ বিদ্যমান কুসংস্কার ও বিদায়াতের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। বিভিন্নস্থানে জ্বালাময়ী ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্যে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন। যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তিনি মুসলমানদের যেসব বিভ্রান্তির দিক তুলে ধরলেন আর গভীরজ্ঞানের আলোকে যেসব কাজের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তাতে জাদুর মতো কাজ হলো।

ঃ আচ্ছা। তাহলে তাঁর নসিহতের বিশিষ্ট দিকগুলো কি, এ সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করুন জনাব। দেখি, বেরেলভী হুজুরের সাথে তার মতবাদের মিল পড়ে কতখানি।

ঃ প্রধান দিকগুলো ঐ বেরেলভী হুজুরের মতো একই। তার সাথে নতুন কিছু সংযোজনও আছে। তৌহিদের নীতিমালা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরার সাথে তাঁর এলাকার মুসলমান জনগণকে তিনি পীর পূজা, গোরপূজা, দরগাপূজা প্রভৃতি বিদায়াত ও শিরক পরিহার করতে, বিবাহ-খাত্‌না-জন্মদিন-মৃত্যুদিন নিয়ে ব্যয় বহুল অনর্থক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকতে, ঈদে-মুহররমে অধিক খরচ কমিয়ে মিতব্যায়ী হতে, যেখানে মসজিদ নেই সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে, জামাত গড়ে তুলতে ও নামাজের প্রতি যত্নবান হতে জোরদারভাবে নসিহত করলেন। আদবে আচরণে এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্যে তিনি ধুতিগঞ্জী পরিহার করে মুসলমানদের ইসলামী লেবাস পরিধান করতে বললেন এবং দাড়ি রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন।

ঃ দাড়ি রাখার উপর?

ঃ জি। এটার উপর তিনি অনেক খানি জোর দিলেন। তবে তাঁর যে নসিহত সবচেয়ে অধিক আবেদন সৃষ্টি করলো, তাহলো—সমতা। সবাইকে তিনি বুঝালেন, মুসলমানেরা সকলেই ভাই ভাই। এখানে কোন উঁচু নীচু নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। পেশা, বৃত্তি আর অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে কেউই ছোট জাত বা বড় জাত নয়। কেউ আশরাফ, কেউ আতরাফ নয়। সকলেই সমান। এ সমতা বজায় রাখার উপর তিনি সর্বাধিক জোর দিলেন।

অনেকেই পুনর্বার এক সাথে বলে উঠলেন—বহুৎ খুব! বহুৎ খুব!

ঃ এই সমতার দিকটাই তার প্রতি জনগণকে অধিক আকৃষ্ট করলো। তাদের আর্থসামাজিক দিকটা শ্রেণীভেদের দরুন দারুণভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সমাজে জমিদার, ইজারাদার, নীলকর প্রভৃতি নব্য বিত্তবান শ্রেণীগুলো পয়দা হওয়ার প্রভাবে বাংলার মুসলমান কৃষক প্রজাদের মধ্যেও এই শ্রেণীভেদের বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল। উচ্চ নীচ ভেদাভেদে জীবন তাদের বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। পড়েছিলই বলি কেন, এ বিষতো সর্বত্রই এখনও বিদ্যমান।

ঃ জি- জি। অবশ্যই।

ঃ এসব নানাবিধ আকর্ষণে তিতুমীর সাহেবের আহ্বান বিপুল সাড়া জাগালো। শত শত লোক এসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো আর এই সংস্কারের কাজে সংগঠিত হলো। ফলে, মীর সাহেবের সংস্কার আন্দোলন শুধু তাঁর এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রইলো না, দেখতে দেখতে তা চবিব্বশ পরগনা, নদীয়া আর আপনাদের এ যশোহর জেলার দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর এ ধর্মীয় আর সমাজ সংস্কার আন্দোলন গরিব কৃষক প্রজাদের জীবন ব্যবস্থার অত্যন্ত অনুকূল হওয়ায়, চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার অসংখ্য কৃষক প্রজা এসে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে লাগলো। এতে করে তার আন্দোলন শুধু সংস্কার আন্দোলনেই আবদ্ধ হয়ে রইলো না। রীতিমতো কৃষক প্রজা আন্দোলন অর্থাৎ গণ আন্দোলনের রূপ নিতে লাগলো।

ঃ তারপর?

ঃ শুরু হলো সংঘাত। মুসলমান কৃষকেরা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হচ্ছে দেখে জমিদার ও নীলকরদের গাত্রদাহ শুরু হলো। তারাও তখনই ষড়যন্ত্রে বসে গেল।

ঃ কি করম?

ঃ এসব অত্যন্ত জঘন্য কাহিনী। ওদের অসংখ্য ষড়যন্ত্রের যে দু'চারটের খবর জানি আর বিশ্বস্তসূত্রে হুবহু পেয়েছি তা যেমনই হীন, তেমনই হাস্যকর। মীর

www.pathagar.com

সাহেবের আহ্বানে জনগণ জোরেশোরে সাড়া দেয়ার প্রথম দিকের একদিন। সেদিন ছিল কোন এক পার্বণের দিন। পার্বণ শেষে পুরওয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় পরিষদদের নিয়ে আলাপউল্লাস করছিলেন। এমন সময় এক পাইক এসে তাঁকে বললো—প্রভু, তারাগুনিয়ার জমিদার বাবু—পুরওয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সবিস্ময়ে বললেন—জমিদার বাবু! কি হয়েছে তাঁর?

ঃ প্রভুর আলয়ে তিনি অতিথি।

ঃ অতিথি! কৈ, কোথায়?

ঃ ঐ যে উনি আসছেন—

তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন নাগকে আসতে দেখে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় হৃষ্টচিত্তে বললেন— আরে, এই যে না চাইতেই বৃষ্টি! আসুন-আসুন। নমস্কার—

নমস্কারের জবাবে কোনমতে প্রতিনমস্কার করে রাম নারায়ন নাগ আক্ষেপ করে বললেন—হায়রে দাদা, তিথি- পার্বণ নিয়ে খুব মৌজেই আছেন দেখছি! ওদিকে যে আকাশটা গোটাই মাথার উপর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তার কোন খবরই রাখেন না বোধ হয় তাহলে?

কৃষ্ণদেব রায় থতমত করে বললেন—নাতো! তেমন কোন খবর তো জানিনে।

ঃ জানবেন কি করে? আসলে আকাশটা তো আমার মাথার উপরই ভেঙ্গে পড়ছে সবার আগে। আপনাদের উপর পড়বে কিছু পরে। আপনাদের জানতে তো দেরী কিছুটা হবেই।

রাম নারায়ন নাগের কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়লো। কৃষ্ণদেব রায় তাজ্জব হয়ে বললেন—এসব কি বলছেন আপনি নাগবাবু? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। ঘটনাটা কি?

ঃ আমাদের রাজত্ব আর বেশীদিন নেই দাদা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। যোগাড়যন্ত্রর তৈয়ার।

ঃ নাগবাবু!

ঃ আবার আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে। পুনর্মূষিকোভব।

ঃ পুনর্মূষিকোভব! কারা আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছে? ইংরেজরা?

ঃ থুড়ি-থুড়ি! ওঁরা তো আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পরমজন। দেবতুল্য মানুষ। ওঁরা আমাদের প্রতি এতো নির্দয় হবেন কেন? আমাদের আবার পথে নামানোর যোগাড় যন্ত্রর করছে আমাদের ঐ নাছোড়পিণ্ডে আসল আপদেরাই। যাদের আমরা পথে নামিয়ে দিয়েছি, তারাই।

ঃ তারাই! স্পষ্ট করে বলুন।

ঃ এ দেশের মুসলমানেরা। ওরাই তো সেই থেকেই পেছনে লেগে আছে আমাদের। ফকির ব্যাটাদের ধাক্কা সামাল দিয়ে উঠতে না উঠতেই সৈয়দ আহমদ জিহাদ নিয়ে হৈ হৈ করে উঠেছে। পুব অঞ্চলেও নাকি কে এক হাজী শরিয়তুল্লাহ এ রকমই বিদ্রোহের বিষ ছড়াচ্ছে। এদিকে এরা আবার খড়গ তুলেছে আমাদের মাথার উপর ঃ বলেন কি! তা আবেগটা খাটো করে সবকিছু খুলে বলুন তো শুনি।

www.pathagar.com

ঃ হায় ভগবান! এরপরও আরো আমাকে খুলে বলতে হবে ? ঐ ব্যাটারা যে এখানেও আবার দল পাকিয়ে ফেলেছে, এ নিয়ে অন্যান্য সবাই যে আমরা তটস্থ হয়ে উঠেছি, এর একটু কি বাতাসও আপনি পাননি ?

ঃ কার কথা বলছেন ? ঐ নিসার আলী, মানে তিতুমীরের কথা ?

ঃ এই-এই। এই তো দাদা আসল জায়গায় হাত দিয়েছেন। তার কথাই বলছি আমি। কৃষক প্রজাদের নিয়ে ঐ ব্যাটাই আমাদের বিরুদ্ধে জোট পাকানো শুরু করেছে।

ঃ হ্যাঁ, সে বাতাস তো কিছু কিছু অবশ্যই পেয়েছি। আমার আশেপাশেও অল্প অল্প গুঞ্জরন উঠেছে। কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন, এতটা শুনিনি। আপনার ওদিকের খবর কি তাহলে ?

ঃ মহামারী কাণ্ড দাদা। একেবারে মারমুখী অবস্থা। ঐ তিতুমীরের নেতৃত্বে আমার মুসলমান প্রজারা কঠিনভাবে জোটবেধে ফেলেছে। কাউকে আর তোয়াক্কাই করছে না। আগে যেমন তুচ্ছ একটা ডাকেই ছুটে এসে পায়ের কাছে পড়তো, এখন হাকা-হাকিটাও তারা গণ্যের মধ্যে নিচ্ছে না।

ঃ বলেন কি!

ঃ শুধু আমাদের এলাকা বলি কেন দাদা ? আমাদের সকলের জমিদারীতেই ওরা এখন তুমুলভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া যদি অবাধে চলতে থাকে, মানে বাংলার মুসলমান প্রজারা যদি শক্তভাবে জোট বেঁধে ফেলে, তাহলে আর আমাদের ভাত নেই।

ঃ তা মানে—ব্যাপারটা—

ঃ বুঝলেন না দাদা ? নজর, সেলামী, পূণ্যা, পরবী—এসব তো কিছু দেবেই না, নীট খাজনাটাও ঐ নবাবী আমলের হারে ছাড়া বাড়তি হারে এক পয়সাও দেবে না। তার উপর আবার আমাদের আজ্ঞা পালনও করবে না, গ্রাহ্য-গণ্য করবে না। উল্টো আমাদের উপরই চোখ রাঙ্গাবে আর বাগে পেলে আমাদের দফাই রফা করে ছাড়বে।

ঃ সেকি! এমন হলে তো সত্যিই বিপদের কথা।

ঃ বিপদ বলে বিপদ দাদা ? ঐ মজনু শাহর ফকির ব্যাটাদের হাতেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। ভাগ্‌গিস ওরা ইংরেজদেরও উৎখাত করতে চেয়েছিল বলেই মাঝখান থেকে বেঁচে গেছি আমরা। ইংরেজেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাটাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কিন্তু এবার তো ব্যাপারটা অন্যরকম। শুনছি, ঐ ফকির ব্যাটাদের মতো ইংরেজদের উৎখাত করার কোন পরিকল্পনা এ ব্যাটাদের নেই। ওরা নিজেদের ধর্মীয় দিকটা চাঙ্গা করে তুলতে চায়। সেই সাথে তাদের স্বজাতিকে সজাগ সতর্ক করে আত্মমর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে চায় আর একটা শক্ত সমাজকাঠামো গড়ে তুলতে চায়। এর অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে দাদা—ভেবেই এবার দেখুন।

চিন্তিতভাবে মাথা দুলিয়ে এবার কৃষ্ণদেব রায় বললেন—আমাদের বাড়াভাতে নির্ঘাত তাহলে ছাই। ওরা সজাগ সতর্ক হয়ে গেলে আর এখনকার মতো বেয়াকুফ বেঁহুশ না থাকলে, আমরা একদম ঠুটো জগন্নাথ। আমাদের জমিদারীতে মুসলমান

www.pathagar.com

প্রজারাই সংখ্যায় প্রায় বার আনা। আর তাদের অর্থেই আমাদের এই শানশওকত। ওরা সবাই মজবুতভাবে জোট বেধে ফেললে, হুকুম করাতো দূরের কথা, মূল খাজনাটুকু আদায় করার জন্যেই ওদের হাতে-পায়ে ধরে বেড়াতে হবে। এর উপর আবার পান থেকে চুন খসলেই ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমাদের প্রভুত্ব শেষ করেও দিতে পারে। ঠিকই বলেছেন আপনি।

ঃ তাহলেই ভেবে দেখুন দাদা। ইংরেজ সরকার এখন এই হিন্দুস্থানের তামাম এলাকা জয় করার ধান্দায় বিভোর হয়ে আছে। তিতুমীর যদি ওদের গায়ে হাত না দেয়, তাহলে এই ফালতু দিক নিয়ে আর ভাবতেই যাবে না ইংরেজরা। ইংরেজদের তো চিনি। ওদের ল্যাজে আগুন না লাগলে, আমাদের বিপদ বালাইয়ের দিকে ভুলেও ওরা তাকাবে না।

কৃষ্ণদেব রায় পুনরায় মাথা নেড়ে বললেন—হুঁউ! বড়ই গুরুতর কথা!

ঃ ইংরেজরা সহায় না হলে আর ওরা শক্তভাবে জোট বেধে ফেললে একা আমরা ওদের কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবো না। ফকিরদের বেলাতেই তা দেখা গেছে। কাজেই, আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কেবলই শিউরে উঠছি আমি।

কৃষ্ণদেব রায় অতপর সাহস দিয়ে বললেন—না, এতটা ঘাবড়াবার কিছু নেই। পরিস্থিতি তেমন হলে ইংরেজদের অবশ্যই পক্ষে পাওয়া যাবে। মানে, পক্ষে ওদের আনতে হবে। লেজে ওদের আগুনটা অমনি অমনি না লাগলে, আগুনটা ওদের লেজে লাগার জন্যেই জ্বলে উঠেছে বলে ওদের ক্ষেপিয়ে দিলেই, ব্যস! কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু সে কথা পরে। ওদের ডাকার গরজ যাতে করে না হয়, অর্থাৎ জোটটা শক্ত হয়ে উঠার আগেই যদি ওটা আমরা ভেঙে দিতে পারি। তাহলে ঝামেলাটা অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে।

ঃ দাদা!

ঃ এবার বলুন, আপনার এলাকায় ঐ তিতুমীরের চেলারা কেমন আচরণ করছে?

ঃ বড়ই বিপজ্জনক দাদা। তিতুমীরের চেলারা সবাই ধুতিপরা ছেড়ে দিয়েছে। ওরা এখন লুঙ্গি-ইজার পরছে। দাড়ি রাখছে মুখে আর টুপি মাথায় দিয়ে ভিন্ন একটা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। আমার লোকজনদের তেমন পরোয়াই ওরা করছে না। নায়েব-গোমস্তা-আদায়কারীদের কোন কর্তৃত্বই থাকছে না। ব্যাটাদের ভয়ে আমার পাইক-পেয়াদারাও খামুশ মেরে যাচ্ছে।

কৃষ্ণদেব রায় একথায় উষ্মার সাথে বললেন—খামুশ মেরে যাচ্ছে দেখেই হাত-পা ছেড়ে দিয়েছেন? পাইক-পেয়াদাদের সাহস দিয়ে চাঙ্গা করে তুলুন আর ঐ তিতুমীরের চেলাদের এখন থেকেই শক্তভাবে শাসন করা শুরু করুন। ধরে এনে ব্যাটাদের দস্তুর মতো ধোলাই দিতে থাকুন। লাঠির আগায় ভূত পালায়। শক্ত ধোলাই শুরু হলেই ওরা খামুশ মেরে যাবে।

ঃ তা কি করে হয় দাদা? সেই ধোলাইটা করি কোন অজুহাতে। ওদের কাজ কারবার ওদের নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওদের ধর্মীয় আর সামাজিক ব্যাপার নিয়ে। ওর মধ্যে আমরা যেচে গিয়ে হাত দিলে তো যারা ঘুমিয়ে আছে তারাও লাফিয়ে উঠে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে?

ঃ যেচে যাবেন কেন? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন। আপনার মুসলমান প্রজারাকি

www.pathagar.com

সবাই তিতুমীরের নীতি নির্দেশ একবাক্যে মেনে নিচ্ছে? দু'চারজনও কি কেউ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না?

ঃ হ্যাঁ দাদা, তাও বেশ কিছু লোক নিচ্ছে। অধিকাংশেরা তার কথায় অনুপ্রাণিত হলেও, সবাই হচ্ছে না। কিছু লোক একেবারেই বেঁকে বসে থাকছে। তিতুমীরের নীতি আদর্শ মেনে চলতে গেলে তো নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি তাই করা যায় না। আদর্শ জীবন যাপন করা বড়ই কঠিন কাজ। তাই কিছু লোক মোটেই ঐ ঝামেলা পোহাতে যাচ্ছে না আর ওর দলভুক্ত হচ্ছে না।

ঃ ব্যস- ব্যস! তবে আর চিন্তা কি? তিতুমীরের ঐ বিরোধী লোকদের শিগ্‌গির শিগ্‌গির গিয়ে হাত করে ফেলুন। আর তাদের শিলনোড়া দিয়ে তাদের দাঁত ভাঙ্গুন। উপযাচক হয়ে গিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ফাঁশ করবেন কেন?

ঃ দাদা!

ঃ ওদের হাত করে ওদের দ্বারাই নালিশ আনিয়ে নিন আর আপনি বিচারকের ভূমিকা পালন করুন। আপনি জমিদার। বিচারক হয়ে আপনার প্রজাদের আপনি দণ্ড বিধান করলে কারো কিছু প্রতিবাদ করার থাকবে না।

উৎসাহিত হয়ে উঠে রামনারায়ন নাগ বললেন—ঠিক কথা দাদা। বড়ই মোক্ষম বুদ্ধি তো।

ঃ যান, আপনি গিয়ে আপনার কাজ শুরু করুন। আমি এদিকে অন্যান্য জমিদারদের ডেকে নিয়ে শলা পরামর্শে বসি। আমরাও এক যোগে আর ঐ একই পন্থায় ধোলাই যজ্ঞ শুরু করি। সবাই আমরা জোটবেধে লাগলে, আপছে আপ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ব্যাটারা।

ঃ আজ্ঞে আজ্ঞে। তা অবশ্যই কথা বটে।

ঃ অচিরেই সবাই আমরা বসবো আর সে বৈঠকে আপনাকেও ডাকা হবে। আপনিও থাকবেন। মোদ্দাকথা, এক যোগে মুগুর চালিয়ে শুরুতেই জোট ওদের অবশ্যই ভাঙতে হবে। নইলে সত্যি সত্যিই ভয়ানক বিপদ আছে সবার।

কয়েক দিনের মধ্যে পুরওয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গৃহে বৈঠক বসলো জোরদার। সে বৈঠকে এসে হাজির হলেন গোবরাগোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নগরপুরের জমিদার গৌরপ্রসাদ চৌধুরী, তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ন নাগ, কুড়াগাছীর মহিলা জমিদারের প্রতিনিধি, অন্যান্য আরো কয়েকজন জমিদার ও আশেপাশের নীলকর প্রধানেরা।

নীলকরদেরও সমস্যা ঐ একই। মুসলমান কৃষকেরা জোট বেঁধে ফেললে তাদের দিয়ে নীলকরেরা আর নীল বুনাতে পারবে না, নীলের উপর দাদন নেয়াতে পারবে না, ধরে এনে চাবুক মারতে পারবে না। জমিদারদের স্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থ এক সূতোয় গাঁথা। সুতরাং বৈঠকের খবর পেয়ে তারাও অনেকে এসে পরামর্শে শামিল হলো।

অল্প আলোচনা ও অধিক পথপন্থা হাতড়ানোর পর, সকলেই অবশেষে ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌছলো—ডাণ্ডা হাঁকাও। ব্যাটাদের যেখানে যাকে পাও, সামান্যতম

www.pathagar.com

অজুহাত অছিলা পেলেই ধরে এনে সকলেই সমানে ব্যাটাদের ডাণ্ডা মারা শুরু করো। ওদেরই বিরোধী দলকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাসাদ তৈয়ার করাও আর ধরে এনে আচ্ছা মতো শায়েস্তা করো। সেই সাথে জরিমানা, জুলুম আর যদেচ্ছা অপমান অপদস্ত করতে থাকো। একজোটে ব্যাটাদের নানাভাবে শায়েস্তা করা শুরু করলেই দল পাকানোর খাহেশ ওদের অংকুরেই বিনাশ হবে।

শুরু হলো সংঘাত। তিতুমীরের নসিহত থেকে যেসব লোক দূরে সরে রইলো, তাদের পেছনে উস্কানী দিয়ে ফিরতে লাগলো জমিদারের চররা। এ উস্কানী ব্যাপকভাবে ফলপ্রসু না হলেও, একেবারে বিফলেও গেল না। কারণ গাদ্দার, বেয়াকুফ ও সুবিধাবাদী লোক এ সমাজে সর্বকালেই ছিল ও আছে। এ ধরনের কিছু গাদ্দার ও বেয়াকুফ এই উস্কানীতে সাড়া দিলো এবং জমিদার বাবুর প্রিয়পাত্র হওয়ার লোভে জমিদার বাবুর কাছে নালিশ নিয়ে হাজির হতে লাগলো।

প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য নালিশটা তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ন নাগের কাছেই এলো। কয়েকজন বিদায়াতী ও নাদান মুসলমান নাগবাবুর কাছে এসে এই মর্মে নালিশ দায়ের করলো যে, পুরজোত ওরফে পুজত মল্লিক নামের তিতুমীরের জনৈক মুরিদ একদল সঙ্গী সাথী নিয়ে এসে তাদের চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠানে বাধাদান করেছে এবং তাদের ভীষণভাবে মারধোর করেছে। বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই বাবুর প্রজা। বাদীরা বাবুর কাছে বিচার চায়।

নালিশ পেয়ে নেচে উঠলেন তারা গুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ন নাগ। এমন অপেক্ষাই নাগবাবু অধীর আগ্রহে করছিলেন। নালিশ পেয়েই পাইক পাঠালেন পুজত মল্লিককে ধরে আনতে।

পুজত মল্লিককে বেঁধে আনলো পাইকেরা। তাকে সামনে এনে হাজির করলে নাগবাবু ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন—এই ব্যাটা, তোর এতো বড় স্পর্ধা! যার নামে বাঘে-ছাগে এক ঘাটে জল খায়, তার জমিদারীতে বাস করে ক্ষমতার দাপট দেখাস?

পুজত মল্লিক বললো—আমার অপরাধ কি বাবু তাতো বুঝলাম না?

ঃ তবেরে নরাধম! অপরাধ কি তা বুঝতে পারিস্‌নি?

দু'জন ফরিয়াদিও উপস্থিত ছিল সেখানে। তাদের প্রতি ইংগিত করে নাগবাবু ফের বললেন—এদের গায়ে হাত তুললি তুই কোন্ সাহসে?

পুজত মল্লিক বললো—না তো বাবু, হাত তুলিনি। ওরাই বরং হাত তুলেছে। আর তা ছাড়া এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনার পাইকেরা আমাকে চোরের মতো বেঁধে আনলো কেন? আপনার তো এখানে কোন সংস্রব নেই বাবু?

গোস্বায় জ্বলে উঠলেন রাম নারায়ন নাগ। বললেন—কি বললি? আমার কোন সংস্রব নেই? আমার জমিদারীর মধ্যে গোলমাল আর আমার সংস্রব নেই? তোকে আমি খুন করবো বেয়াদিব। এতটাই বেড়ে গেছিস তোরা?

ঃ বাবু!

ঃ আগে বল্, আমার এই নীরিহ প্রজাদের গায়ে হাত তোলার সাহস তোদের কোথা থেকে এলো? কেন এদের যারপর নেই মারধোর তোরা করলি, তাই আগে বল?

www.pathagar.com

রাম নারায়ন নাগ পুনরায় বাদীদের প্রতি ইংগিত করলেন। পুজত মল্লিক সবিস্ময়ে বললো—সেকি বাবু! এটাতো একদম উল্টা কথা। আমরা মারলাম কখন? এরাই বরং আমাদের একজন লোককে যাচ্ছে তাই অপমান করার পরও নির্মমভাবে মেরে রক্তাক্ত করেছে।

ঃ অমনি অমনি তাকে এরা মেরেছে?

ঃ প্রায় অমনি অমনিই বলা চলে। এরা ইসলামের নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে শিরক-বিদায়াত নিয়ে চরমভাবে মাতামাতি করছিল দেখে, আমাদের সেই লোক এদের এসব করতে নিষেধ করেছিল মাত্র। এতেই এরা রেগে গিয়ে তাকে বেদম মার মেরেছে। মেরেছে আর বলেছে, জমিদার বাবু আমাদের পক্ষে আছেন ব্যাটা! তুই আমাদের নিষেধ করার কে?

জমিদারের কাছে হঠাৎ একটু খাতির আস্কারা পেয়ে ফরিয়াদীদের পুলকের সীমা পরিসীমা ছিল না। পুলকের আধিক্যে এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—বটেই তো বটেই তো! বাবু আমাদের পক্ষে আছেন। আমাদের উৎসাহ-অভয় দিয়েছেন। তোরা ব্যাটা আমাদের কাজে নাক গলাতে আসিস্ কেন? খোদ বাবুর ইচ্ছের উপর তোরা হাত ঘুরাতে চাস?

প্রত্যুত্তরে পুজত মল্লিক বললো—শির্ক-বিদায়াত করার জন্যে কি খোদ বাবু তোদের বলেছেন?

থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে দেখে জমিদার বাবু তৎক্ষণাৎ হুংকার দিয়ে উঠলেন। বললেন—চোপ্‌রও বদমায়েশ! আমাকে নিয়ে টানাটানি করিস্? শির্ক-বিদায়াত কিরে ব্যাটা, শির্ক-বিদায়াত কি? কি করেছিল এরা?

ঃ বাবু, একটা পাকুড় গাছের গোড়ায় আল্‌পনা কেটে সারি সারি মাটির বাতি জ্বেলে, দুধ কলা ছড়িয়ে এরা দরগা পূজা করছিল আর সেই সাথে তুমুলভাবে ঢাক ঢোল পিটে ধ্বনী আওয়াজ তুলছিলো। ওটা নাকি বুড়াপীরের দরগা। ঐ পীর নাকি কাঁচা চাল, কাঁচা দুধ, জিনকলা আর গুড় দিয়ে মাখানো কাঁচা শিরনী খায়। এই শিরনী মাখানোর তালে তালে ঢাক ঢোল বাজিয়ে এরা বুড়া পীরের জয়োধ্বনী করছিল।

তাতে কি হয়েছে?

ঃ এটা চরম শির্ক বাবু। ইসলামের চরম অবমাননা। ঢাক ঢোল বাজিয়ে বুড়া পীরের শিরনী করা—

ফরিয়াদীরা দু'জনই এবার এক সাথে বলে উঠলো—কেন, ঢাক ঢোল বাজাবো না কেন? সেদিন মুহররমের দিন। সেরেফ বুড়া পীরের নয়, মাদারের দরগাও ঐ এক সাথে আছে। মুহররমের কাসিদেরা এসে চামর দুলিয়ে ঐ দরগায় বাও দেয়। মুহররমের দিনে কত কাড়া-নাকাড়া পিটে সবাই তাজিয়া মিছিল করে, উল্লাস আল্লাদ করে। কাড়া নাকাড়ার বদলে আমরা ঢোল এনে বাজিয়েছি। আমাদের পাড়ার বিজয় ঢুলি এসে বিনিপয়সায় কিছুক্ষণ ঢাক বাজিয়ে দিয়েছে। তাতে ক্ষতিটা হলো কি?

এর জবাবে পুজত মল্লিক বললো—এগুলো সবই বিদায়াত, সবই শির্ক। ঢাক

www.pathagar.com

ঢোল বাজিয়ে দরগা পূজা করাটা আরো বড় শির্‌ক। একদম হারাম। আল্লাহকে বাদ দিয়ে বট-পাকুড় গাছকে উপাস্য বানানো মুসলমানদের জন্যে একদম—

সঙ্গে সঙ্গে বাদীরা এর প্রতিবাদ করে বললো—এহ্‌ঃ। বললেই হলো! আমাদের বাপদাদারা যেভাবে ধর্ম পালন করেছেন, আমরাও সেভাবে ধর্মপালন করছি। আমাদের ধর্মে কর্মে বাধা দেয়ার তোমরা কে?

পুজত মল্লিক বললো—আমরাও মুসলমান, তোমরাও মুসলমান। তোমরা ভুল করছো বলেই তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

জমিদার বাবু গর্জে উঠে বললেন—চোপ। কেন তা দেবে আর সে কারণে কেন তোমরা মারধোর করবে? তোমরা যেটা ধর্ম মনে করো, এরা যদি সেটাকে ধর্ম মনে না করে, তার জন্যে তোমরা এদের মারধোর করার কে? এতো সাহস কোথা থেকে পেলে তোমরা?

ঃ মারধোর তো করিনি বাবু? আমাদের ঐ লোকটাকে মেরে রক্তাক্ত করায় আমরা প্রতিবাদ করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাদের আসতে দেখেই ওরা দরগা পূজা রেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা ওদের সাক্ষাৎই পাইনি।

ফরিয়াদিদের একজন এবার বললো—তাহলেই বুঝুন বাবু! আমাদের ধর্মকর্ম এরা পণ্ড করে দিয়েছে। এটা কি মারার চেয়ে কম হলো? দু' ঘা যদি মারতোও, তবু তা সইতো। আমাদের ধর্মকর্ম পণ্ড করে আমাদের মহাপাপী করাটা—

রামনারায়ন নাগ লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক- ঠিক! এতবড় স্পর্ধা! একজনের ধর্মকর্ম পণ্ড করিস, এতবড় দুসাহস। নরকের কীট। ধরাকে সরাজ্ঞান করা শুরু করেছিস তোরা? এর পরিণাম কি ভীষণ, এখনই তা দেখাচ্ছি—

বলেই নাগবাবু হাক দিলেন—হরি সিং, এই ব্যাটাকে এক্ষুণি তোমরা ঐ পাশের ঘরে নিয়ে যাও আর দস্তুর মতো বানাও-জলদি—

বানানোর ধরন রকমের ব্যাপারে পাইকদের বোধ হয় আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল। হতভাগ্য পুজত মল্লিককে তারা তখনই পাশের ঘরে নিয়ে গেল এবং খুঁটির সাথে বেঁধে মারতে মারতে আধমরা করে ফেললো। সেই সাথে বাবুর নির্দেশে পুজত মল্লিকের মুখের দাড়ি টেনে ছিড়ে সারা মুখ রক্তাক্ত করে ফেললো।

এখানেই শেষ হলো না পুজত মল্লিকের নির্যাতন। অতপর বাবু তাঁর পঁচিশ টাকা জরিমানা ধার্য করলেন। ঘটিবাটি শুরু-ছাগল বেচে যতক্ষণ পুজত মল্লিকের পরিজনেরা এসে জরিমানার টাকা দাখিল না করলো ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধাই রইলো পুরজোত বা পুজত মল্লিক। জরিমানার টাকা এনে জমা দেয়ার পর তবেই তাকে ছেড়ে দেয়া হলো।

ফকির মুনিরউদ্দীন শাহর মুখে এই পর্যন্ত শুনেই বাহার খাঁর বৈঠকখানায় সমবেত জনতা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা সরোষে আওয়াজ দিলো—ইশ! ঐ ব্যাটার কল্লাটা এখনও ধড়ের সাথে আছে? ছিড়ে ফেলা হয়নি?

ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ বললেন—পুজত মল্লিকের আত্মীয় স্বজন যখন এ খবর তিতুমীর সাহেবের কাছে নিয়ে এলেন, তখন মীর সাহেবের মুরিদেরাও এমনইভাবে

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মীর সাহেবকে বললেন—হুকুম দেন হুজুর, ঐ ব্যাটা জমিদারের কল্লাটা এখনই গিয়ে ছিড়ে আনি।

কিন্তু মীর সাহেব তাঁদের নানাভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলেন। বললেন —আমরা এক বিরাট ও মহৎ কাজে হাত দিয়েছি। আসল কাজ বাদ দিয়ে, অর্থাৎ দ্বীনকে মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার মেহনত রেখে আমরা যদি আল্পতেই দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ আর হুড় হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের আসল লক্ষ্যটাই বানচাল হয়ে যাবে। আমরা শান্তির পথে চলতে চাই, কানুন হাতে তুলে নিতে চাইনে। লাঠির বদলে লাঠি না তুলে এর প্রতিবিধান কল্পে কানুনের আশ্রয় নিতে হবে।

অতপর তিনি পুজত মল্লিকের লোকজনদের বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাম নারায়ন নাগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে বললেন এবং তাঁর কয়েকজন এলেমদার শিষ্যকে এ মোকদ্দমা দায়ের করার কাজে তাঁদের সাথে দিলেন।

তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ন নাগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হলো। কিন্তু ফল কিছু হলো না। অন্যান্য জমিদার ও নীলকর সাহেবদের হস্তক্ষেপে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে নাগবাবুকে সমনটাও দিলেন না। বদলে আগের ঐ দু' ফরিয়াদিকেই আদালতে হাজির করলেন। এরপর সাক্ষ্য প্রমাণে পুজত মল্লিককে প্রহার ও নির্যাতন করার জন্যে জমিদারের অপরাধ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, মামলা চলার যোগ্য কোন কারণ নেই বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মামলাটি খারিজ করে দিলেন।

মামলা করে পুজত মল্লিকেরা ব্যর্থ হওয়ার ফলে জমিদারেরা আরো অধিক উৎসাহী ও দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। এ ঘটনার পর থেকে ব্যাপারটি আর একজন মাত্র জমিদার কর্তৃক এক পুজত মল্লিককে নির্যাতন আর তার প্রতিকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। তিতুমীরের তামাম অনুসারীরা ঐ এলাকার তামাম জমিদারের দুশমনী ও নির্যাতনের মুখোমুখী হলেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার প্রশ্ন সবার জন্যেই প্রবল হয়ে উঠলো। পুজত মল্লিকের মামলা খারিজ হওয়ার পর থেকেই এলাকার সমুদয় জমিদার সংঘবদ্ধভাবে তিতুমীরের আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্যে মাঠে নেমে গেলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে চরম উদ্যোগ ও নেতৃত্ব নিলেন পুরওয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়।

সমস্ত জমিদারদের সাথে পরামর্শ ও সমঝোতা করে কৃষ্ণদেব রায় তাঁর জমিদারীতে কতকগুলো হুকুমজারী করলেন। তাঁর প্রজাদের মধ্যে তিতুমীরের নসিহত সমর্থন ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করলেন। মুসলমান প্রজাদের দাড়ি রাখার উপর মাথা প্রতি বিশ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করলেন। মসজিদ নির্মাণের উপর পাঁচশত টাকা থেকে এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করে মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করলেন। গরু কুরবানী দিলে কুরবানীদাতার দুই হাত কেটে দেয়া হবে বলে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করলেন এবং তিতুমীর ও তার কোন অনুসারীকে আশ্রয় দিলে আশ্রয়দাতাকে তার ভূসম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হবে বলে ঘোষণা দিলেন। অন্যান্য জমিদারেরাও নানারূপ

www.pathagar.com

ঘোষণা ও হুকুমজারিসহ দাড়ি রাখার উপর বাধ্যতামূলক কর ধার্য করলেন এবং সে কর আদায় করা শুরু করলেন।

স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীর সাহেব এ সমস্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। জমিদারদের সাথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আসার জন্যে তিনি সর্ববিধ চেষ্টা চালালেন এবং সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এমন কি মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্যে কৃষ্ণদেব রায়কে তিনি একটি হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রও দিলেন। সে পত্রে তিনি বললেন, কারো সাথে তিনি শত্রুতা করতে চাননা বা কারো কোন ক্ষতি করতেও চান না। ইসলাম মানেই শান্তি। এই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করে তিনি বরং শান্তি প্রতিষ্ঠাই করতে চান।

কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় তাতে কোন কর্ণপাতই করলেন না। উল্টা আরো দাড়ির উপর জরিমানা ও কর আদায়ের কাজে জোরদারভাবে নেমে পড়লেন। এতে করে বিষয়টি আর অপ্রতিহত রইলো না। দু' একজনের নিকট থেকে কৃষ্ণদেব রায় এই কর জোর জবরদস্তি করে আদায় করা শুরু করতেই মীর সাহেবের অনুসারীরা এটাকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন।

ফলে, ঈসায়ী ১৮৩১ সনের ২৭শে জুন তারিখে কৃষ্ণদেব রায়ের কর্মচারীরা সরফরাজপুর গ্রামে দাড়ির উপর কর আদায়ে এলে ঐ গ্রামে বসবাসকারী তিতুমীর সাহেবের অনুসারীরা সম্মিলিতভাবে বাধা দিয়ে কর আদায় বন্ধ করলেন এবং জমিদারের একজন লোককে কিছুক্ষণ আটক করে রাখলেন।

এতে করে কৃষ্ণদেব রায়ের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। সেদিনই সন্ধ্যাকালে তিনি তিনশত পাইক বরকন্দাজ নিয়ে গিয়ে সরফরাজপুর গ্রামের উপর হামলা চালালেন। হামলা চালিয়ে মুসলমানদের বাড়ীঘর লুটপাট করলেন, নীরিহ লোকজনদের মারধোর করলেন এবং গ্রামের নবনির্মিত মসজিদটি পুড়িয়ে দিলেন।

গ্রামের মুসলমানেরা অধিকাংশই তাঁতী। তাঁরা কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে থানায় লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গার নালিশ দায়ের করলেন। থানার হিন্দু দারোগা এই তুচ্ছ তাঁতীদের প্রতি তেমন মনোযোগই দিলেন না। অনেক আরজ অনুরোধ সত্ত্বেও মসজিদ পুড়ানোর ব্যাপারটি তদন্ত করার নামে দারোগা কেবলই কালহরণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণদেব রায় ইতিমধ্যে মীর সাহেবের মুরিদদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক অস্ত্রধারী লোকজন জমায়েত করতে লাগলেন। দারোগাটিও আঠারো দিন পরে এ মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করলেন যে, গ্রামের মুসলমানেরা নিজেরাই মসজিদটি পুড়িয়ে দিয়ে জমিদার বাবুর উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে।

দারোগার এ পক্ষপাতিত্বের জন্যে বাদীরা আবার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু অনেকদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাদীদের পক্ষ থেকেই শান্তি রক্ষার মুচলেকা স্বাক্ষর করে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটও এ মামলা ধামাচাপা দিলেন।

পুজত মল্লিকের নির্যাতন আর এ মসজিদ পুড়ানোর ঘটনার কোন সুবিচার না পাওয়ায় তিতুমীর সাহেবের অনুসারীরা অনেকটা নিশ্চিত হলেন যে, কানুনের আশ্রয় নিয়ে অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও সরফরাজপুরের

www.pathagar.com

মুসলমানেরা শেষ চেষ্টা করার জন্যে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের অনুলিপি নিয়ে কলিকতার আলীপুরে অবস্থিত বিভাগীয় কমিশনারের আদালতে আপিল করার জন্যে হাজির হলেন। আপিল দাখিলে এদের সহায়তা করার জন্যে তিতুমীর সাহেবের একজন প্রতিনিধি ও তাঁর গ্রামাবাসী মুহম্মদ মাসউদ এঁদের সাথে এলেন। কিন্তু বিভাগীয় কমিমনার এ সময় অনুপস্থিত থাকায় তাঁরা আপীল দাখিল করতে পারলেন না। দিনের পর দিন সেই উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করে করে তাঁরা হতাশ হতে লাগলেন।

তিতুমীর সাহেবের লোকেরা যখন কানুনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার আশায় কলিকাতায় অপেক্ষারত রইলেন এদিকে তখন কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর সাহেবের আন্দোলন ও তিতুমীরের সমর্থক মুসলমান প্রজাতের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করার জন্যে ব্যাপক আয়োজন শুরু করলেন। কৃষ্ণদেব রায় এ উদ্দেশ্যে গোবরাগোবিন্দপুর ও লাওঘাটীর প্রতাপশালী জমিদার দেবনাথ রায়, লাটুবাবু নামক কলিকাতার জনৈক গুণ্ডাদলের দলপতি এবং চারপাশের নীলকর সাহেবদের সাথে যোগাযোগ সম্পন্ন করলেন। লাটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে দুইশত দাগী গুণ্ডা কৃষ্ণদেব রায় ও দেবনাথ রায়ের বাহিনীর সাথে শামিল হতে পাঠিয়ে দিলো।

আপীলের জন্যে কলিকাতায় অপেক্ষমান তিতুমীর সাহেবের লোকেরা যখন এ খবর পেলেন, তখন তাঁরা একদম নিশ্চিত হলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান আর একেবারেই সম্ভব নয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং দুশমনদের হামলা প্রতিরোধ করার গরজে, শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। মুহম্মদ মাসউদ সহ সরফরাজপুরের গ্রামবাসীরা আর আপীলের অপেক্ষায় না থেকে কলিকাতা থেকে ফিরে এলেন।

বাহার খাঁ সাহেবের বৈঠকখানায় এ পর্যন্ত বলার পর ফকির মনিরউদ্দীন শাহ একটু দম নিলেন এবং এরপর ফের বললেন—মাসউদ সাহেবেরা এই বছরের অর্থাৎ এই ১৮৩১ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফিরে এলেন। এই অক্টোবরের শুরুতে মীর সাহেব একদল সঙ্গী সাথী নিয়ে নারকেলবাড়িয়া নামক অন্য এক গ্রামে চলে গেছেন। সেখানে তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য ও কিছু লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে তিনি এখন অবস্থান করছেন এবং সেখানেই তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। শক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগ করার বিকল্প কিছু নেই—এ ব্যাপারে মীর সাহেব সহকারে সকলেই এখন একমত। তাই, আগামী ২৩শে অক্টোবর সেখানে তিনি এক ধর্মসভার ডাক দিয়েছেন। সভা শেষে সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে—কিভাবে আর কোন পদ্ধতিতে শক্তি প্রয়োগ করা যায়। সংঘাত হবে বিশাল এক দুশমন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ কারণেই আমরা বেরিয়েছি শক্তি সংগ্রহের কাজে। দ্বীন ও কওমকে হেফাজত করার জিহাদে জিহাদী চেতনা সম্পন্ন ঈমানদার লোকদের আমরা দাওয়াত দিয়ে ফিরছি। কিছু ঈমানদার লড়াকু লোক এখন আমাদের খুবই প্রয়োজন। আপনাদের কাছেও ঐ একই আবেদন নিয়ে আমরা আজ এসেছি। যাঁরা আর যে কয়জন পারুন, আপনারা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ান আর তিতুমীর সাহেবের ২৩শে অক্টোবরের সভায় যোগ দিন—এই আমাদের আরজ।

বৈরী বসতি ১৩১

www.pathagar.com

ইয়ারপুরের বাহার খাঁ সাহেবের বৈঠকখানায় সমবেত লোকজন অবাক বিস্ময়ে ফকির মনিরউদ্দীন শাহ সাহেবের কথাগুলো শুনলেন। করুণ ও বিস্ময়কর এ বিবরণের মাঝে কথা বলার অবকাশ কারো ছিল না। আবেদন জানিয়ে মুনিরউদ্দীন শাহ সাহেব থামলে, দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে উপস্থিত জনতা কলরবে ফেটে পড়লো। তাঁর আহ্বানের প্রেক্ষিতে কয়েকজন নওজোয়ান বিপুল উদ্দীপনা সহকারে বলে উঠলো —যাবো, মোটামুটি সবাই আমরা মীর সাহেবের সভায় গিয়ে জরুর শরিক হবো আর সামর্থবান আমরা যারা আছি, তারা আপনাদের ঐ লড়াইয়েও ঝাঁপিয়ে পড়বো ইনশা-আল্লাহ।

ফকির মুনিরউদ্দীন শাহ ও মিসকীন শাহ সাহেব তৃপ্তকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন— আলহামদুলিল্লাহ।

বাহার খাঁ সাহেব বললেন—আপনাদের দাওয়াত আমরা কবুল করলাম। আপনারা চলে যান। সভার দিনে অনেক লোক তো যাবেনই, দু'চারজনকে নিয়ে আমি তার আগেই ঐ নারকেল বাড়িয়ায় গিয়ে আপনাদের সাথে শরিক হবো। দু' এক দিনের মধ্যেই আল্লাহ চাহেতো রওনা হবো আমরা।

আগন্তুক ফকিরদ্বয় আবার খোশদীলে আওয়াজ দিলেন—আলহামদুলিল্লাহ!

১০

ইয়ারপুরে এসে আবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো সোহরাব হোসেন। বাড়ী থেকে ফিরে সে সরাসরি সাবিহা আরজুদের মকানে এসে হাজির হলো। সাবিহা আরজু বাড়ীতে তখন ছিল না। পাশের বাড়ীতে গিয়েছিল। সাবিহা আরজুর আব্বা-আম্মাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ামাত্রই সোহরাব হোসেন হকচকিয়ে গেল। দেখলো, সাবিহার আব্বা-আম্মাদের মধ্যে মোটেই কোন উষ্ণভাব নেই। সোহরাব হোসেনকে দেখে আগের মতো তাঁরা তো উৎফুল্ল হয়ে উঠলেনই না, বরং এমন ঠাণ্ডা আর বিব্রতভাব দেখালেন, যা সোহরাব হোসেনের আত্মসম্মানে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করলো।

দু' একটা মামুলী কথা বলেই সাবিহা আরজুর আব্বা সেখান থেকে সরে গেলেন। সোহরাব হোসেনকে নিয়ে বসলেন সাবিহা আরজুর আম্মাজান। কোন রকম ভূমিকা না করে শুরুতেই তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—তা বাপু, এরপর তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না। ঢের হয়েছে, আর নয়।

সোহরাব হোসেন বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সেকি! আপনি একথা বলছেন কেন খালা আম্মা?

সাবিহার আম্মা একইভাবে বললেন—বলার প্রয়োজন হয়েছে, তাই বলছি। মেয়ের আমার অল্পদিনেই শাদি দিতে হবে। আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। এমনিতেই অনেক বদনাম রটে গেছে। এরপরও তুমি এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে থাকলে, মেয়ের কি আর শাদি হবে কোথাও, না শাদি কেউ করতে চইবে?

ঃ তার মানে?

www.pathagar.com

ঃ মানে আবার কি ? আমরা ছোটলোক, ছোটজাত, আমাদের ঘর ছোটঘর। আমাদের মতোই ছোটজাত ছোটঘরে মেয়ে পাঠাবো আমরা। তোমাদের মতো বড়জাত বরঘরের দিকে কি আমাদের চেয়ে থাকলে চলবে ?

ঃ খালা আম্মা!

ঃ তোমার আম্মা একটা ওয়াদা করেছিলেন বলেই এতদিন বসেছিলাম। উনি এখন নেই। ঐ মিথ্যা আশায় আর আমরা বসে থাকবো কেন ?

হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দিশেহারা কণ্ঠে সোহরাব হোসেন বললো—এ আপনি কি বলছেন ?

ঃ যা ঘটনা তাই বলছি। আমরা যখন ছোটজাত তখন আর অনর্থক ঐ বড়জাতের ঘরে—

ঃ কে বলেছে আপনারা ছোটজাত ? এ দুনিয়ায় এক একটা জাতি আর এক একজন মানুষ এক এক পেশায় নিয়োজিত আছে। এক সঙ্গে সব কাজ কেউ একা করতে পারে না। কেউ জমি চষে, কেউ জাল ফেলে, কেউ কাপড় বুনোয়, কেউ কাঠের আসবাব বানায়, কেউ হাঁড়ি-পাতিল বা খন্তাবটি গড়ায়। প্রত্যেকের দ্রব্যের সাহায্যে প্রত্যেকে জীবন যাপন করে। এতে মানুষ ছোট হবে কেন ? এদের ছোট বলার অধিকার আছে কার আর সে অধিকার কে কাকে দিয়েছে ?

ঃ সে প্রশ্ন আমাকে করছো কেন ? তোমার বাপ-চাচাদের করোগে ?

ঃ খালা আম্মা!

ঃ ছোটলোক, ছোটজাত, বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা—এমনই নানা কথা বলে তোমার বাপ-চাচারা সাবিহা আরজুর আব্বাকে চোরের অধিক মান অপমান আর হেনস্থা করে ছেড়েছেন। তোমাদের পয়জার বহন করার যোগ্যতাও আমাদের নেই—একথা বলতেও তাঁরা ছাড়েননি।

ঃ সেকি! খালুজান আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন ?

ঃ গিয়েছিলেন বলেই তো এই সুযোগ তাঁরা নিলেন। তোমার আম্মার ইন্তেকালের খবর আমরা বেশ কিছুদিন দেরীতে পাই। খবর পেয়ে উনি তোমাদের মকানে গিয়েছিলেন। ভদ্রতা করে সবার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে অপমানের একশেষ হয়ে ফিরেছেন।

ঃ বলেন কি!

ঃ কথা প্রসঙ্গে তোমার আম্মাজানের ওয়াদার কথা তোলায়, তোমার বাপ-চাচারা তেড়ে এসেছেন আর যারপরনেই অপমান করে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

ঃ আমার আব্বাজানও খালুজানকে অপমান করেছেন!

ঃ অপমান না করলেও সমাদরও কিছু করেননি। স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় তিনি অসহায়, ভাই-ভাই বউদের অনুকম্পার উপর তিনি এখন নির্ভরশীল, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর কিছু করার সাধ্য নেই—ইত্যাদি কয়েকটা মোখতাছার কথা বলে তখনই তাকে বিদায় করে দিয়েছেন। দুদণ্ড বসতেও বলেননি বা একপাত্র নির্জলা পানি দিয়েও মেহমানদারী করেননি।

www.pathagar.com

সোহরাব হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ!

ঃ তোমার চাচারা হাতেই শুধু মারেননি, এই যা। জোলার মেয়েকে জীবনেও বাড়ীতে তাঁরা তুলবেন না বলে সাবিহার আব্বাকে দূর দূর করে তেড়েছেন।

সোহরাব হোসেন সখেদে বললো—একথা তো নতুন কিছু নয় খালা আম্মা? আমার চাচাদের আচরণ বরাবরই হীন আর অমার্জনীয়। এ কারণে তাঁদের সাথে আমার মোটেই মিল নেই। বিরক্ত হয়ে অধিক সময় আমি নানাজানের বাড়ীতে গিয়ে থেকেছি। তাঁদের কথায় আপনারা আমার উপর এত নারাজ হচ্ছেন কেন?

ঃ কেন হবো না বাপু? তোমার সাথে শাদি হলে মেয়ে আমার শ্বশুর বাড়ী পাবে না। ঐ বাড়ীতে উঠতে দেবেন না কেউ তাকে। এমন শাদি কেন দেবো আমরা?

ঃ কিন্তু আমার তো কোন কসুর নেই।

ঃ তা না থাক, আমরা ঘরজামাই রাখতে চাইনে। তোমার সাথে সাবিহা আরজুর শাদি হওয়া মানেই ঘরজামাই রাখা। এর পক্ষপাতী আদৌ আমরা নই।।

ঃ আহ্হা, তা হবে কেন? আমার চাচারা যে যা-ই বলুন, ঐ বাড়ীতে আর সম্পত্তিতে আমারও অংশ আছে। আমি বাপের এক ছেলে। বাপের অবর্তমানে বাপের অংশ গোটাই আমি পাবো। সাবিহা আরজুর সেখানে স্থান হবে না মানে? চাচাদের ধার আর তখন ধারতে যাবো কেন আমি?

সাবিহা আরজুর আম্মা বিরক্তির সাথে বললেন—হুঁঃ! এটা কোন কথা হলো? 'কবে ধরবে ফল তবে ভরবো ডালা'? ঐ আশায় বসে থাকতে মোটেই আমরা রাজী নই। তুমি তোমাদের উঁচুজাতের মেয়ে দেখে শাদি করোগে বাপু। শাদি করে সুখে সন্তোষে জীবন যাপন করোগে। এদিকে আর এসো না।

ঃ খালা আম্মা।

ঃ সাবিহার শাদি তোমার সাথে কখনই আমরা দেবে না। তুমি এখন এসো—

সাবিহার আম্মা বাইরের দিকের খোলা দরজার প্রতি সোহরাব হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে সোহরাব হোসেন লাল হয়ে উঠলো। আর কথা না বাড়িয়ে তখনই সে উঠে দাঁড়ালো এবং নতমস্তকে দরজার বাইরে চলে এলো।

সাবিহা আরজু এর কিঞ্চিৎ আগেই বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। ভেতরের দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে তার আম্মার শেষের কথাগুলো শুনলো। এরপর সোহরাব হোসেনকে বেরিয়ে যেতে দেখেই সে ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ছুটে এলো এবং বাইরের দরজার কাছে এসে সোহরাব হোসেনকে উদ্দেশ করে বললো—দাঁড়ান, যাবেন না। আমার আব্বা আম্মারা যে যা-ই বলুন, সেগুলো আমার কথা নয়। আমি ঠিকই আছি। আমার সংকল্প থেকে আমি এক বিন্দুও টলবো না। তাঁদের কথা শুনে আপনি ঘাবড়াবেন না বা আমাকে ভুল বঝবেন না।

জবাবে সোহরাব হোসেন কিছু বলার আগেই সাবিহা আরজুর আম্মা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—তবেরে হতচ্ছাড়ি। বেহায়া বে-লেহাজ মেয়ে! এমনিতেই জাতকুল অনেক খেয়েছো। আরো খেয়ে মুখে আমাদের চুনকালী দিতে চাও? সর, সর এখান থেকে—

www.pathagar.com

সাবিহাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সাবিহার আম্মাজান সোহরাব হোসেনের মুখের সামনে সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অপমানে সোহরাব হোসেন মাটির সাথে মিশে গেল। দিগদারীতে দিশেহারা হয়ে অতপর সে টলতে টলতে উস্তাদ বাহার খাঁর মকানের দিকে রওনা হলো।

বৈঠকখানার ফাঁকা বারান্দায় বসে আছে নূরউদ্দীন। একা একা বসে বসে ভাবছে। তার পাশের করসীটাতে এতক্ষণ বাহার খাঁ সাহেব বসেছিলেন। মীর সাহেবের জিহাদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। একটু আগে উঠে তিনি বাড়ীর ভেতরে গেলেন। নূরউদ্দীন বসে আছে একা একাই।

বাহার খাঁ সাহেবের সাথে জিহাদে যাবে নূরউদ্দীনও। স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। বাহার খাঁ সাহেব জোর আপত্তিই তুলেছিলেন। সদ্য লড়াই ফেরত নূরউদ্দীনেরা এবার থাক। নসীবের জোরে বালাকোটের ঐ মহামুসিবত থেকে জানে বেঁচে এসেছে—এর জন্যেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই আবার আর এক ঝুঁকির মধ্যে যাক, খাঁ সাহেবের মোটেই এটা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু নূরউদ্দীন নাছোড়বান্দা। জিহাদে সে যাবেই। সঙ্গে যেতে না পারলে, নিজের ভাবেই যাবে সে। তাই অগত্যা রাজী হয়েছেন বাহার খাঁ সাহেব। সবাইকে নিয়ে আগামীকালই রওনা হবেন তিনি। তার সংসার এবার চাচা-চাচীরা সামলাবেন।

একা একা বসে বসে এসব কথাই নূরউদ্দীন ভাবছে। জিহাদে না গেলে যাওয়ার আর তার জায়গাও নেই। বাড়ীতে সবাই ভাল আছেন, এই টুকুই নূরউদ্দীনের সান্ত্বনার জন্যে যথেষ্ট। বাড়ীটা তার জন্যে স্বস্তির আশ্রয় নয়। শাদি করে সংসারী হয়ে সংসারের সাথে মিশে যেতে না পারলে, সেখানে সে অপাংক্তেয়। বালাকোট থেকে ফেরার পর রোকসানাকে শাদি করা সম্ভব হলে, এ সমস্যার অনায়াসেই সমাধান হতে পারতো। বউ নিয়ে বাড়ীতে গেলে লুফেই নিতেন তাকে সবাই। কিন্তু সেটা তো আর হলো না।

এদিকে আবার রোকসানার যা মনোভাব, তাতে রোকসানার আশা একেবারেই বাতিল করে দিয়ে সরে পড়া যায় না। নূরউদ্দীনের জন্যে সে এখন একদম মরীচিকাও নয়। তার নাগাল যে সে পাবেই না, এমনটি আর জোর দিয়ে বলা যায় না এখন। নজর তার অন্যদিকে থাকলেও, নূরউদ্দীনের প্রতি তার দরদ আছে প্রগাঢ়। যাকে সে শাদি করতে আগ্রহী, সে লোকের মন রোকসানার দিকে নেই। আছে অন্য মেয়ের দিকে। এমতাবস্থায় ধাক্কা খেয়ে রোকসানার ফিরে আসার প্রশ্নটা অবাস্তব কিছু নয়। অনেকটাই স্বাভাবিক পেকে উঠেছে পরিস্থিতি। পরিণতি আর খুব একটা দূরে বলে মনে হয় না। তাই, এখন কেবল ধৈর্য ধারণের পালা। অতপর কি ঘটে, কোথাকার পানি কোথায় গড়িয়ে পড়ে, তা দেখার জন্যে এখন অপেক্ষা করার পালা।

সর্বোপরি, আদর্শগত দিক দিয়েই জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে নূরউদ্দীন বাধ্য। জিহাদকে জিয়িয়ে রাখার তৎপরতায় নিয়োজিত থাকাটা তার নৈতিক দায়িত্ব। ঘালাকোটের নিয়াতের সাথে বেঈমানী করতে সে পারে না। দেশ ও দ্বীনের এই

www.pathagar.com

নিদারুণ দুর্দিনে মুহব্বতের খোয়াবই তার কাছে আর আগের মতো পরম বস্তু নয়। বাঁশী বাজিয়ে কেবলই প্রিয়াকে খুঁজে বেড়ানোর সে মন-মানসিকতা আজ আর তার নেই। চরম এক দায়িত্ববোধ স্থান নিয়েছে সেখানে। রোকসানাকে শাদি করা সহজ সাধ্য হলেও, জিহাদ পরিহার করা সম্ভব তার ছিল না। বউ ফেলে যেতেই হতো জিহাদে। বিবেকের তাড়নাতেই ছুটতে হতো তাকে। সুতরাং সকল দিক দিয়েই যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তার সঠিক সিদ্ধান্ত। এর বিকল্প আর নেই।

"আসসালামু আলাইকুম দোস্ত"—

চমকে উঠলো নূরউদ্দীন। নতমস্তকে তন্ময় হয়ে সে বসে থেকে ভাবছিল। চেনা আওয়াজ কানে যেতেই চোখ তুলে দেখে, তার সামনে সোহরাব হোসেন। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিচ্ছে সোহরাব হোসেন। চেহারা তার ঝড়ের কাকের বাড়া।

"ওয়াআলাইকুমুস সালাম", বলে লাফিয়ে উঠলো নূরউদ্দীন। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো আরে একি! দোস্ত যে! ফিরে এসেছেন? বহুত খুব-বহুত খুব! আসুন-আসুন—

হাত বাড়িয়ে নূরউদ্দীন সোহরাব হোসেনকে বারান্দার উপর তুলে নিলো। পাশের কুরসীতে বসিয়ে ফের প্রশ্ন করলো—বাড়ী থেকে কখন বেরিয়েছেন? চেহারা আপনার এতটা কাহিল দেখাচ্ছে কেন? আঘাতটা সামলিয়ে নিতে পারেননি বুঝি?

সোহরাব হোসেন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—না দোস্ত, সে মত্তকা আর পেলাম না।

পেলেন না? না-না, তা বললে হবে কেন? আপনি জ্ঞানী লোক, এলেমদার মানুষ। দুনিয়া ছেড়ে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। একথাটা মনে আনলে তো মাতৃবিয়োগের ব্যথা আপনার অনেকখানি লাঘব হয়?

ঃ ব্যথার উপর ব্যথা লাগলে, ব্যথা আর লাগব হয় কি করে, বলুন? এ ধাক্কা সামলাতে বেশ কিছুদিন লাগবে আমার।

ঃ ঠিক বুঝলাম না তো। ব্যথার উপর ব্যথা বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন আপনি?

ঃ বলছি সাবিহা আরজুর কথা। তাকে শাদি করার মওকা আমার থাকলে তামাম শোক সামলে নিতে পারতাম। কিন্তু এই মাত্র সেখান থেকে জব্বার এক ঘা খেয়ে এলাম।

নূরউদ্দীন ফের চমকে উঠে বললো—ঘা খেয়ে এলেন মানে?

ঃ সাবিহা আরজুর আম্মা আমার মুখের সামনে তাদের বাড়ীর দুয়ার সশব্দে বন্ধ করে দিলেন!

ঃ সে কি!

ঘটনাটা আগাগোড়া শুনানোর পর সোহরাব হোসেন দুঃখ করে বললো—ইয়ারপুরে পৌঁছেই এখানে না এসে বড় আশা নিয়ে আগে সাবিহা আরজুদের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। আমি সহিসালামতে ফিরে এসেছি—এ জন্যে তাঁরা খুশী হবেন, এই আশা। কিন্তু গিয়ে এ আক্কেল সেলামী নিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

ঘটনা শুনে নূরউদ্দীন স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলো না। পরে সে দম ছেড়ে ধীরে ধীরে বললো—ঘটনাটা সত্যিই বড় করুণ। এমনটি সহ্য করাও কঠিন, চিন্তা করতেও কষ্ট হয়। একটা মস্তবড় দুর্ঘটনাই বটে।

ঃ তাহলেই বুঝুন?

ঃ তবে দুর্ঘটনা হলেও আপনার খুব ভেঙ্গে পড়ার কারণ নেই ইয়ার। মূলটা তো খোয়া যায়নি আপনার।

ঃ কি রকম?

ঃ আসলটা ঠিকই আছে। উপরিটাই বলতে পারেন মারা গেল কেবল। অর্থাৎ, আরজু বহিনের আব্বা-আম্মাদের মুহব্বতটাই আপাতত হারালেন।

ঃ দোস্ত!

ঃ সাবিহা আরজু বহিনের কথাগুলো খেয়াল করছেন না কেন? তিনি তো আপনার সাথে কোন বেঈমানী করেননি? বরং আপনার প্রতি তাঁর মুহব্বত যে অটুট-অক্ষয়, একথা তিনি ঐ অবস্থার মধ্যেও জানিয়ে দিয়েছেন। আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সহজভাবে যেটা হতে পারতো, সেটা খানিক জটিল হয়ে গেল, এই আর কি?

ঃ কিন্তু ইয়ার, তার বাপমায়েরা যারপর নেই বৈরী হয়ে গেলে সে আর খাড়া থাকবে কতদিন?

ঃ বেঁচে থাকবেন যতদিন, ততোদিন। আপনার মুখে এ যাবত যা শুনে আসছি, তাতে আমি নিশ্চিত যে, আপনার প্রতি আরজু বহিনের মুহব্বত কাঁচের মতো ঠুন্‌কো কিছু নয়, ইস্পাতের মতো শক্ত বস্তু। আছাড়ালেই কি ভাঙ্গে এটা?

ঃ সান্ত্বনা দিচ্ছেন ভাই সাহেব? সে মেয়েছেলে। তার আব্বা-আম্মারা তাকে যদি ধরে বেঁধে অন্য কোথাও শাদি দিতে বসেন, তাহলে তার আর করার থাকবে কি? পালাবে সে কোন্ পথে?

নূরউদ্দীন পত্যয়ের সাথে বললো—রোকসানা ফিরদৌস্ যে পথে পালিয়েছে, সেই পথে।

সচকিত হয়ে উঠে সোহরাব হোসেন আওয়াজ দিলো—দোস্ত!

নূরউদ্দীন পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বললো—চোখের উপর এমন দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন? আমার পূর্ণ বিশ্বাস ঈমান তাঁর ঠিক আছে, মুহব্বত তাঁর পবিত্র। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে একটা পথ করে দেবেনই। অধৈর্য হচ্ছেন কেন?

ঃ তা কথা হলো—

ঃ ইন্নাল্লাহা মা-আস্‌সবেরীন। ধৈর্য ধরুন। একভাবে না একভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ।

সোহরাব হোসেন আর কথা বলতে পারলো না। প্রতিবাদ করার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে খামুশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো—তা আপনার এদিকের খবর কি ইয়ার? রোকসানার ব্যাপারটা বুঝতে কি কিছু পারলেন? তার ব্যাপারে কি ধারণা ইতিমধ্যে আপনার হয়েছে?

ঈষৎ হেসে নূরউদ্দীন পুনরায় আওয়াজ দিলো— ইন্নাল্লাহা মা- আস্‌সবেরীন।

www.pathagar.com

উৎসাহিত হয়ে উঠে সোহরাব হোসেন বললো—অর্থাৎ ব্যাপারটা কি তাহলে—

ঃ আপনার মতো ঐ প্রতিক্ষার ব্যাপার। অর্থাৎ, কি ঘটে তা দেখার জন্যে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করার ব্যাপার।

ঃ জট পাকিয়ে ফেললেন যে ? কি ঘটে কথাটা কি ? তার সেই গোপন লোকটা কে ? আপনিই নাকি ? মানে, এ রকম কোন আভাস-ইংগিত পেয়েছেন নাকি ?

ঃ আরে দূর-দূর। কি যে সব আপনাদের কল্পনা।

ঃ তাহলে ?

ঃ সে জন অন্যজন। আপনারা এ যাবত যা ধারণা করে আসছেন, সেইটেই ঠিক। তার মন আছে অন্যদিকে। তবে যার দিকে মন আছে রোকসানার, সে লোকের মন আবার রোকসানার দিকে নেই। আর এক মেয়ের প্রেমে সে লোক পাগল। এবার বুঝুন ঠ্যালা।

হকচকিয়ে গিয়ে সোহরাব হোসেন বললো—এ আবার কি বলছেন ?

ঃ বুঝলেন না ? "আমার প্রাণনাথ আনজনের বাড়ীত্ যায়" ব্যাপারটা এই কাজেই, প্রাণনাথ আন্জনের বাড়ীতে গিয়ে ঐ আন্জনের সাথেই ঘর বেঁধে বসে কিনা, আর তা বসলে রোকসানার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হয়, এইটেই এখন দেখার পালা।

ঘটনাটা উপলব্ধি করে দুঃখের মধ্যেও সোহরাব হোসেন পুলকিত হয়ে উঠলো। বললো—বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! দারুণ রহস্য পয়দা হয়েছে! কিন্তু আপনি এ তথ্য কোথায় পেলেন ?

ঃ ঐ রোকসানা বেগমের কাছেই।

ঃ মা'শা আল্লাহ! এতটা এগিয়েছেন ? সাব্বাস! তাহলে তার সেই প্রাণনাথটা কে, সে কথা রোকসানা বলেনি ? মানে, আপনি তা জানতে চাননি ?

ঃ চেয়েছি। কিন্তু জবাব্ পাইনি। বড় শক্ত মেয়ে। তার নিকট থেকে সে জবাব আদায় করা সহজ কাজ নয়।

ঃ দোস্ত্ !

ঃ অতএব ধৈর্য ধরুন এবং অতপর কি ঘটে তা স্থির চিত্তে অবলোকন করুন—

উভয়ে হেসে উঠতেই বাহার খাঁ সাহেব ভেতর থেকে ফিরে এলেন। সোহরাব হোসেনকে দেখে তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—আরে সোহরাব মিয়া যে! কখন এলে ? বাড়ীতে আর সবাই ভাল আছেন তো ?

সালাম বিনিময় অন্তে সোহরাব হোসেন ম্লান কণ্ঠে বললো—জি, অন্যেরা সকলেই ভাল আছেন। কেবল আম্মাজনই আমাকে ছেড়ে—

সোহরাব হোসেন থেমে গেল। সমবেদনা জানিয়ে বাহার খাঁ সাহেব বললেন—বড়ই দুঃখের ব্যাপার। খবরটা শুনে আমরাও অনেকখানি দুঃখবোধ করেছি। বিশেষ করে তুমি যখন বাড়ীতে নেই—

ঃ জি, সেইটেই বড় আফসোস্!

ঃ কথাটা তাই-ই। তবে আফসোস্ করে আর কি করবে, বলো ? যার যখন

www.pathagar.com

যাওয়ার সময় হবে তখন তাকে যেতেই হবে। কাজেই আফসোস্‌টা যত শিগ্গির সামলে নেয়া যায়। ততই কল্যাণ।

ঃ জি-জি। সে তো ঠিকই।

ঃ এরই মধ্যে তোমাকে একটা নতুন খবর দেই। সময় অল্প, তাই এখনই বলছি। আমরা আবার জিহাদে যাচ্ছি। আমরা মানে, আমি, নূরউদ্দীন আর আরো কয়েকজন।

ঃ সেকি! কবে? কোথায়?

ফকির মুনিরউদ্দীন সাহেবদের দাওয়াত আর তিতুমীর সাহেবের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিয়ে বাহার খাঁ সাহেব বললেন—আ'ামীকালই ইনশাআল্লাহ রওনা হবো আমরা। তোমাকে পেয়ে ভালই হলো। খবরটা তোমাকে জানিয়ে যেতে পারছি।

এই তো মওকা! ক্ষত শুকানোর এই তো সুযোগ! এই মুহূর্তে এই তো পরম অবলম্বন! অল্প একটু চিন্তা করেই সোহরাব হোসেন বললো—জানিয়ে যাবেন কি উস্তাদ? আমিও তাহলে আপনাদের সাথে যাবো।

বাহার খাঁ সাহেব থতমত করে বললেন—তুমি? না-না, তা কি করে হয়? সবে এক লড়াই থেকে ফিরেছো, তার উপর শোকে তাপে তোমার এখন বড়ই পেরেশান অবস্থা। তুমি যাবে কি?

সোহরাব হোসেন ইতিমধ্যেই তার সিদ্ধান্তে, আরো শক্ত হয়ে গেল। বললো—জি না উস্তাদ, পেরেশানী কিছু থাকলেও আমি যাবো। আপনারা আমাকে সঙ্গে না নিলে, পেরেশানী আমার আরো বাড়বে বৈ কমবে না। কাজেই মেহেরবানী করে আর আপত্তি করবেন না।

অনেক সমঝানোর পরও সোহরাব হোসেন হাল কিছুতেই ছাড়লো না। বাড়ীর প্রতি সোহরাব হোসেনের বিরাগের কথা শুনে আর জিহাদের প্রতি সবার এদের আত্মনিবেদনের দিক বিবেচনা করে, বাহার খাঁ সাহেব অবশেষে সোহরাব হোসেনকেও সঙ্গে নিতে রাজী হলেন।

এরপর বাহার খাঁ সাহেব আবার একটু উঠে গেলেন। ফাঁক পেয়ে নূরউদ্দীন সোহরাব হোসেনকে প্রশ্ন করলেন—কি দোস্ত শেষ পর্যন্ত আপনিও সঙ্গী হলেন আমাদের?

সোহরাব হোসেন হেসে বললো—কি করবো বলুন? ঘরেও সুখ নেই, বাইরেও মুখের সামনে দুয়ার সবাই বন্ধ করে দেয়। জিহাদের মতো এমন বান্ধব আর কে আছে দুনিয়ায়? কাজেই জিহাদ জিন্দাবাদ।

ঃ আচ্ছা!

ঃ তাছাড়া, আবার যখন প্রতিক্ষায় থাকার পালা, সময়ের দহন নিবারণে জিহাদই সর্বোত্তম দাওয়াই।

নূরউদ্দীন সোল্লাসে বলে উঠলো—ওঃ! খাশা—খাশা!

পরের দিনই এদের নিয়ে রওনা হলেন বাহার খাঁ সাহেব।

নূরউদ্দীন আর সোহরাব হোসেন ছাড়াও আরো জনাতিনেক উৎসাহী মুজাহিদ

www.pathagar.com

তাঁর সাথে রওনা হলেন। মুজাহিদ বরকতুল্লাহও তাঁদের সাথে শরিক হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাহার খাঁ তাকে রেখে গেলেন। রেখে গেলেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। মীর সাহেবের সভার দিনে সভাতে যাঁরা যোগ দিতে আগ্রহী, তাঁদের গুছিয়ে জুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বরকতুল্লাহকে দিয়ে গেলেন।

আবার জিহাদে যাওয়ার কথা শুনে চমকে গেল রোকসানা। শুনার পর থেকেই বুক তার অবিরাম দুরু দুরু করতে লাগলো। প্রকাশ করাও যায় না, সহ্য করাও যায় না—এমনই এক অস্বস্তিতে সময় কাটতে লাগলো তার। নূরউদ্দীনকে বারণ করবে, জোর করে আটকিয়ে দেবে—সে ছাড় বা মওকা তার নেই। নীরবে দগ্ধ হওয়া ছাড়া তার কোন ভূমিকা নেই এখানে। এ ব্যাপারে সে শুধুই নীরব দর্শক।

বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে সবাই যখন বেরুলেন, রোকসানা ছুটে এসে দেউটিতে দাঁড়ালো। চোখ ফেরালো নূরউদ্দীন। রোকসানার চোখের সাথে আটকে গেল চোখ। সে দেখলো, মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পাটনার পথে রওনা হওয়ার দিনে রোকসানা যেভাবে এসে দেউটিতে দাঁড়িয়ে ছিল, আজও সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে দেউটিতে। চোখ তার আরো বেশী আদ্র, মুখ তার আরো অধিক করুণ!

বাহার খাঁ সহেবরা নারকেল বাড়িয়ার মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে এসে পৌছলে ফকির মিস্কীন শাহ দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। পরম খোশে সবার সাথে সালাম বিনিময় ও মোসাফেহা করে মিস্কীন শাহ সবাইকে তিতুমীর সাহেবের কাছে নিয়ে এলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় পেয়ে তিতুমীর সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন। কাছে ডেকে সবাইকে বসিয়ে তিনি আবেগভরে বললেন—আপনারা বেরেলভী হুজুরের লোক। বড় পবিত্র মানুষ। আমাকে মদদ দিতে আপনারা তো আসবেনই। একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের মুসিবতে সাড়া দেবেন—এইটেই তো মুসলমানের ঈমানী পরিচয়।

বাহার খাঁ সাহেব সলজ্জভাবে বললেন—জনাব! তিতুমীর সাহেব বলেই চললেন—কিন্তু আফসোস, এতদসত্ত্বেও কওমের ইজ্জত সমুন্নত রাখার প্রতি আমরা অনেকেই বড় উদাসীন। এই ঈমানী দায়িত্ব পালন করার প্রতি আমাদের অনেকেরই আগ্রহের বড় অভাব। আপনারা এ ব্যাপারে উষ্ণ আগ্রহ দেখিয়েছেন। সুদূর এলাকা থেকে ছুটে এসেছেন এখানে। এ জন্যে আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি আর আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনাদের সকলের সার্বিক ভালাই কামনা করছি।

বাহার খাঁ বিনীত কণ্ঠে বললেন—জনাব আমাদের শরমিন্দা করছেন।

এর জবাবে মীর সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—না না, শরম পাওয়ার মতো কোন অপ্রাসঙ্গিক কথাই আমি বলিনি। সাইয়্যীদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) আমারও মুর্শিদ। সরাসরি না হলেও, তাঁর ভাবাদর্শের আমি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত হেফাজত করার জন্যে উদাত্ত আহবান জানালেন তিনি। তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন কেবলই কিছু দেশ প্রেমিক সাধারণ লোকেরা। যাদের হাতে শক্তি ছিল আর আজও শক্তি আছে, এ মুসলিম জাহানের সেসব রাষ্ট্রপতিরা কেউই

www.pathagar.com

সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন না। যদি আসতেন, আমাদের কওমের ইজ্জত অনেক উপরে উঠে যেতো। দ্বীন ও দেশের দুশমনেরা আজ থরথর করে কাঁপতো। তাঁদের এই গাফিলতির জন্যে শির উঁচু করে বেঁচে থাকার তোরণদ্বারে এসে আবার আমরা সকলের পায়ের তলে পড়ে গেলাম।

ঃ জনাব।

ঃ আমরা সাধারণ মানুষ। কোন সামরিক শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমাদের দুশমনেরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি। দেশী বিদেশী সকলেই কমবেশী সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। এ রাজশক্তির মোকাবেলায় আমাদের কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তি কোথাও থেকে এসে পাশে আমাদের না দাঁড়ালে, আমরা কিছু বেসামরিক ভাসমান লোক সহজে পেরে উঠবো কেন, বলুন ? ঈমানী চেতনা না থাকায় দেশের তামাম মুসলিম জনতা কোন ময়দানেই এসে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আমাদের অতীত তা বলে না।

বাহার খাঁ সাহেব সমর্থন দিয়ে বললেন—জি-জি। সেই জন্যেই ফকির মজনু শাহ সাহেবেরা পারেননি। কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তি এসে পাশে তাঁদের দাঁড়ায়নি। বেরেলভী হুজুরও পারলেন না। বেঈমানী করা ছাড়া কোন শক্তি তাঁর সহায় হলো না। অল্প কিছু বেসামরিক লোক নিয়েই লড়তে হলো তাঁকে। আর সে জন্যে কামিয়াবীর দ্বারপ্রান্তে এসেও তাঁর প্রচেষ্টা করুণভাবে বিফল হয়ে গেল।

ঃ আমার পরিকল্পনা অতবড় নয়। আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে আর স্বকীয়তা বজায় রাখার পথে হিংসুটে জমিদারদের প্রতিবন্ধকতা রোধ করাটুকুই আমার লক্ষ্য। এর অধিক আমি চাইনে।

বাহার খাঁ সাহেব এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করলেন ওদের সাহায্যে যদি ইংরেজ প্রশাসন ময়দানে নেমে আসে তখন তাহলে জনাবের পদক্ষেপ কি হবে ?

তিতুমীর সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—তবুও যথাসম্ভব লড়ে যেতে হবে। এমনটি হলেও লড়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। বার বার বিফল হওয়া সত্ত্বেও আর একের পর এক প্রাণ দেয়ার পরও , মুসলমানদের সামনে এখন লড়ে যাওয়ার বিকল্প নেই।

ঃ জনাব!

ঃ সহজ বিজয় আমরা পলাশীর ময়দানেই বিকিয়ে দিয়েছি। জয়ের আশা এখন আমাদের ক্ষীণ। তবু আমরা লড়ছি, লড়তে আমাদের হচ্ছে, লড়তে আমাদের হবে। প্রতিরোধের প্রক্রিয়া ঝিমিয়ে পড়লে চলবে না। কেন জানেন ? নিদারুণ এক বৈরী পরিবেশে বসত করছি আমরা। শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে অসহায় মৃগ শিশুর বসত করার মতো আমাদের এই বসবাস আমাদের জন্যে অত্যন্ত বিপদাকীর্ণ। সংগ্রাম পরিহার করে এখন যদি ঘুমিয়ে পড়ি সবাই আমরা, চোখের পলকে সবাই বিলীন হয়ে যাবো। আমাদের কওমের কোন অস্তিত্বই আর এদেশে থাকবে না। ঐ মৃগ শিশুর মতোই আমাদের হিংস্র দুশমনেরা থাবা মেরে গিলে ফেলবে আমাদের , এই লালসায় চারপাশে ব্যাদান মেলে আছে তারা। সকলেই দুশমন। আমাদের জন্যে 'আহা' বলার আর এখানে কেউ নেই।

www.pathagar.com

ঃ জি জনাব, জি-জি। একেবারেই বাস্তব কথা।

ঃ অস্তিত্বের প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে প্রকট। অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আমাদের লড়তে হবে অবিরাম। বৈরী পড়শীদের এক ঘা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবার আর এক ঘা দিতে পারলেই এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে আমাদের কওম। অন্য কথায়, দুশমন পড়শীদের সাথে লাঠালাঠি হাতাহাতি নিরলস চালিয়ে যেতে পারলে, দলে দলে প্রাণ দেয়ার পরও লাঠির বদলে লাঠি গর্জে উঠলে, তবেই ক্ষত বিক্ষত হয়েও কওমী কিস্তি আমাদের ভাসমান থাকবে। চাইকি, আল্লাহর মর্জি, হলে এভাবে ভাসতে ভাসতে একদিন নিরাপদ বন্দরেও পৌছে যেতে পারবে। হাল ছাড়লেই ভরাডুবি। অথৈ সাগরের অতলতলে তলিয়ে যাওয়াই হবে তাহলে এই কওমের একমাত্র পরিণতি। এর কোন নাম নিশানাই থাকবে না। দ্রাবিড়দের নেই যেমন, এই দেশে আমাদেরও ঐ দশাই হবে।

ঃ তাজ্জব! জনাবের এমন বাস্তব আর সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি—

ঃ তিক্ত অভিজ্ঞতার নিরন্তর দহনেই এই দৃষ্টি খুলে গেছে আমার। শান্তিপূর্ণ সমাধানের তামাম রাহা আমাদের সামনে বন্ধ।

মীর সাহেব এবার একটু থামতেই ফকির মিস্‌কীন শাহ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— জনাব, বহুদূর থেকে পেরেশান হয়ে এসেছেন এরাঁ। আগে এঁদের বিরামের বড় প্রয়োজন ছিল।

হুঁশে এসেই তিতুমীর সাহেব শশব্যস্তে বলে উঠলেন ওহহো, তাইতো! কি মুসিবত—কি মুসিবত! একথা আমি খেয়ালই করিনি। যান-যান, এদের নিয়ে গিয়ে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করুন। জরুর এদের বিশ্রাম আগে দরকার।

২৩শে অক্টোবর যথাসময়ে তিতুমীর সাহেবের ধর্মীয় সভা অর্থাৎ ইসলামিক জালসা শুরু হলো। বাইরের লোক ছাড়াও, চারপাশের গ্রামে বসবাসকারী পাঁচ শতেরও অধিক মীর সাহেবের সরাসরি মুরিদ এসে এ সভায় সমবেত হলেন। ফকির মিসকীন শাহ ও মুনিরউদ্দীন শাহর সাথে আরো কিছু ফকির এসে এ সভায় যোগ দিলেন। বাহার খাঁ সাহেবের ইয়ারপুর থেকেও বেশ কিছু লোক এসে সভায় শরিক হলেন। এঁদের নিয়ে মুজাহিদ বরকতুল্লাহর আসার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ এক কারণে সে আসতে পারলো না।

যথানিয়মে ওয়াজ নসিহত চললো। তৌহিদের নীতিমালা আঁকড়ে ধরে শিরক-বিদাত পরিহার করে মুসলমানদের আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে, ঘুমিয়ে পড়া বেহুঁশ এ কওমকে পুনর্জাগরিত করে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজ গড়ে তুলতে হবে —এই মর্মে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য রাখলেন মীর সাহেবসহ আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভা শেষে সভাস্থলেই সীমিত আকারের বৈঠকে জমিদারদের দুশমনীর উপর আলোকপাত করা হলো। বিগত ঘটনা ও দুর্ঘটনাগুলো এক এক করে বর্ণনা করলেন মীর সাহেব। জমিদারদের সাথে প্রীতিপূর্ণ সমঝোতায় আসার জন্যে তাঁর যথাসাধ্য

www.pathagar.com

চেষ্টার কথাও মীর সাহেব তুলে ধরলেন। এরপর, কানুনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার তামাম চেষ্টা একের পর এক ব্যর্থ হওয়ার ঘৃণ্য কাহিনী ও কারণগুলো ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন।

এসব কথা শুনে হাজেরান মজলিস অতিশয় মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তবুও প্রথমে সবাই স্থির মস্তিষ্কে অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করলেন। বিকল্প হাতড়ালেন। কিন্তু কোন বিকল্প না থাকায় শক্তির বদলে শক্তি, অর্থাৎ লাঠির বদলে লাঠি হাঁকানোর ব্যাপারে সকলেই নিরঙ্কুশভাবে এক মতে পৌছলেন। সিদ্ধান্ত হলো, অতীতে যা হবার তা হয়েছে। এরপর আর একটা কাঁটার আঁচড় লাগালেও ছেড়ে কথা নেই। তার দাঁতভাঙ্গা জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে তবে কথা। সিদ্ধান্ত ও করণীয় নিশ্চিত করে রেখে, পরের দিন সভার লোকজন নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। কয়েকজন বাদে, ইয়ারপুরের লোকেরাও ইয়ারপুরে ফিরে এলেন। ফকিরদের কয়েকজন, ইয়ারপুরের কয়েকজনসহ বাহার খাঁ সাহেব ও আরো কিছু বহিরাগত স্বেচ্ছাসেবক মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে মেহমান হয়ে রয়ে গেলেন।

১১

যাঁরা যাবার, মীর সাহেবের ধর্ম সভার লোকেরা তাঁরা সবাই সকালের দিকেই চলে গেলেন। সেই দিন বিকেলে নূরউদ্দীন সহকারে ইয়ারপুরের কয়েকজন মেহমান মুইজউদ্দীন বিশ্বাস সাহেবের বাড়ীর পাশে ফাঁকা ময়দানে এসে জটলা করে বসলো আর হাওয়া বাতাস খেতে খেতে গল্প-আলাপ জুড়ে দিলো। এই গল্পের মাঝে নূরউদ্দীন ইয়ারপুর থেকে পরে আসা বসিরউদ্দীন নামের এক নওজোয়ানকে প্রশ্ন করলো—তা ব্যাপার কি ভাই সাহেব ? বরকতুল্লাহর কি হয়েছে ? আপনাদের সাথে তারও আসার কথা ছিল। সে এলো না কেন ?

জবাবে বসিরউদ্দীন গম্ভীরকণ্ঠে বললো—বরকতুল্লাহর ? মানে, আপনাদের সাথে বালাকোট ফেরত ঐ মুজাহিদ বরকতুল্লাহর ?

ঃ জি- জি। তার সম্বন্ধে উস্তাদ বাহার খাঁ সাহেবকে কি কি যেন বললেন আপনারা। হৈহুল্লোড়ের মধ্যে শুনতে কিছু পাইনি। কি বললেন উস্তাদ জীকে ?

ঃ যা ঘটনা মোটামুটি সবই তাঁকে বলেছি। বরকতুল্লাহর আসার সাধ্য নেই।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ সে এখন বাঁচে না মরে, এই হালতে বিছানায় পড়ে আছে। এখানে আসবে কি করে ?

ঃ সে কি! হঠাৎ কি বিমারে পড়ে গেছে ?

ঃ জিনা। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে জান হারাতে বসেছে। ঐ যে কথায় বলে, "কেউ যায় মরতে আর কেউ যায় ধরতে"। এক বেহুদা আউরাতের বেহুদাপনার খেসারত ঠেকাতে গিয়ে নিজেই এখন সে মউতের সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

ঃ বলেন কি! ব্যাপারটা খুলে বলুন তো ?

www.pathagar.com

ঃ আপনাদের পাড়ার, মানে আপনি যে বাড়ীতে থাকেন সেই খাঁ সাহেবের পাড়ার সিতারা। সিতারা বানু বেগম। জেকের আলীকে নিয়ে সে কি তার মাতামাতি আর তার বাপমায়ের সেকি বড় বড় কথা! জেকের আলীর খানিকটা জোত ভুঁই আছে। ওদিকে আবার লাঠি চালানোর খ্যাতিও তার অনেক খানি। সেই জেকের আলী সিতারাকে শাদি করতে আগ্রহী—এই গরবে তাদের কারো পা পড়ে না মাটিতে। আজ-না-কাল আজ-না-কাল করে জেকের আলী শেষ পর্যন্ত সিতারাকে এমন শাদিই করেছে যে, তার তারিফ সামলাতে এখন তারা গোষ্ঠী সমেত অস্থির।

ঃ বসিরউদ্দীন সাহেব!

ঃ এখানে আসার জন্যে আমরা যেদিন রওনা হলাম, তার দিন তিনেক আগের কথা। সাঁঝের দিকের ঘটনা। দক্ষিণ পাড়ার আদু শেখ পড়িমরি সিতারাদের বাড়ীতে এসে ডাক হাঁক জুড়ে দিলো। সিতারার বাপ তখন মকানে ছিলো না। সিতারার মা বেরিয়ে এলে, আদু শেখ ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আপনাদের সিতারা এখন বাড়ীতে আছে কিনা, খোঁজ নিয়ে দেখুন তো।

সিতারার আচরণ আর চলাফেরা নিয়ে আজকাল নানাজন নানা কথা বলে। সিতারার বাপ-মাকেও পাঁচকথা শুনায়। এ কারণে তারা বড় নাখোশ। সিতারাকে নিয়ে কেউ কিছু বলতে আসুক—এটা তারা চায় না। আদু শেখের প্রশ্নের জবাবে সিতারার মা উষ্মার সাথে বললো—কেন, সিতারাকে আপনার কি দরকার?

আদু শেখও মুখভাঙ্গা মানুষ। হক কথা বলতে সে বাপকেও ছাড়ে না। সেও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত কণ্ঠে বললো—আমার কোন দরকার নেই। দরকার আপনাদেরই। বিপদ হলে আপনাদেরই হবে, আমার হবে না।

ঃ বিপদ! বিপদ হবে কেন? সিতারা আমাদের জেকের আলীর বাড়ীতে গেছে বিকেলে। বেশ কিছুদিন জেকের আলী বাড়ীতে ছিল না। গতকাল না পরশু সে অসুখ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছে। সেই খবর শুনেই জেকের আলীকে দেখতে গেছে সিতারা।

ঃ ব্যস্! কম্মকাবার! এখন তো সাঁঝ। এখনও ফেরেনি?

ঃ তাতে কি হয়েছে? রাত হলেই বা কি? জেকের আলী থাকতে তার কি ভয়ের কিছু আছে? কাউকে না কাউকে দিয়ে জেকের আলীই পাঠিয়ে দেবে তাকে।

ঃ জেকের আলীই পাঠিয়ে দেবে? জেকের আলীর বাড়ী এখন একদম খালি। বালবাচ্চা নিয়ে তার বাড়ীর সবাই ঐ পাশের গাঁয়ে শাদির দাওয়াতে গেছে। শেষ রাতের আগে তারা কেউ ফিরে আসতে পারবে না, তা জানেন?

ঃ ওমা সেকি! রুগী মানুষ ফেলে সবাই বিয়ের দাওয়াতে গেছে? তাহলে তো সিতারা গিয়ে ভালই করেছে। রুগীর তয় তদবিরের একটা ব্যবস্থা করে রেখে আসতে পারবে।

ঃ রুগী! রুগী কে? জেকের আলীর অসুখ হয়েছে, কে বললে?

ঃ হয়নি, আহা, বেশ-বেশ! এটা আরো ভাল খবর। রুগী মানুষ, অথচ বাড়ীতে কেউ নেই—বেচারাকে এমন বিপদে পড়তে হয়নি।

www.pathagar.com

ঃ কিন্তু আপনার মেয়ের তো তাতে মহা বিপদ হতে পারে।

ঃ কেন, আমার মেয়ের বিপদ হবে কেন ? আপনি কি বলতে চান ?

ঃ আদু শেখের গায়ে জ্বালা ধরে গেল। কোনমতে আত্মসম্বরণ করে সে বললো কি বলতে চাই মানে ? পড়োবাড়ীর মতোই ঐ খালি বাড়ীতে মেয়ে গেল আপনার। আর আমি কি বলতে চাই তা আপনি এখনও বুঝতে পারেননি ?

সিতারার মা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো—কেন পারবো না ? পারবো না কেন ? আমার মেয়ের আর জেকের আলীর দুর্নাম রটাতে আপনারা সবাই যেভাবে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাতে কি বুঝতে কিছু বাকি আছে আমার ?

ঃ এ আপনি কি বলছেন ?

ঃ পাড়ায় পাড়ায় দুর্নাম রটিয়েও সুখ হয়নি আপনাদের। বাড়ীর উপর বয়ে এসে দুর্নাম গাইতে শুরু করেছেন। আপনাদের কি আমি চিনিনে ? সোনার ছেলে জেকের আলী। তার সাথে আমার মেয়ের শাদি হোক, এটা কেন সইতে পারবেন আপনারা ?

আদু শেখ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অপরিসীম বিস্ময়ে সে বললো—তাজ্জব ব্যাপার! আমি এলাম আপনাদের ভালর জন্যে—

মুখ ঝামটা মেরে সিতারার মা বললো—ভালর আমার দরকার নেই। আপনি এক্ষুণি চলে যান। বেরিয়ে যান আমার সীমানা থেকে—

হৈ চৈ শুনে আশেপাশের আরো কিছু লোক এসে জড়ো হলো। সিতারাদের এক বৃদ্ধ আত্মীয়ও বেরিয়ে এলেন গোলমাল শুনে। আদু শেখকে দেখে তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—আরে, শেখ সাহেব যে! আপনি হঠাৎ এ পাড়ায় ? আপনিও তাহলে বাড়ী থেকে বেরোন দেখছি!

আদু শেখ বললো—বিবেকের তাড়নাতেই ছুটে এসেছি ভাই সাহেব। কিন্তু এসে দেখছি, মস্তবড় ভুল করেছি।

ঃ কি রকম! ব্যাপার কি ?

ঃ ব্যাপার বড় গুরুতর। খুব সম্ভব আপনাদের সিতারা বানু লোপাট হয়ে যাচ্ছে। একদল গুণ্ডার হাতে তাকে তুলে দিচ্ছে জেকের আলী।

ঃ সেকি! আপনি কি করে জানলেন ?

ঃ আমার বাহির আঙ্গিনার এক পাশেই যে এই নিয়ে শলা-পরামর্শ হলো ? বৈঠকখানার সামান্য একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে গুণ্ডা কিসিমের কয়েকজন বাইরের লোকের সাথে এসব কথাবার্তা জেকের আলী নীচু গলায় বলছিলো। আমি বাড়ীর ভেতরে ছিলাম। বৈঠকখানায় ঢুকতেই তাদের কথা কানে পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর কান পেতে শুনতে লাগলাম। জেকের আলীর মুখে কয়েকবার সিতারার নাম শুনলাম। সেই সাথে জেকের আলীকে বলতে শুনলাম, খাশামাল! আপনাদের পছন্দ না হলে তখন বলবেন। আসুন আজ সন্ধ্যায়। বাড়ী আমার ফাঁকা। সব ব্যবস্থা করে রাখবো।

বৃদ্ধটি সন্ত্রস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—সেকি! আপনি একি বলছেন ?

www.pathagar.com

আদু শেখ বললো—আমি বেরিয়ে আসতেই জেকের আলীরা তাড়াতাড়ি সরে গেল। এরপর ভাবলাম, যা হয় হোকগে। এ নিয়ে আমার ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? কিন্তু সন্ধ্যের একটু আগে পরপর আরো কয়েকজন ষণ্ডা মার্কা লোক এসে জেকের আলীর খোঁজ করলে আর 'জেকের আলী কোথায় এখন, বাড়ীতে গেছে না এ দিকেই আছে'—এসব খবর আমার কাছে জানতে চাইলে, ব্যাপারটা যে সত্যিই গুরুতর তা বুঝতে পারলাম। তাই, বিবেকের তাড়না সামাল দিতে না পেরে নিজেই ছুটে এলাম খবর দিতে। কিন্তু ওব্বাবা! যার দুঃখে কাঁদি আমি সে আমারে কোৎকা দেখায়। দুনিয়ায় কি ভালর আর কাল আছে?

ঃ বলেন কি! জেকের আলী সিতারাকে অন্যের হাতে তুলে দেবে মানে? আমরা তো জানি, জেকের আলীই সিতারাকে শাদি করতে আগ্রহী।

ঃ জেকের আলী কয়টা শাদি করবে? গোপনে গোপনে ইতিমধ্যেই যে সে কোথায় কোথায় যেন দু' দুইটে শাদি করে বসে আছে, সে খবর কি আগে আমি জানতাম? ওদের ঐ কথাবার্তার মধ্যেই পয়লা জানতে পারলাম। মালটা গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়ে আজ রাতে সে তার দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবে আর সেখানে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে—জেকের আলীর একথাটা আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মালটা যে আপনাদের সিতারা, এ সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিত।

শত কারণে আদু শেখ বাড়ী ছেড়ে নড়ে না। গুজব রটানোর লোকও সে নয়। সেই লোক ছুটে এসেছে নিজে! ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে উপস্থিত সকলেই হায়-হায় করতে লাগলো। সিতারার আম্মা তখন একদম বোবা। বৃদ্ধ ঐ ভদ্রলোকটি চমকে উঠে বললেন—আরে আরে, হায়- হায় করলে হবে কেন? আসুন আসুন, সবাই আমার সাথে আসুন তো? মেয়েটাকে উদ্ধার করা যায় কিনা, আসুন তো দেখি—

কিন্তু কে আসবে তাঁর ডাকে? হায়-হায় যারা করছিল তারা জেনানা আর বাল বাচ্চা। কোন জোয়ান লোক সেখানে কেউ ছিল না। নসীবের লিখন! বরকতুল্লাহ এই সময় এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে বৃদ্ধটি সংক্ষেপে ঘটনাটি বলে তার সাহায্য চাইলেন। মুজাহিদ মনুষ। তার উপর, জেকের আলীর দ্বারা এমন কাজ যে সম্ভব, এ ধারণা তার আছে। অধিক চিন্তা-ভাবনায় না গিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের সাথে ছুটলো।

গিয়ে দেখে ঘটনা বিলকুল সত্যি। জেকের আলীর বাড়ী একদম ফাঁকা। ভেতর আঙ্গিনায় বাহির আঙ্গিনায় কোথাও কেউ নেই। বাইরের কোন ঘরে বা বারান্দায় কোন জনপ্রাণী নেই। কেবলমাত্র ভেতরের এক কোণে এক ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তির সাথে চাপা উল্লাস শুনা যাচ্ছে। সে ঘরের দুয়ার ভেতর থেকে বন্ধ।

বরকতুল্লাহ পথেই আর দু'জন লোককে জুটিয়ে নিয়ে ছিল। যদিও পরক্ষণেই পাড়ার তামাম লোক ছুটে এলো, কিন্তু ঐ মুহূর্তে সেখানে তারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বৃদ্ধটিও পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে গেছে। চারদিক আঁধার হয়ে এসেছে। ডাক-হাঁক সত্ত্বেও ভেতরের কেউ তা ভ্রুক্ষেপও করলো না বা দুয়ার খুলেও দিলো না। বাধ্য হয়ে বরকতুল্লাহরা এক সাথে লাথি মারলো দুয়ারে। দুয়ারের নরম খিল এক লাথিতেই ভেঙে গেল। খুলে গেল দুয়ার।

www.pathagar.com

ঘরের মধ্যে এক কোণে টিম টিম করে একটা মাটির বাতি জ্বলছিল। সেই স্বল্প আলোতে বরকতুল্লাহরা দেখতে পেলো, মরাগরুর হাড় নিয়ে শেয়াল-কুকুরে যেমন ছিনাছিনি করে, ছয় সাত জন গুণ্ডা সিতারাকে নিয়ে তেমনই ছিনাছিনি করছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে বরকতুল্লাহরা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়লো গুণ্ডাদের উপর। প্রাণপণে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর গুণ্ডাদের হাত থেকে সিতারাকে মুক্ত করে নিয়ে তারা দরজার বাইরে এলো বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে এক গুণ্ডা পেছন থেকে দা দিয়ে সজোরে এক কোপ মারলো বরকতুল্লাহর কাঁধে। দায়ের কোপ কাঁধের নিচে গভীর-ভাবে বসে গেল। আর্তনাদ করে উঠে দরজার নীচে গড়িয়ে পড়লো বরকতুল্লাহ।

মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের ফাঁকা ময়দানে বসে এ পর্যন্ত বলার পর বক্তা বসিরউদ্দীন থামতেই নূরউদ্দীনসহ অন্যান্য শ্রোতারা রুদ্ধকণ্ঠে আওয়াজ দিল—তারপর?

জবাবে বসিরউদ্দীন বললো—এদের এই হুটপিট আর ঐ বৃদ্ধটির চীৎকারে পাড়ার তামাম লোক চারদিক থেকে হৈ হৈ করে ছুটে আসতে লাগলো। আর রেহাই নেই দেখে গুণ্ডারা তৎক্ষণাৎ দৌড় দিয়ে পালাতে শুরু করলো। তা দেখে পাড়ার লোকজনও ধর ধর রবে ধাওয়া করলো গুণ্ডদের আর ধাওয়া করে এক গুণ্ডাকে ধরে ফেললো। আরো দু'জন আর একদিকে ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেশী লোক সেখানে এসে না পৌছায়, সে দু'জন ফসকে আঁধারের মধ্যে পালিয়ে গেল।

ঃ তারপর?

ঃ আটক গুণ্ডাটাকে এনে গাঁয়ের লোকজন মুণ্ডর হাঁকাতে শুরু করলে, সে গড় গড় করে সব কথা স্বীকার করলো। অনেক টাকার বিনিময়ে জেকের আলী মিথ্যা খবর দিয়ে সিতারাকে এনেছিল আর এনে তাকে গুণ্ডদের হাতে দিয়েছিল।

অনেকেই ফের সবিস্ময়ে বললো—বলেন কি!

বসিরউদ্দীন বললো—এমন কারবার নাকি জেকের আলী এর আগেও আরো কয়েকবার করেছে। প্রেম প্রেম খেলে আরো কয়েকটা মেয়েকে হাত করে নেয়ার পর তাদেরও এভাবে সর্বনাশ করে ভাল টাকা কামিয়েছে জেকের আলী। শক্ত লাঠি পিঠে পড়ার সাথে সাথে আটক গুণ্ডাটি সব কথা বেমালুম ফাঁশ করে দিলো।

ঃ আর তার শাদির ব্যাপারটা? জেকের আলী যে দু' দুইটে শাদি করেছে—

ঃ এ খবরও সত্য। এ ঘটনাও গুণ্ডাটা সবিস্তারে বলে দিলো। অনেক আগেই জেকের আলী দূর এলাকায় একজনকে শাদি করে রেখেছে। সে শাদির কথা গোপন করে এই অল্প দিন আগেও নাকি জেকের আলী আর এক জায়গায় আর এক শাদি করেছে। অনেকদিন আগে থেকেই এদের সাথে জেকের আলীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই এরা সব খবর জানে।

খেয়াল হতেই নূরউদ্দীন ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—ওহো, বরকতুল্লাহর তারপর কি হলো? গুণ্ডদের দায়ের কোপে পড়ে যাওয়ার পর—

ঃ বরকতুল্লাহ আর্তনাদ করে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পাড়ার লোকের এক অংশ এদিকেও ছুটে এলো। বরকতুল্লাহকে তুলে নিয়ে গিয়ে তারা ক্ষতস্থান বেঁধে দিলো। এরপরেই হেকিম ডেকে আনা হলো। হেকিমি সাহেব দাওয়াই লাগিয়ে ক্ষতটা

www.pathagar.com

আবার ভাল করে বেঁধে দিলে রক্ত পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল আর অর্ধচৈতন্য অবস্থা থেকে বরকতুল্লাহ আস্তে আস্তে চৈতন্যে ফিরে আসতে লাগলো।

ঃ এরপর কি হলো?

ঃ সে রাতটা তার খুব কষ্টেই কাটলো। শেষ রাতের দিকে ব্যথা তার কমতে শুরু করলে সে ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করতে লাগলো। হেকিম এসে পুনরায় দাওয়াই খাইয়ে দিলে বিপদের তামাম আশংকা কেটে গেল।

নূরউদ্দীন অতপর দম ছেড়ে বললো—বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! তা জেকের আলী? জেকের আলীর কি হলো? গাঁয়ের লোক তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলেন না?

ঃ কার ব্যবস্থা কে নেবে? জেকের আলীকে পেলে তো? সে খুব চালাক লোক। বরাবরই নিজে সে বিপদ থেকে ফাঁকে থাকে। বিপদ ঘনিয়ে উঠতে দেখলেই সে সবার আগে কেটে পড়ে। ঘটনাস্থলে তার আর হদিস পাওয়া যায় না। এবারও পাওয়া যায়নি। আগেই সে উধাও।

ঃ বলেন কি। তার বাপ মায়েরাও কোন হদিস দিচ্ছে না?

ঃ দেবে কি করে? জেকের আলীর বাপ নেই। বিধবা মা তার এক চাচার সাথে নিকাহ পুষে এ বাড়ীতে আছে। জেকের আলী এদের কারো বাধ্য নয়। এদের সে মানেও না, এদের ধার ধারেও না। তার মায়ের এপক্ষেরও কয়েকটা ছেলে মেয়ে হয়েছে। বালবাচ্চা নিয়ে দাওয়াত থেকে ফিরে এসে গাঁয়ের আর পাঁচজনের মতো এরাও এই খবর শুনলো আর শুনে কেবল হতবাকই হলো। এদের তেমন দোষও নেই আর জেকের আলীর ব্যাপারে এদের কিছু করার সাধ্যও নেই। এদের কাছে গাঁয়ের লোকেরা হদিস পাবে কি?

ঃ বিচিত্র ব্যাপার! জেকের আলী দিনে দিনে এত নীচে নেমে গেল?

বসিরউদ্দীন বললো—পাঁকে একবার নামা যে শুরু করে, সে তখন পাঁকের আরো গভীরেই নেমে যেতে থাকে ভাই সাহেব। উপরে উঠার ইচ্ছেও তার থাকে না, সে সাধ্যও থাকে না।

নূরউদ্দীন বললো—কিন্তু জেকের আলীকে প্রথম যখন দেখি, তখন তো এত খারাপ মনে হয়নি তাকে? মোটামুটি ভাল মানুষ বলেই মনে হয়েছে আমার।

ঃ হবেই তো। ভাল মানুষের সাহচর্যে থাকলে খারাপ মানুষও অনেকখানি ভাল হয়ে যায়। যেদিন থেকে জেকের আলী বাহার খাঁ সাহেবের সংস্পর্শ থেকে সরে গেছে, সেইদিন থেকেই তার অধঃপতন শুরু হয়েছে।

ঃ তাই তো দেখছি।

ঃ তা ছাড়া, রক্তের দোষটা যাবে কোথায় ভাই সাহেব! তার বংশের ধারাটাতো বরাবরই কদর্য। সেরেফ নারী ঘটিতই নয়, তার বংশের অনেকের পেছনে বিভিন্ন রকমের আরো অনেক দুষ্কর্মের লম্বা ইতিহাস আছে।

আর প্রশ্ন না করে নূরউদ্দীন থামলো। একটু পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হুঁউ! তা বরকতুল্লাহ এখন কেমন আছে, তা কি কিছু জানেন আর?

www.pathagar.com

ঃ জি, জানি বই কি ? যেদিন আমরা রওনা হই, সেইদিন সকালেই আমি নিজে তাকে দেখে এসেছি। সে এখন ভাল। কোন ব্যথা বেদনা নেই বা জ্বর তাপও নেই। তবে উঠে বেড়াতে পারছে না। শুয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। শুয়ে বসেই গল্প করছে সবার সাথে।

ঃ আহা বেচারা!

ঃ এ কারণেই বরকতুল্লাহ আসতে পারেনি আমাদের সাথে। ক্ষতটা খুব গভীর। অল্পতে সারবে না। ঘা শুকোতে আর না হোক, প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে।

ইতিমধ্যে বাহার খা সাহেবের তলব আসায় ময়দান থেকে উঠে সবাই মুইজউদ্দীন বিশ্বাস সাহেবের বৈঠকখানায় চলে গেল।

১২

নূরউদ্দীন, বসিরউদ্দীন-এসব ইয়ারপুরের মেহমান গল্প আলাপের মধ্যে দিয়ে বেশীদিন আরামে কাটাতে পারলো না। মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে বেশীদিন তাদের বসে বসে কাটলো না। অতি অল্প দিনেই ঘনিয়ে এলো বিপদ আর শুরু হলো সংঘাত।

তিতুমীর সাহেবের সভা হলো ২৩শে অক্টোবর। পুরওয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের দুষ্কর্মের দোসর বসির হাট থানার দারোগা ২৮শে অক্টোবর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করলো যে, জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সাথে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার বদ উদ্দেশ্যে তিতুমীর তার বিপুল সংখ্যক শিষ্যদের নারকেল বাড়িয়ায় একত্রিত করেছে। প্রতিবেদনে আরো তিনি জানালেন, তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ওদের উৎখাত করার জন্যে থানা থেকে দুজন বরকন্দাজ পাঠানো হয়েছে। তারাই ওদের উৎখাত ও ঠাণ্ডা করে দেবে।

দারোগা যেটাকে বিপুল সংখ্যক জনতা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেন, দুজন মাত্র বরকন্দাজ গিয়ে কি করে সেটা উৎখাত ও ঠাণ্ডা করবে—এই ফালতু কথা বলতে দারোগাও ইতস্তত করলেন না, এই ফালতু কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বিস্মিত হলেন না। তিনি বুঝলেন, দারোগা যখন উৎখাত হবে বলেছে, উৎখাত তখন হবেই। অপর দিকে, দারোগাও উৎখাত হবে জেনেই এই ফালতু কথা নির্দ্বিধায় লিখলেন।

উৎখাতও হলোই। আর না হোক, আপাতত ঠাণ্ডা করা হলোই। এর মাহাত্মটা কি ? মাহাত্ম্য হলো দারোগা ও কৃষ্ণদেব রায়ের ষড়যন্ত্র। তিতুমীরেরা সমবেত হচ্ছে বলে নিজেও প্রতিবেদন দাখিল করে কৃষ্ণদেব রায় নিজেকে নীরিহ লোক হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তুলে ধরলেন এবং তাঁর কোনো বদ মতলব নেই, একথাই বুঝালেন। এই সাফাইটুকুর দ্বারা নিজের দুকর্ম আড়াল করার চেষ্টা করে, পরের দিন ২৯শে অক্টোবর পাইক-পেয়াদা ও সশস্ত্র লোকজনের বিশাল এক দল নিয়ে কৃষ্ণদেব রায় এসে নারকেল বাড়িয়ায় মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে চড়াও হলেন। ডাকাত

www.pathagar.com

পড়ার মতোই এই অতর্কিত হামলার জন্যে মীর সাহেবেরা কেউ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

অতর্কিত এই হামলার মুখে অবস্থান ও আশ্রয় নেয়ার মতো কোন সুরক্ষিত স্থানও মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীতে ছিল না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবেই এই হামলা প্রতিরোধ করার কোন সময়ই তাঁরা পেলেন না। বিশাল ঐ দুশমন দলের তুলনায় এই অতি নগণ্য সংখ্যক লোক এলোপাতাড়ি-ভাবে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থই শুধু হলেন না, অনেকেই আহত হলেন। এই আহতদের মধ্যে খোদ তিতুমীরসহ মিসকীন শাহ এবং মুইজউদ্দীন বিশ্বাসও ছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় এটুকুতেই থামলেন না। দলবল নিয়ে হামলা ও লুটতরাজ চালিয়ে মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীসহ ঐ গাঁটা গোটাই তছনছ করে ফেললেন। কৃষ্ণদেব রায়ের এই দুষ্কর্ম ঢাকার জন্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে দারোগা ফের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন, তাঁর বরকন্দাজেরা গিয়ে তিতুমীরের ঐ সমাবেশ ভেঙে দিয়েছে ও সবাইকে বিতাড়িত করেছে। বেচারা কৃষ্ণদেব রায় মস্তবড় এক মুসিবত থেকে বেঁচে গেলেন।

দু'জন বরকন্দাজের পক্ষে কজিটি সম্ভব কিনা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবারও তা ভেবে দেখতে গেলেন না। স্বপক্ষের দারোগা ও জমিদারেরা যা বলেছেন এবং পরবর্তীতে যা বললেন, তিনি তাই বিশ্বাস করলেন। যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। দল পাকানো মুসলমানেরা সত্য কথা বলে বা বলছে, এটা তাঁর প্রতীতিতেই এলো না। আর এলেও তাতে তিনি সায় দিতে চাইলেন না।

কৃষ্ণদেব রায়ের এই হামলার খবর পরের দিনই ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। খবর শুনে চারদিক থেকে মার মার রবে ছুটে এলেন তিতুমীরের শিষ্যেরা। প্রতিশোধ নেয়ার দুর্বার আক্রোশে তাঁরা হাশরের মতো ফুঁসতে লাগলেন। ফকিরদের ও বাহার খাঁ সাহেবদের নিয়ে তিতুমীর সাহেব, মুইজউদ্দীন বিশ্বাস এবং অন্যান্যেরাও প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন। মীর সাহেবের অনুসারীরা চারদিক থেকে এসে সমবেত হলে, কেউ কেউ তখনই কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটে বেরোনোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাধা দিলেন বিজ্ঞজনেরা। উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া এলো-মেলোভাবে এতবড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় বলে মীর সাহেব নিজে, বাহার খাঁর দলের নূরউদ্দীন-সোহরাব হোসেন প্রমুখ দক্ষ মুজাহিদেরা ও মিসকীন শাহর দলের অভিজ্ঞ ফকিরেরা মত প্রকাশ করলেন। এ মত সমর্থন করলেন মীর সাহেবের বাহাদুর ভাতিজা গোলাম মাসুম, মীর সাহেবের প্রতিবেশী মুহম্মদ মাসউদ, গৃহস্বামী মুইজউদ্দীন বিশ্বাস ও অন্যান্য অনেক শিষ্য মুরিদেরা।

শুরু হলো প্রস্তুতি আর তার গতি হলো ক্ষিপ্রতর। সমবেত জনতাকে একটি সুশৃঙ্খল জঙ্গী দলরূপে বিন্যাস করে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। মীর সাহেবের ভাতিজা গোলাম মাসুম একজন তেজদীপ্ত ও উৎসাহী পুরুষ। দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বদানের তাঁর সুখ্যাতি আছে অনেক। সবাই মিলে তাঁকেই সালার হিসেবে এই বাহিনী পরিচালনা করার দায়িত্ব দিলেন। তিতুমীর নিজেই একজন

www.pathagar.com

বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা। সার্বিক নির্দেশনা তাঁর উপর রইলো। ফকিরদের মতো কিছু অভিজ্ঞ লড়াইয়া আর নূরউদ্দীনদের মতো কিছু দক্ষ মুজাহিদ দলে থাকায় দলের সাহস ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো।

বাহিনী তৈরীর সাথে বাহিনীর ঘাঁটিও তৈয়ার করা হলো। সুরক্ষিত স্থানের অভাবে কৃষ্ণদেব রায়ের হামলায় মীর সাহেবেরা সেদিন চরম বিপাকে পড়েছিলেন। অতর্কিত হামলার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত স্থান বা আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। জমিদারেরা যাতে করে আর তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালাতে না পারে, সেই জন্যে শুরু হলো সুরক্ষিত ঘাঁটি বা আশ্রয় নির্মাণ। দুর্গ বা কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীরের মতো করে মুইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ীর সামনের উন্মুক্ত ষাট বিঘে জায়গা বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘেরা হলো। অর্থাৎ, একটার সাথে আর একটা লাগিয়ে গোটা গোটা বাঁশ এই জায়গার চারদিকে পুঁতে উচ্চ ও মজবুত বাঁশের প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। বাঁশের খুঁটির এই স্টকেড বা খুঁটির বেড়ার এই জায়গারকেই একটা কেল্লার মতো সুরক্ষিত আশ্রয় করে নেয়া হলো। এর মধ্যেই মীর সাহেবের কর্মকেন্দ্র পার করা হলো আর এই বাঁশের কেল্লাই হলো তাঁর জঙ্গী দলের ঘাঁটি বা অবস্থানের জায়গা। মীর সাহেবের জঙ্গী বাহিনীর লোকেরা অবশ্য সকলেই সবসময় এই কেল্লার মধ্যে থাকতেন না । কিছু কিছু থাকতেন আর অধিকাংশেরাই বাড়ীতে চলে যেতেন এবং মাঝে মাঝে ফিরে আসতেন।

প্রস্তুতি সমাপ্ত করেই ঈসায়ী ১৮৩১ সনের ৬ই নভেম্বর তারিখে প্রতিশোধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিতুমীরের জঙ্গীদল জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ী পুরওয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। তিতুমীরের দল যখন কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে এসে হাজির হলো, কৃষ্ণদেব রায় বাড়ীতে তখন ছিলেন না। তিতুমীরের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে এবং ভেতরের সংবাদ সংগ্রহ করে কৃষ্ণদেব রায়ের কম্পন শুরু হয়েছিল। এতবড় জঙ্গীদলের মোকাবেলা ও এদের ধ্বংস করা তাঁর একার শক্তিতে সম্ভব নয় বুঝে তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী জমিদার গোবরাগোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। দেবনাথ রায়ের নেতৃত্বে কয়েকটি জমিদারের বাহিনী একত্রিত করে নিয়ে তিতুমীরের উপর মরণ আঘাত হানবেন, এই ষড়যন্ত্র আর যোগাড়যন্ত্রর নিয়ে কৃষ্ণদেব রায় সেখানেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর গৃহের নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্ব তিনি তাঁর লোকজনের উপর ও তাঁর দুষ্কর্মের সাঙ্গাত নীলকর সাহেবদের উপর অর্পণ করে রেখেছিলেন।

ফলে, মীর সাহেবের লোকেরা কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীর সামনে আসামাত্রই বাড়ী থেকে অনেক লোক হাতিয়ার হাতে ছুটে এলো। সেই সাথে হাতীর পিঠে চড়ে সবিক্রমে ধেয়ে এলো আক্রা নীল কুঠির নীলকর সাহেব লিউইস চার্লস স্মিথ। সঙ্গে তার একদল লোক নিয়ে তার সহকারী নবাবউদ্দীন।

শুরু হলো লড়াই। ক্ষণিকের সংঘর্ষেই আতংকিত হয়ে উঠে কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীর লোকেরা প্রাণ নিয়ে পালালো। নবাবউদ্দীনও একটু পরেই আহত হয়ে পালালে, তার সঙ্গীরাও তার পিছে পিছে পালিয়ে গেল। হস্তীপৃষ্ঠে একক চার্লস স্মিথের

www.pathagar.com

তখন অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া। আসন্ন বিপদ দেখে সে দিশেহারা হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে হাতী চালিয়ে নীলকর স্মিথও পড়িমরি সরে পড়লো।

মীর সাহেবের লোকদের লক্ষ্য বস্তু ছিল কৃষ্ণদেব রায়। বাড়ীর জেনারারা আর গাঁয়ের নীরিহ অধিবাসীরা নয়। নারীর অবমাননা করা আর একের দোষে অন্যকে শাস্তি দেয়া মীর সাহেবদের মতো মুসলমানের কাজ নয়। তাই কৃষ্ণদেবকে না পেয়ে তাঁর গৃহের কিছু ক্ষতি সাধন করেই মীর সাহেবের জঙ্গীদল পুরওয়া থেকে ফিরে এলো।

পুরওয়া থেকে ফিরে এসেই তিতুমীর সাহেবের লোকেরা শুনতে পেলেন, গোবরাগোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ও তাঁর ভাই হরদেব রায় বিশাল এক বাহিনী নিয়ে তাঁদের ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে নারকেলবাড়িয়ার দিকে ধেয়ে আসছেন। এই বাহিনী জমিদার দেবনাথ রায়ের একক বাহিনী নয়। দেবনাথ রায়ের বাহিনী, গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাহিনী, পুরওয়ার কৃষ্ণদেব রায়ের বাহিনী ও আরো কয়েকটি জমিদারের বাহিনী একত্রিত হয়ে একজোটে বিপুলদম্ভে ছুটে আসছে। সঙ্গে কিছু নীলকর সাহেবেরাও আছে।

কাল হরণ না করে তিতুমীর সাহেব আর তাঁর অনুসারীরা দুশমনের গতিরোধ করার জন্যে তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরুলেন। পুরওয়ার ঘটনার পরের দিন, অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর মীর সাহেবেরা এসে নদীয়া জেলার সীমান্তে লাওঘাটি নামক স্থানে জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখী হলেন।

ঐ লাওঘাটিতেই শুরু হলো লড়াই। অনেক সময় ধরে দুইপক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই চললো। এরপর জমিদারদের দল নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত ও করুণভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিতুমীর সাহেবের লোকদের ঈমানী তেজ ও জান কুরবান করার নিয়াতের কারণেই জয়ী তারা শেষ অবধি হয়তো হতেনই এবং জয়ী হওয়ার আলামতও প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের এ বিজয় অতি সহজ করে দিলো লাওঘাটি এলাকার গ্রামবাসীরা। জমিদার আর নীলকরদের অত্যাচারে অন্যান্য তামাম এলাকার মতো এ এলাকার গ্রামবাসীরাও অত্যন্ত অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ ছিল। যখন তারা শুনলো, জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তখনই ঐ এলাকার জনগণ লাঠি শোটা হাতে নিয়ে মীর সাহেবদের পক্ষে মারমার রবে ছুটে এলো এবং লড়াইয়ে সক্রীয় অংশ গ্রহণসহ নানা প্রক্রিয়ায় মীর সাহেবদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করলো।

এতে করে জমিদারদের বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ও এদিক ওদিকে ছিটকে পড়লো। ছিটকে পড়েও কোনো নিরাপদ আশ্রয় তারা পেলো না। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে জমিদারদের এই ছিটকে পড়া লোক লস্কর আতংকের উপর পুনরায় আঁতকে উঠে বনজঙ্গল ভেঙে ঐ তল্লাট ছেড়ে পালালো। জমিদার দেবনাথ রায় ও তাঁর ভাই হরদেব রায় দু'জনই এই লড়াইয়ে ভীষণভাবে আহত হলেন। দেবনাথ রায় এতো মারাত্মকভাবে আহত হলেন যে, তিনি আর শয্যা থেকে উঠলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দুনিয়ার তামাম খেলায় ইতি টেনে পরলোকে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

এই বিজয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিতুমীর সাহেব ও তাঁর লোকজনের মনোবল অনেক উপরে উঠে গেল। লাওঘাটি থেকে বিজয়ের বেশে নারকেল বাড়িয়ায় ফিরে এসে তাঁরা দলবদ্ধভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

জমিদারদের এতো বড়ো সম্মিলিত শক্তি এমন করুণভাবে মিসমার হয়ে যাওয়ায় আর তাঁদের ডানহাত দেবনাথ রায় নিহত হওয়ায়, জমিদারগণ অতপর মাথায় হাত দিলেন। মীর সাহেবের দলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের আর কোন সাহস ও সামর্থ তাঁদের রইলো না।

এখানে তাঁরা থেমে গেলে তামাম সমস্যার সমাধান হতে পারতো। উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতো। জমিদারদের দুশমনী বন্ধ হোক, এটুকুই তিতুমীর সাহেব চেয়েছিলেন। এর অধিক তিনি চাননি। এর অধিক অগ্রসর হওয়ার কোন অভিপ্রায়ই তিতুমীর সাহেবের ছিল না।

কিন্তু জমিদারেরা থামলেন না। এ ঘটনার পর তাঁরা নীরব বা নিষ্ক্রীয় হয়ে গেলেন না। নিজের শক্তিতে আর কুলালো না দেখে তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ, তাঁদের পৃষ্ঠাপোষক ও অনুগ্রাহক ইংরেজ সরকারের শরণাপন্ন হলেন। মীর সাহেবদের প্রতি ইংরেজ সরকারের আক্রোশ পয়দা করার ও মীর সাহেবদের উপর ইংরেজদের লেলিয়ে দেয়ার জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই চেষ্টায় জমিদারেরা তাড়াতাড়ি বড় একটা সফলকাম হতে না পেরে তাঁরা তাদের অপকর্মের মিত্র নীলকর সাহেবদের ব্যবহার করতে শুরু করলো। নীলকরদের মাধ্যমে তিতুমীরের উপর ইংরেজদের ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। নীলকর সাহেবেরাও এতে উষ্ণ সাড়া দিলো। তিতুমীরকে জব্দ করার প্রচেষ্টায় জমিদারেরা অতপর আস্তে আস্তে গৌণ হয়ে গেল এবং নীলকর সাহেবেরাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। কারণও সুস্পষ্ট। তিতুমীরও তাঁর দলকে দমন করা না গেলে জমিদারদের মতো তাদেরও বাড়া ভাতে ছাই। অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল ও স্বৈর আচরণের পথে বিপুল বিপত্তি।

আদাপানি খেয়ে তাই লেগে গেল তারা। বসিরহাট থানা ও পার্শ্ববর্তী থানাগুলোর দারোগাদের যোগসাজোসে একের পর এক মিথ্যা এবং বানোয়াট প্রতিবেদন দাখিল করে করে নীলকর সাহেবেরা ইংরেজ সরকারকে এই মর্মে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলো যে, তিতুমীরদের উপেক্ষা করা ইংরেজ সরকারের আর মোটেই সমীচিন নয়। এই মহাবিপদের প্রতি নজর ফিরিয়ে রাখার আর মোটেই অবকাশ নেই। ফকির মজনুশাহ ও অন্যান্যদের মতোই তিতুমীরও ইংরেজ সরকারের ভয়ংকর এক দুশমন। সবাই তারা বিদ্রোহী আর সবাই তারা ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত করতে চায়।

টপকে গেল ইংরেজ সরকার। নীলকরদের উস্কানীতে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে ইংরেজ সরকার পদক্ষেপ নিতে শুরু করলো। বারাসত জেলা চব্বিশ পরগণা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সরকার চব্বিশ পরগণার বিভাগীয় কমিশনারই আর. বারওয়েলকে ঘটনাটিতে হস্তক্ষেপ করে দমনমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নর্দেশ দিল। বারওয়েলও তৎক্ষণাৎ বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে পরের দিনই বারাসত জেলায় তদন্তে চলে এলেন। তদন্তে এসে

www.pathagar.com

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি দারোগা ও নীলকরদের বানোয়াট রিপোর্টগুলোই পেলেন। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও কমিশনারের কানভারী করলেন। ফলে, কমিশনার বারওয়েল, কোম্পানীর বাগুন্দি কুঠির এজেন্ট বার্লোর সাথে যোগ দিয়ে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদ্রোহীদের দমন করার আদেশ দিলেন। সেই সাথে কমিশনার জানালেন, কমিশনার তাঁর সদর দপ্তর আলীপুরে ফিরে গিয়েই কলিকাতা থেকে একদল মিলিশিয়া বাহিনী জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে পাঠাবেন।

কমিশনার সাহেব কথা রাখলেন। সদরদপ্তরে ফিরে এসেই তিনি একজন জমাদারের অধীনে পঁচিশ জন সেপাইয়ের একটি দল বারাসতে পাঠিয়ে দিলেন এবং দলকে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত হুকুমে কাজ করার নির্দেশ দিলেন।

একজন হাবিলদার আর বিশজন সৈন্য নিয়ে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাগুন্দি কুঠিতে এলেন এবং কুঠির এজেন্ট বার্লোর সাথে যোগ দিয়ে নারকেল বাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। নারকেল বাড়িয়ার পাঁচ মাইল দূরে বাদুরিয়ায় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দল এসে পৌছুলে বসিরহাট থানার দারোগা তাঁর বরকন্দাজ ও চৌকিদারদের নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যেই কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত ঐ মিলিশিয়া দলটিও এসে ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনীর সাথে যুক্ত হলো। এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ এস আলেকজাণ্ডার ঈসায়ী ১৮৩১ সনের ১৫ই নভেম্বর নারকেল বাড়িয়ায় এসে তিতুমীরের আস্তানায় হানা দিলো।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার হানা দিলে আত্মরক্ষার্থে তিতুমীরের দল সমানে ইটপাটকেল ছুড়ে পাল্টা হামলা করলো। বৃষ্টির আকারে ইটপাটকেল ছুড়তে ছুড়তে মীর সাহেবের নির্ভীক অনুসারীরা ধেয়ে এলে এবং লাঠি চালাতে শুরু করলে, ম্যাজিস্ট্রেটের লোক লস্কর আর টিকে থাকতে পারলো না। পিছু হটতে হটতে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা দৌড়ের উপর পালিয়ে যেতে লাগলো। মীর সাহেবের দলও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে ছুটলো এবং ধাওয়া করে তাদের অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

উপায়ান্তর না দেখে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারও ঐ একইভাবে দৌড় দিলেন। মীর সাহেবের লোকেরা মার মার রবে তাঁর পেছনেও ছুটলেন এবং তিনি মরতে মরতে বেঁচে এলেন। খাল-নালা ঝোঁপে একটানা দৌড়ের উপর পাঁচ মাইল দূরে বাদুরিয়ায় পৌছে তবে তিনি রেহাই পেলেন।

এই সংঘর্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষের একজন জমাদার, তিনজন বরকন্দাজ ও দশজন সেপাই নিহত হলো। কলিকাতার মিলিশিয়ার হাবিলদার গুরুতরভাবে আহত হয়ে ময়দানে পড়ে রইলো। মৃতমনে করে তাকে ফেলে রেখেই তার পক্ষের লোকেরা ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। বসিরহাট থানার দারোগা ও আরো কিছু বরকন্দাজ ঐ একইভাবে আহত হয়ে ময়দানে পড়েছিল। মীর সাহেবের লোকেরা এদের সবাইকে বাঁশের বেষ্টনীর মধ্যে তুলে আনলেন। দারোগাটি একটু পরেই তার তামাম অপকীর্তির অবসান ঘটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঐ হাবিলদার সহ আর সকলেই বেঁচে উঠলো। পরাজিত শত্রুর সাথে আর কোন দুর্ব্যবহার না করে তাদের সবাইকে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

এই লড়াইয়ের ফলে দু'দিকে দু'রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার ও তার বাহিনীর এ শোচনীয় পরিণতি হওয়ায় ইংরেজ সরকারকে বোঝানো হলো এবং ইংরেজ সরকারও ভুল করে বুঝলো, তিতুমীরেরা সত্যি সত্যিই বিদ্রোহী। এরা ইংরেজ রাজত্বের পতন চায়। অপরদিকে, জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে হামলা করতে আসায়, মীর সাহেবেরা সঠিকভাবে বুঝলেন, জেলা প্রশাসনও আর মোটেই নিরপেক্ষ নয়। জেলা প্রশাসনও তাদের একই রকম শত্রু। জমিদার, দারোগা আর নীলকরদের ষড়যন্ত্রের সাথে জেলা প্রশাসনও একইভাবে লিপ্ত এবং ঐ চক্রেরই একটি অঙ্গ। তৃণমূল থেকে জেলা প্রশাসন পর্যন্ত কোথাও কোন সুবিচার পাওয়ার তাদের আর আশা নেই। সুবিচার নসীবে যদি আদৌ কিছু জোটে, তাহলে তা ঐ জেলা প্রশাসনের উপরে ইংরেজ সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেই একমাত্র জোটা সম্ভব, এর নীচে থেকে আর নয়।

হায়রে আশা! শুধু জেলা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ই নয়, তাঁদের এই ক্ষীণ আশাটুকুও নস্যাত করে দিয়ে খোদ ইংরেজ সরকার বুঝলো, তিতুমীর আর তাঁর লোকেরা ইংরেজ সরকারের ভয়ংকর শত্রু। অচিরেই এদের বিনাশ করা প্রয়োজন।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার অতপর বাগুন্দি কুঠিতে পৌঁছে কুঠির ধন-সম্পদ সহকারে নৌকাযোগে কলিকাতায় পৌঁছলেন এবং সরকারকে তাঁদের ঐ করুণ পরিণতির কথা জানিয়ে বললেন, তিতুমীরকে সদলবলে অচিরেই ধ্বংস না করলে, ইংরেজ রাজত্বের সামনে ঘোর দুর্দিন।

সরকারও সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ছাড়লো—ধ্বংস করো। সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলো, বারাকপুর সেনানিবাস থেকে পুরো এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যবাহিনী দমদম ঘাঁটি থেকে গোলন্দাজ বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ কামান-বন্দুকসহ একজন নিয়মিত সেনাপতিকে (জেনারেলকে) তিতুমীরদের ধ্বংস করতে পাঠাও। সেই সাথে সরকার বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ এস আলেকজাণ্ডারকে তখনই বারাসতে ফিরে যেতে বললো এবং ধাবমান এ সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় খবরবার্তা যোগান দিতে ও তাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করতে নির্দেশ দিলো।

মীর সাহেব ও তার লোকেরা আলেকজাণ্ডারকে বিতাড়িত করার পর বারগুড়িয়ার নীলকুঠি হামলা করে দখল করলেন। এই নীলকুঠির এজেন্ট পাইরণ এবং মালিক মিঃ স্টর্ম আগাগোড়াই জমিদারদের পক্ষ হয়ে তিতুমীরদের সাথে চরম শত্রুতা করে আসছিলো এবং ইংরেজ সরকারকে তিতুমীরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে ফিরছিলো। বারগুড়িয়ার কুঠি দখল করার পর মীর সাহেবেরা নারকেলবাড়িয়ার নিকটেই গুগলীতে অবস্থিত স্টর্মের আর একটি কুঠি আক্রমণ ও দখল করে নিলেন। কুঠির কর্মচারীরা আত্মসমর্পন করলে, তাদের নিরাপদে ছেড়ে দিলেন। মীর সাহেবদের এই পদক্ষেপ-গুলো অত্যাচারী নীলকর কুটিয়ালদের বিরুদ্ধেই ছিল, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই তাঁরা এই পদক্ষেপগুলো নিলেন।

ওদিকে আবার খোদ হুজুরের হামলার আগেই, অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের হুকুমে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী এসে হামলা করার আগেই, হুজুরের আর এক নফর ছুটে এলেন

www.pathagar.com

তিতুমীরদের বিনাশ করতে। ইনি হলেন নদীয়া জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার তিতুমীরদের দমন করতে এসেছিলে তাঁর উপরওয়ালা বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে। কমিশনার সে জন্যে তাঁকে একদল মিলিশিয়াও দিয়েছিলেন। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছুটে এলেন নিজের উৎসাহেই। অর্থাৎ নীলকর ও জমিদারদের প্রতি তার প্রীতির আতিশয্যেই। লাওঘাটি নদীয়ার সীমান্ত এলাকা। লাওঘাটির ঘটনার পর বারগুড়িয়ার নীলকুঠির এজেন্ট পাইরণ, কুঠির মালিক স্টর্ম ও জমিদারদের উস্কানীতেই তিনি তিতুমীরদের উৎখাত করতে ছুটে এলেন। তাঁর পেছনে না রইলো উপরওয়ালার কোন নির্দেশ, না এলো উপর থেকে শক্তির কোন মদদ। তিনি এলেন তাঁর নিজের ও থানার শক্তি সাথে নীলকর ডেভিড এণ্ড্রুস ও জমিদারদের লোক লস্কর যুক্ত করে নিয়ে।

উপযাচক হয়ে নদীয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এই অভিযানের ফলে তিতুমীর সাহেবেরা তারো একবার গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, জেলা প্রশাসন তাঁদের দুশমনদের, অর্থাৎ জমিদার, নীলকর ও থানার দারোগাদের ষড়যন্ত্রের সাথে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের উস্কানীতেই আর এদের সাহায্যেই তার এলাকার অর্থাৎ নদীয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাদের দমন করতে ছুটে এলো। তাঁরা আরো বুঝলেন, আসলে সকল জেলা প্রশাসন সবসময়ই জমিদারদের বন্ধু, রায়তদের নয়।

সে যাই-ই হোক, নদীয়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পরিণতিও ঐ বারাসতের আলেকজাণ্ডারের মতোই হলো। বারগুড়িয়ার নিকটে তিতুমীর সাহেবদের পাল্টা হামলায় নদীয়া ম্যাজিস্ট্রেটের দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো। পরাজয়ের পর পরই কুঠিয়াল ডেভিড এণ্ড্রুসকে সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যান্য সবাইকে অসহায় ফেলে রেখে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছুটে এসে নৌকোতে চড়লেন এবং ইছামতী নদী পার হয়ে অপর পাড়ে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন। নদী পার হওয়ার কালে কুঠিয়াল এণ্ড্রুস নদীর মধ্যে থেকে গুলী ছুড়ে এপারে দণ্ডায়মান তিতুমীরের কয়েকজন সঙ্গীকে নিহত করার ফলে তিতুমীরের অপরাপর সঙ্গীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারী নাজিরকে ওখানেই ধরে কয়েক টুকরো করে ফেললেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ফেলে যাওয়া অন্যান্যদেরও তারা সাবাড় করতে পারতেন। কিন্তু ফেলে যাওয়া এসব অসহায় লোকদের অনুনয়ে আকুতিতে এবং আসল আসামী এণ্ড্রুস পালিয়ে যাওয়ার ফলে তা আর তাঁরা করলেন না। তিতুমীর সাহেব শুধু এ দেশীয় তাবেদারদের বললেন—যাদের তাবেদারী করেন তারা আপনাদের প্রতি কতটা দরদী এবার বুঝুন। নিজেরা বিপদ সীমার বাইরে যাওয়ার পর আপনাদের কি পরিণতি হবে তা একটুও ভাবলো না। তা ভাবলে, এভাবে গুলী ছুড়ে আমাদের কয়েকজনকে মেরে যেতে পারতো না।

এ ঘটনার পর সরকারের সেনাবাহিনীর একাদশ রেজিমেন্ট নিয়ে সেনাপতি মেজর স্কট বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পথনির্দেশনায় ঈসায়ী ১৮৩১ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে নারকেলবাড়িয়ায় এসে হাজির হলো। তিতুমীর সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বারগুড়িয়ার নিকটে নদীয়ার

www.pathagar.com

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ঠেকানো নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ফলে, নারকেলবাড়িয়ার আস্তানায় ফিরে এসে তাঁরা শ্বাস ফেলারও অবকাশ পেলেন না। তাঁরা এসে পুরোপুরি সুস্থির হয়ে না বসতেই ১৯শে নভেম্বর সকাল বেলা তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তাঁদের কেল্লা বা বাঁশের বেষ্টনীর চারদিকে সরকারের খাস মিলিটারী ফোর্স, অর্থাৎ পদাতিক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী দণ্ডায়মান। সংখ্যায় তারা বিপুল। সঙ্গে তাদের গোলাবারুদ, কামান বন্দুক ও যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্র।

তিতুমীর ও তাঁর শিষ্য মুরিদ সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা বিপুল বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, একি অবিচার আর একি বিপরীত আচরণ! নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা জমিদার ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে লাঠি ঠ্যাংগা নিয়ে লড়ছেন। বার বার চেষ্টা করেও বিচার তাঁরা পাচ্ছেন না। সহায়তা বা মধ্যস্থতা করার বদলে থানা আর জেলা প্রশাসনও ঐ অত্যাচারী জমিদার ও কুঠিয়ালদের সাথে যোগ দিয়ে গত ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর—এই চারদিন তাঁদের উপর সমানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দু' একটি কুঠি যা তাঁরা দখল করেছেন তা এই বলগাহীন অত্যাচারের মুখে কিছুটা লাগাম দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এদের অত্যাচার দিন দিন আকাশ চুম্বি হয়ে উঠছে। তবু সরকারের এদিকে নজর নেই, ঘটনা কি দেখা নেই, তাঁদের উপর জমিদার কুঠিয়াল-দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মিলিত নির্যাতনের প্রতিকার করা নেই, সরকার আরো উল্টা আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে খোদ যুদ্ধবাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে দিলো! নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে খোদ যুদ্ধ বাহিনী এসে কামান পেতে বসলো!

কয়েক মুহূর্ত এসব কথা ভাবতেই ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী প্রথমে বন্দুক ছুড়তে শুরু করলো। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা হকচকিয়ে গেলেন। কি করবেন, ভাবতে লাগলেন। তাঁদের অস্ত্র বলতে লাঠি-সোটা ও ইটপাটকেল। এ দিয়ে সর্ববিধ আগ্নেয়াস্ত্রধারী নিয়মিত সৈন্য বাহিনীকে পাল্টা হামলা করার কোনো যুক্তিই নেই। সকলেই তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, আত্মসমর্পণ করা হোক। আত্মসমর্পন করে তাঁদের অভিযোগ সরকারের কাছে পৌছানো হোক এবং তাঁরা যে আত্মসমর্পণ করতে চান, একথা এক্ষুণি জানানো হোক।

এই মর্মে কিছু লোক বাঁশের আবেষ্টনীর ফটকে এসে চীৎকার করে ও হাত নেড়ে তাঁদের আত্মসমর্পণের কথা ইংরেজ বাহিনীকে জানিয়ে দিতে লাগলেন।

কিন্তু ইতর শ্রেণীর দুশমনদের দুশমনী যে কতটা নোংরা হতে পারে, তার নজীর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। ইংরেজবাহিনীর বিদেশী অধিনায়ক তাঁর এদেশীয় তাবেদারদের জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা চীৎকার করছে কেন? হাত নেড়ে কি বলছে ওরা?

এদেশের নির্মম ঘাতকেরা সেনাপতিকে জানালো, ওরা দম্ভে আস্ফালন করছে আর অঙ্গুষ্টি দেখিয়ে বৃটিশ বাহিনীকে উপহাস করছে। বৃটিশ বাহিনীকে ওরা কিছুমাত্র পরোয়া করে না।

ইংরেজ সেনাপতি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—কি, এতবড় কথা!

অতপর সেনাপতি তাঁর বাহিনীকে হুকুম দিলেন—গুলী করো। সকলেই এক সাথে কামান দাগো আর গুলী করো—

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো কামান ও বন্দুক। শুরু হলো অগ্নিবর্ষণ। বাঁশের কেল্লার চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বেতমার গুলী ও কামানের গোলায় বাঁশের বেড়া ভেঙে চুড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিতুমীরের লোকেরা পালাও-পালাও রবে অনেকে পালিয়ে গেলেন আর বাদবাকী ঐ কেল্লার মধ্যে লাশ হয়ে পড়ে গেলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের যদেচ্ছা ব্যবহারের ফলে তামাম কিছু সমাপ্ত হতে ঘন্টা খানেকের অধিক সময় লাগলো না। এর মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন ৫০ জন, আহত হলেন ৩০ জন, ইংরেজ বাহিনী ধাওয়া করে কয়েদ করলো ২৫০ জনকে।

সঙ্গীন উঁচিয়ে নিয়ে ইংরেজ বাহিনী যখন ঐ বাঁশের কেল্লার মধ্যে ঢুকলো, তখন সবাই দেখলো, অন্যান্য লাশের পাশে তিতুমীর সাহেবও লাশ হয়ে পড়ে আছেন আর তাঁর পুত্র গওহর আলী আহত ও অর্ধচৈতন্য অবস্থায় পিতার পাশে বসে আছেন।

মৃতের সংখ্যা ঐ পঞ্চাশজনেই সীমাবদ্ধ রইলো না। পালিয়ে যাওয়ার সময় যেসব আহত ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে অন্যানেরা পালিয়ে গেলেন, তার মধ্যেও অনেকে ইন্তেকাল করলেন। বন্দীর সংখ্যাও ঐ ২৫০ জনই রইলো না। তৎপরেই গ্রামে গ্রামে হামলা করে আরো একশত লোককে কয়েদ করা হলো। এই ৩৫০ জনের ৩৩০ জনকে ইংরেজ সরকার বিচারের অপেক্ষায় কারাগারে আটক করে রাখলো। এরপরেও কয়েক মাস ধরে ঢোল সহরত দিয়ে ও পুরস্কার ঘোষণা করে আরো লোককে ধরা হলো।

এর সাথে তিতুমীর সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বিচারে ইংরেজ সরকার গোলাম মাসুমকে মৃত্যুদণ্ডে এবং ১১ জনকে যাবজ্জীবন ও ১২৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো।

যাঁরা ধরা পড়লেন এবং মীর সাহেবের অনুসারীরূপে শনাক্ত হলেন, তাঁরা এভাবে সাজাপ্রাপ্ত হলেন। ইংরেজ সরকার ধরতে যাদের পারলো না, তাঁরা অবশ্য বেঁচে গেলেন। তবে বেঁচে যাঁরা গেলেন, তাঁরা অধিকাংশই দূর এলাকার লোক। তাৎক্ষণিক ভাবে পালিয়ে গেলেও, তিতুমীর সাহেবের স্থানীয় অনুসারীদের খুব কম জনই দুশমনদের নজর এড়িয়ে রেহাই পেতে পারলেন।

ইয়ারপুরের বাহার খাঁ, নূরউদ্দীন, সোহরাব হোসেন ও অন্যান্য সকলেই কম বেশী আহত হলেও ঐ অবস্থায় তাঁরা কোনমতে দুশমনদের নজর এড়াতে সক্ষম হলেন। বাঁশের ঐ বিধস্ত বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে তাঁরা এসে এক অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন করলেন এবং রাত্রিকালে সেখান থেকে সরাসরি যশোহরের পথ ধরলেন।

সদররাস্তা এড়িয়ে বিকল্প পথে সারারাত ও পরের দিন প্রহর খানেক বেলাতক হেঁটে তারা যখন যশোহর জেলার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন পা আর কারো চলে না। ইংরেজদের বেপরোয়া গোলাবর্ষণে সকলেই অল্প বিস্তর আহত থাকায়, দূরের পাল্লা মারা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এর উপর আবার

www.pathagar.com

ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়না। পথের মাঝেই কেউ কেউ বসে পড়তে লাগলেন। তা দেখে বাহার খাঁ সাহেব তাড়া দিয়ে বললেন—না না, এমন হলে তো চলবে না। যত কষ্টই হোক, একটানা এগুতেই হবে আমাদের।

এঁদের মধ্যে বসিরউদ্দীনই সর্বাধিক কাহিল ছিল। তারই সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল। অল্প একটু এগিয়ে সে আবার বসে পড়লো এবং অসহায় কণ্ঠে বললো —আর পারিনে উস্তাদ। এখানে একটু বিরাম নিই।

বাহার খাঁ সাহেব শংকিত কণ্ঠে বললেন—সেকি! তুমি কি ক্ষেপেছো? এখনো আমরা বিপদ সীমানার খুবই কাছাকাছি রয়েছি। আমাদের জেলার এ সীমান্ত এলাকা থেকেও বেশ কিছু শিষ্য মুরিদ গিয়ে মীর সাহেবের দলভুক্ত হয়েছিলেন। বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকার সময়ই তো বুঝতে পারলে, মীর সাহেবের সহযোগীদের সন্ধানে ইংরেজ বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কখন যে এদিকেও এসে পড়বে ইংরেজ ফৌজ, আর কে যে সন্ধান দেবে আমাদের, তার কি ঠিক আছে? সন্দেহভাজন লোক দেখলেই তো অনেকের চোখ ফুটে উঠবে এখন।

ঃ সে তো ঠিকই উস্তাদ। কিন্তু বিশ্রাম না নিলে তো একটানা এভাবে বাড়ীতক—

ঃ আরো অনেকখানি এগুতে হবে। আমাদের এ জেলার আরো অনেকখানি ভেতরে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ী আছে। সেখানে গিয়ে না পৌছা পর্যন্ত বিরামের আর স্থান কোথাও নেই। সেরেফ একটু বসে থাকাই তো নয়, নাওয়া-খাওয়া নিদ-ঘুমের খুবই আমাদের প্রয়োজন। কমছে কম একটা দিন একটা রাত বিশ্রাম না নিলে, তুমি কেন, কেউই আমরা একটানা বাড়ীতে পৌছতে পারবো না।

ঃ তাহলে সে স্থানটা আর কতদূরে উস্তাদ?

ঃ তা আরো ছয় সাত ক্রোশের কমে নয়।

ঃ সর্বনাশ! আমি দাঁড়াতেই পারছিনে, আরো এতটা পথ হেঁটে যাবো কি করে?

সোহরাব হোসেন সাহস দিয়ে বললো—ঘাবড়াবেন না। আমরা যারা এখনো শক্ত আছি, তাদের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকুন। অপারগ হলে, আপনাকে আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাবো।

বাহার খাঁ সাহেব সায় দিয়ে বললেন—ঠিক-ঠিক। দরকার হলে তাই-ই করা হবে। এগুতে হবে তবুও। পথের মাঝে বিরাম কিছু নিতে হলে, এখানে নয়। আরো খানিক এগুনোর পর।

সেই মোতাবেক আবার সবাই হাঁটতে লাগলেন। অপেক্ষাকৃত নিরপদ এলাকার মধ্যে এসে বার দু'য়েক জিড়িয়ে নিলেন। জিড়িয়ে নিতে গিয়ে বরং গা-পা আরো খানিক ভারী করলেন। এরপর অনেক কষ্ট ও অনেক পেরেশানী ভোগ করতে করতে বাহার খাঁ সাহেবের সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে শেষ পর্যন্ত তাঁরা যখন পৌছলেন, তখন প্রত্যেকেরই অবস্থা অতি শোচনীয়। একেবারেই বিধ্বস্ত ও শ্রীহীন।

আত্মীয়টি খাঁ সাহেবের আপন ভায়রা ভাই। তাঁর বিবির আপন বড় বোনের স্বামী। শাদির পর কিছুতেই হাত এড়াতে না পেরে, বাহার খাঁ সাহেব একবারই এ

www.pathagar.com

বাড়ীতে এসেছেন। অনেক সাধাসাধি করা সত্ত্বেও আসবো আসবো করে খাঁ সাহেব তার পরে আর সময় করতে পারেননি। এরা অনেকবারই বাহার খাঁ সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে বেড়িয়ে এসেছেন, কিন্তু বাহার খাঁ সাহেব ঐ একবারের বেশী আর কখনো আসেননি। এ জন্যে এঁরা খুবই ক্ষুণ্ন ছিলেন। অবশেষে দ্বিতীয়বার এলেন যদি, এলেন এই বিপর্যস্ত অবস্থায়। সর্বাঙ্গে কাদামাটি, বেশবাস ছিন্নভিন্ন, দেহের অনেক স্থানে অনেকেরই কাটা ছেঁড়ার সুস্পষ্ট দাগ।

মাঠের মজুর মাফিক আট দশজন ধূলি ধূসর লোককে বাহির আঙ্গিনায় আসতে দেখে খাঁ সাহেবের ভায়রা ভাই আবদুস সালাম সাহেব ঘটনা কি জানার জন্যে এগিয়ে এলেন। এঁদের অগ্রভাগে বাহার খাঁ সাহেবকে আবিষ্কার করেই তিনি প্রথমে খুবই হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই হরষে-বিষাদে চীৎকার দিয়ে উঠলেন—আরে একি! ভাই সাহেব যে! খাঁ সাহেব যে! আপনি তাহলে এলেন? কিন্তু এমন অবস্থা কেন? হায়-হায়, একি মর্মান্তিক হালত। যেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরছেন!

বাহার খাঁ সাহেব কোনমতে বললেন—ঠিকই ধরেছেন ভাই সাহেব। লড়াইয়ের ময়দান থেকেই ফিরছি। বহুদূর থেকে আসছি। সব কথা এখন বলার সাধ্য নেই।

আবদুস সালাম সাহেবের চীৎকার শুনে বাড়ীর আরো অনেকেই ছুটে এলেন। তখনই খবর গেল অন্দরে। আবদুস সালামের বিবি সাহেবা, অর্থাৎ বাহার খাঁর বিবি সাহেবার বড়বোন ছুটে এসে দেউটিতে দাঁড়ালেন এবং খাঁ সাহেবদের অবস্থা দেখে এনতার হায় হায় করতে লাগলেন।

আবদুস সালাম সাহেব ধনাঢ্য লোক। অত্যন্ত অমায়িক ও অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি। বিষয় বিত্ত প্রচুর। চাকর কিষাণ অনেক। যে অবস্থাতেই হোক, এতদিন পরে বাহার খাঁ সাহেবকে নিজের বাড়ীতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই সম্মানিত মেহমানদের পরিচর্যায় তিনি এক পাল লোকজন নিয়োগ করলেন।

শুধু লোকজনই নয়, নিজেও তিনি দৌড় ঝাঁপ করে মেহমানদের খেদমতে লেগে গেলেন। প্রাথমিক পরিচর্যায় সকলকে সুস্থ করে তোলার পর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন আর শুনে কেবলই তাজ্জব বনে যেতে লাগলেন।

আবদুস সালাম সাহেবের উষ্ণ আতিথেয়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাওয়া-খাওয়া শেষ করে মেহমানগণ বিরামে চলে গেলেন আর শয্যা গ্রহণের সাথে সাথে গভীর নিদে অচেতন হয়ে গেলেন।

এক ঘুমে সারারাত কেটে গেল। ভোরের দিকে ডাকা হাঁকি করে সবাই একবার উঠলেন এবং ফজরের নামায আদায় করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবার তাঁদের ঘুম ভাঙলো নাস্তার ওয়াক্তের পর। ফজরের নামায আদায় করতে উঠে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের সর্বাঙ্গে ভয়ানক ব্যথা। হাত-পা আর গা গতরের কলকব্জা যেন সব অকেজো হয়ে গেছে। এই দ্বিতীয়বার ঘুম থেকে উঠার পর তাঁদের মনে হলো, ব্যথা অনেক কমেছে আর কলকব্জাগুলো কিছু কিছু সক্রীয় হয়ে উঠেছে।

নাস্তার আনষাম নিয়ে গৃহস্বামীরা এন্তেজারে ছিলেন। নাস্তায় এসে বসে দু'চার কথার পরই বিদায় নেয়ার মামুলী এক প্রস্তাব তুললেন বাহার খাঁ সাহেব। প্রস্তাব শুনে আবদুস সালাম সাহেব প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন এবং পরক্ষণেই রে-রে করে উঠে

www.pathagar.com

শক্ত কণ্ঠে বললেন এতদিন পরে আসার দরুন সৌজন্যের একটা মস্তবড় দিক আছে। দু'একদিনের মধ্যে বিদায় নেয়ার চিন্তা-ভাবনাই সামাজিকতা বিরোধী চিন্তা। সে দিকটা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু আপনাদের শারীরিক অবস্থা তো বুঝতে আমার বাকী নেই।

বাহার খাঁ সাহেব সলজ্জকণ্ঠে বললেন ভাই সাহেব! একই রকম শক্ত কণ্ঠে আবদুস সালাম সাহেব বললেন—আপনাদের ঘুম থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। লাশের মতো অচেতন হয়ে পড়ে ছিলেন সবাই। কপালে হাত দিয়ে দেখি, কারো কারো গায়ে আপনাদের তাপও উঠেছে চরম। সবারই গায়ে আঘাতের ছোট বড় দাগ। মোটকথা, লড়াইয়ের ধকলে সবাই বিকল হয়ে গেছেন।

ঃ তা কথা হলো—

ঃ আপনারা মুখে স্বীকার না করলেও আমি নিশ্চিত, এ ধকল মোটামুটি সামলে নিতেও প্রায় হপ্তা খানেক সময় দরকার।

ঃ কিন্তু—

ঃ লড়াইয়ের ময়দানে আরো ছয়মাস আটকে থাকলেও সইতো। নিরাপদ আশ্রয়ে এক হপ্তাও সয়না?

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ ওসব আল্‌গা শরম বাদ দিন। এক হপ্তার আগে আপনাদের ছুটি নেই।

এক হপ্তা না হলেও আধা হপ্তার আগে ছুটি তাঁরা পেলেন না। আবদুস সালাম সাহেবের হাত এড়াতে পারলেন না। অপরপক্ষে, তাঁদের দেহের চাহিদাও কম কিছু ছিল না। স্বচ্ছন্দে পথ চলার অবস্থায় ফিরে আসতে আর না হোক আরো দেড় দুই দিন সময় তাদের লাগতোই। অতিরিক্ত সময়টুকু তাঁরা কুটুম্বিতা করে কাটালেন।

বাহার খাঁ সাহেবের আত্মীয়ের মকানে এই খোশ হালে সময় কাটানোর এক ফাঁকে নূরউদ্দীন ও সোহরাব হোসেন নিরিবিলিতে বসে অতীতের পর্যালোচনা আর তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলো। সোহরাব হোসেন সখেদে বললো—লড়াইয়ের ময়দান থেকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে হলো, এই গ্লানী আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিনে দোস্ত!

জবাবে নূরউদ্দীন বললো—লড়াই কোথায়? একদিকে লাঠিশোটা আর এক দিকে কামান বন্দুক। একে কি লড়াই বলে? এতো এক তরফা হামলা। এতে গ্লানি কিসের?

ঃ দোস্ত!

ঃ লড়াই ছিল ঐ সীমান্তেরটা। তলোয়ারের মুখে তলোয়ার, বারুদের মুখে বারুদ। আগ্নেয়াস্ত্রের জবাব যদি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আপনি না দিতে পারেন, তাহলে আর তাকে লড়াই বলবো কি? বেরেলভী হুজুর লড়াই করার জন্যেই লড়াই করতে গিয়ে ছিলেন। সঙ্গে ছিল বারুদ বন্দুক সবই। সীমান্তের ঐ বেঈমানেরা বেইমানী না করলে কামিয়াবও হতেন তিনি। কিন্তু মীর সাহেব তো সেভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

ঃ হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো তাই।

www.pathagar.com

ঃ জমিদারদের হামলার বিরুদ্ধের প্রতিবাদ করা আর প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া, খাস ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ইরাদা মীর সাহেবের কোনদিনই ছিল না। ফকির মজনু শাহ সাহেব বা বেরেলভী হুজুরের মতো তাই কোন প্রস্তুতিও তার ছিল না। এ ছাড়া ফকিরদের লড়াইয়ের ঐ পদ্ধতিও তাঁর ছিল না। কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ইট ছুড়ে আর লাঠি ঘুরিয়ে কি ফায়দা আছে কিছু?

ঃ তা তো ঠিকই। কিন্তু লড়াই করে টিকে থাকার মতবাদ তো মীর সাহেবের মুখে জোরদারই ছিল। তবু কেন সেই মোতাবেক প্রস্তুতি তিনি রাখলেন না? সেই মোতাবেক প্রস্তুত না হয়ে—

ঃ আরে ভাই, লড়াই বলতে তো তিনি গোটা ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ভাবেননি। ইংরেজ রাজশক্তিকে তিনি প্রতিপক্ষও করেননি। আপনি সবই জানেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ঐ অত্যাচারী জমিদার আর নীলকর সাহেবেরা। অন্য কথায়, তার বৈরী পড়শীরা। এদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে না পারলে যে টিকে থাকা যাবে না, এই হিংসুটে পড়শীরা টিকে থাকতে দেবে না—তাঁর এই ধ্যানধারণায় ভুল কিছু নেই। অতি বাস্তব উপলব্ধি।

ঃ দোস্ত!

ঃ সে হিসেবে প্রস্তুতি যা প্রয়োজন তাতো ছিলই আর টিকেও তো গেলেন তিনি। জমিদার নীলকরদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়েই তো আমরা হারিনি। ও পক্ষের দু' চারটে গাদাবন্দুক আমাদের ইটপাটকেল আর লাঠিশোটার বিরুদ্ধে তেমন কার্যকরও হয়নি। কিন্তু অযাচিত আর এক তরফাভাবে যে ইংরেজ রাজশক্তি কামান বন্দুক নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর রাজা হয়ে ন্যায়-অন্যায় দেখবে না, একি কখনো ভাবা যায়?

সোহরাব হোসেন প্রতিবাদ করে বললো—কেন ভাবা যাবে না? ইংরেজেরা যে বরাবরই আমাদের দুশমন আর ওদের দোস্ত, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওদের গায়ে হাত দিলেই যে ইংরেজ রাজশক্তি তেড়ে আসবে আমাদের বিরুদ্ধে, একথা কেন ভাবছেন না?

নূরউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললো—এবার আপনি খুবই দামী কথা বলেছেন দোস্ত। অর্ধেক রেখে অর্ধেক ছেড়ে লড়াই হয় না। জিহাদ জিহাদই। যার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবো তার সাহায্যে যে শক্তিই এগিয়ে আসুক, সেই শক্তিকে মোকাবেলা করার তাকত জরুর থাকতে হবে। তা না থাকলে সে জিহাদকে জিহাদ বলা যাবে না। বড় জোর প্রতিবাদ বলা যেতে পারে।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। মীর সাহেবের ডাকে জিহাদের নামে লাঠি খেলায় নেমে কি বেইজ্জতই না হয়ে এলাম। অন্যদের মতো লাশ হয়ে যেতে পারলেও ভালছিল। এই গ্লানি হজম করতে হতো না। মীর সাহেব যে খামাখা কেন—

ঃ এই আবার ভুল করলেন ইয়ার। পড়শীদের কীলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে না তুলে নীরবে কীল খেয়ে যাওয়া তো কোন কাজের কথা নয়। ঐ কীল খেয়েই

www.pathagar.com

তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। সুতরাং পাল্টা কীল না হাঁকালে টিকতে আপনি পারবেন না।

ঃ তাহলে তো আবার ঐ কথাই হলো। ইংরেজ শক্তি তাহলে যে ধেয়ে আসবে তাদের পেছনে, সে ভাবনা তো এখানে কিছু থাকছে না!

ঃ সমস্যাটা তো এখানেই রে ভাই। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গেলে বর্তমানটাই থাকে না। ইংরেজ শক্তি আসার আগেই আপনি যদি নিঃশেষ হয়ে যান, তাহলে আর সে ভয় করার কি অর্থ আছে কিছু? বর্তমানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই না ভবিষ্যতের কথা। যার বর্তমানটাই নেই তার আবার ভবিষ্যৎ কি? নিজের সীমাবদ্ধতার কথা মীর সাহেব প্রথম দিনই বলেছিলেন। উনি বেসামরিক লোক। পূর্ণাঙ্গ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে মজনু শাহ বা বেরেলভী হুজুরের মতো বড় কিছু করার পরিকল্পনা আর সাধ্য তার ছিল না।

ঃ দোস্ত।

ঃ আমরা ফাটা বাঁশের চাপের মধ্যে পড়ে আছি। আমাদের বুকেও চাপ, পিঠেও চাপ। প্রতিবাদ না করেও উপায় নেই, প্রতিবাদ করলেও পরিণতি করুণ।

ঃ প্রতিবাদ নয় দোস্ত। এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলে পূর্ণাঙ্গ জিহাদের প্রয়োজন। বেরেলভী হুজুরের জিহাদ, ফকির মজনু শাহর জিহাদ। তাদের মতো আবার একক জিহাদও নয়। দেশব্যাপী সর্বগ্রাসী জিহাদ। দাউ দাউ করে চারদিকে দাবানল জ্বলে না উঠলে তো এস্পার বা ওস্পার একটা কিছু হয় না? এভাবে আর ধুঁকে ধুঁকে মরবো আমরা কতদিন?

নূরউদ্দীন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—নসীবে বরাদ্দ আছে যতদিন, ততোদিন। এর পরে হয়তো সুরাহা একটা হবেই।

ঃ সেই সুরাহাটা করবে কে আর হবে কবে? ইংরেজ সরকার তো দূরের কথা, এরপর ঐ জমিদার পাটনীদারদের বিরুদ্ধেই আর কথা বলার কেউ থাকবে না। ঈমানী চেতনা বলে দেশে আর তেমন কিছু নেই। সকলেই সুবিধেবাদী বার বার মার খেলে কি—

কথার মাঝেই নূরউদ্দীন ফের সজীব কণ্ঠে বললো—আবার ভুল হলো ইয়ার। কারবালা যতবারই আসুক, ইসলাম ইনশাআল্লাহ জিন্দা থাকবেই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ কথা বলার লোকের আবার ইতমধ্যেই সন্ধান পাওয়া গেছে। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আবার একজন ইতিমধ্যেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন।

ঃ কোথায়?

ঃ আমার নিজের জেলায়। নিজের জায়গায়। মাদারীপুরে। আপনার নানার বাড়ী ঐ নবীগঞ্জের পাশেই।

চমৎকৃত হয়ে সোহরাব হোসেন বললো—সেকি! কে তিনি?

ঃ তাঁর নাম হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাকেও বাধ্য হয়ে কোমর বাঁধতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

ঃ মানে ?

ঃ মানে ঐ একটাই! ফারায়েজী আন্দোলন নামের এক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনিও ইসলামের মৌলিক নীতিনির্দেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এমনইভাবে জমিদার আর নীলকরদের রোষানলে পড়েছেন।

ঃ বলেন কি! তাহলে তো যেতে হয় ওখানে। ঘটনা কি দেখতে হয়!

ঃ যাবেন ?

ঃ যাবো বৈকি ? শুধু যাবোই না, শক্ত জিহাদ শুরু হলে সে জিহাদে অংশ গ্রহণও করবো। এই পরাজয়ের গ্লানি আমি মুছে ফেলতে চাই। শহীদ হতে হলেও আল হামদুলিল্লাহ!

ঃ আচ্ছা!

ঃ তা ছাড়া, এখান থেকে গিয়ে আর যাবো কোথায় দোস্ত ? বাড়ীতে গিয়ে সুখ নেই। সাবিহা আরজুর ভরসা নেই। একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে আমাকে ?

ঃ সোবহান আল্লাহ! এ যে না চাইতে ঘোড়া নয়, বিলকুল হাতী।

ঃ মতলব ?

ঃ আমিও যে ঐ পথেরই পথিক। এ খবর ঐ নারকেলবাড়িয়ায় থাকতেই আমি পেয়েছি। এ নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করার মওকা পাইনি। খবরটা শোনার পর সেই মুহূর্তে তেমন কিছু ভাবিনি। কিন্তু এই পরাজয়ের পর থেকেই আমিও ঐ ভাবনাই জোরদারভাবে ভেবে যাচ্ছি। ভাবছি, রোকসানার অনিশ্চিত আশায় বসে বসে সময় কাটাবো কোথায় আর কতদিন ? তার চেয়ে ইয়ারপুরে ফিরে গিয়ে সবার কাছে বিদায় আদায় নিয়ে আমি এবার আমার নিজের এলাকাতেই যাবো। আমার ভগ্নিপতি ঐ জাইদুর রহমান জাহিদ সাহেবের মকানে গিয়ে উঠে হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের আন্দোলনের খবর করতে বেরুবো। আপনাকে সাথে পেলে তো আর কথাই নেই। একদম সোনায় সোহাগা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে সোহরাব হোসেন বললো—মারহাবা মারহাবা। চলুন দোস্ত, ইয়ারপুরে ফিরে যাওয়ার পরই তাহলে আপনাদের ঐ মাদারীপুরে যাই, চলুন। আমিও আমার নানাজানের বাড়ীতে গিয়ে উঠবো। এরপর আমরা দুজন এক সাথে সেই খবর করতে যাবো। পরিস্থিতি বুঝে যা হয় দুই জন তা এক সাথে করবো। রাজী ?

ঃ রাজী।

ঃ ঠিক বলছেন ?

ঃ বিলকুল। দ্বিমতের আর প্রশ্ন আছে কিছু ?

১৩

নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা যেদিন বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তার একদিন পরেই সোহরাব হোসেনের আব্বা মকবুল হোসেন সাহেব বিধ্বস্ত অবস্থায় ইয়ারপুরে এসে সাবিহা আরজুদের বাড়ীতে থপ করে বসে পড়লেন।

www.pathagar.com

সাবিহা আরজুর আব্বা আম্মা এ অবস্থায় তাঁকে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। সাবিহা আরজুর আব্বা সাবের আলী সাহেব ক্ষোভের সাথে বললেন—কি ব্যাপার? আপনাদের মতো বড়জাতের মানুষ হঠাৎ এই ছোট জাতের বাড়ীতে? কেউ দেখে ফেললে তো মান সম্মান অনেকখানি ক্ষুণ্ন হবে আপনার?

একথায় কিছু মাত্র কর্ণপাত না করে সোহরাব হোসেনের আব্বা মকবুল হোসেন সাহেব কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন আমাকে আপনারা মাফ করে দিন ভাই সাহেব। অতীতের তামাম ত্রুটি মাফ করে দিন। ত্রুটি কসুর মাফ করে দিয়ে আমার প্রতি আপনারা একটু সদয় হোন—এই আরজ নিয়ে আমি আজ আপনাদের কাছে এসেছি।

সাবিহা আরজুর আব্বা সাবের আলী সাহেব একথায় আরো অধিক বিস্মিত হলেন এবং বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—কি বলতে চান আপনি?

ঃ বলছি, আপনারা আমাকে খাসদীলে মাফ করে দিন। অতীতে যে আচরণ আমি বা আমরা আপনাদের প্রতি করেছি, অনুগ্রহ করে সবকিছু ক্ষমা করে দিন। আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। না বুঝে আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছি। আমার তামাম কসুর আপনারা রহমদীলে মাফ করে দিন। আর তা যদি একান্তই না পারেন, তাহলে আমার মাথায় মুগুর মারুন আপনারা। আমি কোন প্রতিবাদ করবো না। ঐ শাস্তিই এখন আমার প্রাপ্য।

ঃ এসব আপনি কি বলতে এসেছেন? এ আবার কোন চাল? আরো অধিক কাতরকণ্ঠে মকবুল হোসেন সাহেব বললেন—দোহাই ভাই সাহেব। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবেন না। নিতান্তই নিরুপায় হয়ে আমি আজ আপনাদের কাছে এসেছি। কোন চাল-চালাকী নিয়ে আমি আসিনি। এসেছি আপনাদের কাছে মাফ চাইতে আর আপনাদের অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে।

ঃ অনুগ্রহ ভিক্ষে! আপনি আমাদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষে করবেন, এসব কি বলছেন?

ঃ ভাই সাহেব, জাত্যাভিমান নিয়ে আমার পরিজনদের ফালতু দম্ভের দরুন যে ক্ষতি আমার হয়েছে আর যে জিল্লতি আমি ভোগ করছি, তার বোধ হয় আর তুলনা কিছু নেই। সুতরাং আর ধিক্কার না দিয়ে আপনারা আমাকে মাফ করে দিন আর আমার আরজটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনন।

সাবের আলী সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর খেদটাও কিছু খাটো হলো। তিনি এবার আগ্রহী হয়ে বললেন—আপনার আরজ! ব্যাপারটা কি বলুন তো!

ঃ আমার নিজের তেমন ত্রুটি কিছু ছিল না ভাই সহাবে। আমার ভাইদের মিথ্যা দম্ভের বিরুদ্ধে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারাটাই আমার একমাত্র ত্রুটি। আর এই ত্রুটিটুকুর এত বেশি খেসারত দিতে হচ্ছে আমাকে যে, তার আর হিসেব নিকেশ নেই।

ঃ অর্থাৎ?

www.pathagar.com

ঃ সবচেয়ে বড়ো খেসারত আমার সন্তান। আমার একমাত্র সন্তান সোহরাব হোসেন। তার আব্বা আপনাদের কাছে যে ওয়াদা করে রেখেছিলেন সেই ওয়াদার আমি মর্যাদা দিতে না পারায় আমার সেই একমাত্র সন্তানকেই আমি খোয়াতে বসেছি। আপনার মেয়ের সাথে তাকে আমরা শাদি দিতে রাজী না হওয়ায় সে আজ গৃহত্যাগী। দীর্ঘদিন সীমান্তের জিহাদে কাটিয়ে বেঁচে যদিও বা এলো, এসেই আবার আর এক জিহাদে জান কুরবান করার জন্যে চলে গেল। এবার যে সে বেঁচে আসবে, সে ভরসা খুবই কম। বেঁচে এলেও বাড়ীতে সে ফিরে আসবে—এমন আশা কিছুমাত্র নেই।

ঃ তা—মানে হচ্ছে—

ঃ চব্বিশ পরগণা জেলায় জনৈক তিতুমীর সাহেব জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁর জীবনমরণ লড়াই বেঁধেছে জমিদারদের সাথে। শুনতে পেলাম, সোহরাব হোসেন মনের দুঃখে শহীদ হওয়ার ইরাদা নিয়ে সেই জিহাদে শরিক হতে গেছে। এখন নাকি লড়াই হচ্ছে প্রতিদিন আর লোক মরছে বেশুমার। সে যে এখনো বেঁচে আছে এমন ধারণা করা কঠিন। বেঁচে যদি আল্লাহর রহমে থাকেও, আপনাদের দয়া না হলে কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না আর তাকে ফিরেও আমি পাবো না।

ঃ আমাদের দয়া মানে?

ঃ আপনাদের এখানে এলে আপনারা নাকি তাকে চরম কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের মেয়ের শাদি আপনারা তার সাথে কিছুতেই দিবেন না, একথা নাকি সাফ সাফ বলে দিয়েছেন। সেই দুঃখেই সে জিহাদে চলে গেছে আবার। এখন যদি আপনারা সদয় হয়ে সোহরাব হোসেনের সাথে আপনাদের মেয়ের শাদি দিতে রাজী হন, তাহলেই হয়তো ছেলেটাকে ফিরে পাবো আমি।

ঃ কি রকম? আমরা রাজী হলেই ফিরে পাবেন কি করে?

ঃ সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু তকলিফ করে আমার সাথে যেতে হবে। যেখানে সে আছে সেখানে আমরা দু' জন এক সাথে গিয়ে যদি একথা তাকে জানাই, তাহলে আর তার সংশয় কিছু থাকবে না। তখন তাকে ফিরিয়ে আনা সহজ হবে ইনশা-আল্লাহ।

সাবের আলী সাহেব এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তা হয়তো হবে। কিন্তু আপনার ছেলের সাথে আমাদের মেয়ের শাদি দিতে আমরা কেন রাজী হবো। আমাদের মেয়েকে আপনারা তো ঘরেই তুলবেন না।

ঃ না- না ভাই, সে ঘর আর নেই, সে বাধাও আর নেই। ঘরে তুলবে না বলে যারা দম্ভ করেছে এ যাবত, তারা এখন আমার ঘরের বাইরে। এই অল্পদিনের মধ্যে সে পরিস্থিতি একদম পাল্টে গেছে।

ঃ কি রকম—কি রকম?

ঃ তাদের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমাকে অসহায়ভাবে একা ফেলে রেখে তারা এখন সরে পড়েছে সবাই। বউদের পক্ষ নিয়ে নিজেরা নিজেরাই ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সব উলটপালট করে ফেলেছে। সবাই এখন পৃথক।

www.pathagar.com

ঃ আচ্ছা!

ঃ ছোট ভাই তার অংশ বেঁচে দিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে চলে গেছে।

অপর দুই ভাই তাদের অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক সংসার পেতেছে। তাদের অংশের ঘরদোর ভেঙে নিয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক জায়গায় ঘর তুলেছে তারা আর সেখানেই পার হয়ে গেছে। আমার সাথে তাদের আর কোন যোগাযোগই নেই। দেখাটা করতেও কেউ আসে না।

ঃ সে কি!

ঃ অবশ্য তাদের মধ্যেও আর কোনো মিল মুহব্বত নেই। কারো মুখ কেউ দেখে না। নিজেদের বউ বাচ্চা আর ঘর সংসার নিয়ে নিজেরাই তারা ব্যস্ত। তাদের কারো পক্ষ নেইনি বলে আমার উপরও সবার তাদের রাগ। আমার দিকে আর তাকায় কে?

ঃ তাজ্জব! আপনার তাহলে চলছে কি করে?

এবার কিছুটা কেঁদেই ফেললেন মকবুল হোসেন সাহেব। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন —চলছে না ভাই সাহেব, একদম চলছে না। ঘাটের মড়ার মতো আমার অংশে একা আমি পড়ে আছি আর ধুঁকে ধুঁকে মরছি। খবরটিও নেয়ার আর কেউ নেই।

ঃ কেন, হাজার হোক আপনি তাদের বড় ভাই। এ অবস্থায় কোন ভাইকি আপনার দায়িত্ব নেয়ার কথাটা—

ঃ বিনে লাভে কেউ তুলো বয়না ভাই, লোহা বইবে কে? আমার অংশটা তাদের কাউকে লিখে দিলে হয়তো আমার ঝামেলা কিছুটা বইতো তারা। কিন্তু আমার ছেলের হক আমি মারি কি করে, বলুন?

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ মাইনে করে চাকর চাকরানী রাখলাম, তাদের চালনা করার কেউ নেই দেখে তারাও কথা শোনে না। অসুখে-বিসুখে এক ফোটা পানির জন্যেও ডেকে তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। আসলে ফাঁকা ময়দান পেয়ে তারা আছে ফূর্তি মারার তালে আর যে যা পারে হাতিয়ে নেয়ার তালে। আমার দিকে তাকায় কখন?

ঃ সে কি! বড় করুণ অবস্থা তো।

মকবুল হোসেন সাহেব এবার হাতজোড় করে বললেন—আপনার মেয়েকে, মানে আরজু আম্মাকে আপনারা আমাকে দিন। আমার সবকিছুর মালিক তারাই এখন হবে। তাদের উপর কথা বলার কেউ আর এখন নেই। শিগ্‌গির শিগ্‌গির আসুন, সোহরাব হোসেনকে গিয়ে আমরা ফিরিয়ে আনি আর আরজু আম্মাকে নিয়ে গিয়ে সে তাদের সংসার তাড়াতাড়ি রক্ষে করুক।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ আমার এই শেষের কয়টা দিন আমি একটু শান্তিতে কাটাই। স্ত্রী বিয়োগের যে কি যন্ত্রণা, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ আর তা বুঝবে না। দয়া করে আরজু আমার মঞ্জুর করুন ভাই সাহেব।

সাবিহা আরজুর আব্বা আম্মার তামাম ক্ষোভ বিলুপ্ত হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তাদের দীলের পুঞ্জিভূত অভিমান। সাবের আলী সাহেব এবার প্রসন্নদীলে বললেন

www.pathagar.com

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরপর আর কোন আপত্তি নেই আমাদের। সাবিহা আরজুও সেই থেকে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। সোহরাব হোসেনকে ছাড়া আর কাউকেই সে শাদি করতে রাজী নয়। এ অবস্থায় এমনটি হলে তো পরম আনন্দ আমাদের।

আশান্বিত হয়ে উঠে মকবুল হোসেন সাহেব বললেন—জি!

সাবের আলী সাহেব বললেন—আপনি এখন দু'একদিন আমাদের এখানেই থাকুন। সোহরাব হোসেনকে ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা করা যায়, সেই চিন্তাই এখন আমরা বসে বসে করি।

ঃ সত্যি বলছেন ভাই সাহেব ?

ঃ সত্যি সত্যি, বিলকুল সত্যি। এই দিনটির আশাতেই যে বসে ছিলাম আমরাও ভাই সাহেব। মেয়ের জীবনের দিকে তাকিয়ে সোহরাব হোসেনকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার চিন্তা আমিই ইদানিং জোরদারভাবে করছি।

মকবুল হোসেন সাহেব পরমখোশে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন—আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালাই সকল প্রশংসার মালিক।

পথঘাট জেনে নিতে ও সঙ্গী সাথী যোগাড় করতে দু'তিন দিন গেল। ইয়ারপুর থেকে যারা তিতুমীরের সভাতে যোগ দিতে গিয়েছিল, তাদেরই দু'জনকে সঙ্গী করে নেয়া হলো। লোকজন নিয়ে সোহরাব হোসেনের আব্বা মকবুল হোসেন সাহেব ও সাবিহা আরজুর আব্বা সাবের আলী সাহেব অতপর সোহরাব হোসেনের তালাশে বেরিয়ে পড়লেন।

ইয়ারপুর থেকে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে আসার পর এক স্থানে তাঁরা দেখতে পেলেন, খানিকটা দূরে আট দশ জন লোকের একটা দল তাদেরই পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছুটা চেনা চেনা মনে হওয়ায় তাঁরা দ্রুত পদে এগিয়ে গেলেন এবং দলের কাছে এসেই উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। এটিই সোহরাব হোসেন, বাহার খাঁ ও অন্যান্যদের দল। সোহরাব হোসেন দলের সামনেই ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই তার আব্বা মকবুল হোসেন সাহেব উল্লাসে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন—আলহামদুলিল্লাহ! জিন্দা আছে, আমার বাপজান জিন্দাহালে ফিরে আসছে।

নিজের আব্বাকে অকস্মাৎ পথের মাঝে পেয়ে সোহরাব হোসেনও অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সাবিহা আরজুর আব্বাকে তাঁর সাথে দেখে সে তাজ্জবও হলো তদ্রুপ। ক্ষিপ্রগতিতে এসে এঁদের সাথে সালাম বিনিময় ও মোসাফেহা করতে করতেই সোহরাব হোসেন কুশলাকুশলের মোটামুটি দু'চার কথা জেনে নিলো। বাহার খাঁ সাহেব এদের সবাইকে চিনতেন। যারা চিনতো না তাদের সাথে সোহরাব হোসেন তার আব্বা ও অন্যান্যদের পরিচয় করিয়ে দিলো। এরপর সোহরাব হোসেন তার আব্বাকে প্রশ্ন করলো—এদিকে হঠাৎ কি জন্যে আব্বাজান ? কোথায় যাচ্ছেন ?

মকবুল হোসেন সাহেব সস্নেহে বললেন—তোমার খোঁজেই বেরিয়েছি বাপজান। তোমাকেই তালাশ করতে যাচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

সাবিহা আরজুর আব্বার প্রতি ইংগিত করে সোহরাব হোসেন ফের প্রশ্ন করলো —আর ইনি ?

জবাব দিলেন সাবিহা আরজুর আব্বা সাবের আলী সাহেবই। হাসি মুখে বললেন —আমিও বাপজান, আমিও।

একথা শুনে সোহরাব হোসেন সীমাহীন বিস্ময়ে সাবের আলী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এরই মাঝে বাহার খাঁ সাহেব সোহরাব হোসেনের আব্বাকে প্রশ্ন করলেন—সোহরাব হোসেনের তালাশে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা ? কোথায় যাবেন বলে বেরিয়েছেন ?

মকবুল হোসেন সাহেব বললেন—ঐ নারকেলবাড়িয়ায়। মানে, আপনারা যেখানে ছিলেন, সেখানেই আগে যাবো বলে বেরিয়েছি।

ঃ কি গজব! আল্লাহতায়ালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, পথে আপনাদের দেখা হলো আমাদের সাথে। নইলে তো ওখানে গিয়ে মহা মুসিবতে পড়তেন আপনারা। আর না হোক, ইংরেজদের কয়েদখানায় আটক থাকতেন দীর্ঘদিন।

মকবুল হোসেন সাহেব চমকে উঠে বললেন—সেকি!

বাহার খাঁ সাহেব সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনীর ঐ সর্বশেষ হামলা ও পরিণতির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললেন—ইংরেজ ফৌজের হাতে ধরা যারা পড়েছেন, তাদের পরিণাম কি হয়েছে বা হচ্ছে—তা আমরা এখনো জানতে না পারলেও আমি নিশ্চিত যে, কায়িক শাস্তির সাথে নির্ঘাত তাদের প্রাণদণ্ড ও কারাদণ্ড দেয়া হবে।

এ কথায় আগন্তুকেরা ভীত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—হায়-আল্লাহ!

আর দু' চার কথার পর সকলেই একত্রিত হয়ে আবার ইয়ারপুরের পথ ধরলেন। পথ চলতে চলতে সাবের আলী সাহেবের প্রতি পুনরায় ইংগিত করে সোহরাব হোসেন তার আব্বাকে প্রশ্ন করলো—তা আব্বাজান, ইনি—মানে এই খালু সাহেবও আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন মানে ? ইনিতো আমাদের সাথে আর কোন সম্পর্কই রাখতে চান না।

মকবুল হোসেন সাহেব হাসিমুখে বললেন—সে অবস্থা আর নেই বাপজান। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনেক কিছু পাল্টে গেছে।

কি রকম ?

মকবুল হোসেন সাহেব আগে তাঁর বাড়ীর ও তাঁর নিজের করুণ অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। এরপর তাঁর ইয়ারপুরে আসার কথা এবং সাবের আলী সাহেবদের মন কিভাবে আর কেন ঘুরে গেল, সেসব কথা বললেন। সবকিছু শোনার পর পিতার ঐ নিদারুণ অবস্থার দুঃখে এবং সাবিহাকে পাওয়ার পথে আর কোন বাধা না থাকার আনন্দে সোহরাব হোসেনের দুই চোখ চিক চিক করতে লাগলো।

মকবুল হোসেন সাহেব সব কথা সকলকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন আর তন্ময় হয়ে এসব কথা শুনতে শুনতে সবাই এসে এক সময় ইয়ারপুরে পৌঁছলেন।

গাঁয়ে এসে পৌঁছে সকলেই সকলের কাছে বিদায় নিলেন এবং এরপর নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

সোহরাব হোসেন ও তার আব্বাকে নিয়ে সাবের আলী সাহেবও তাঁর মকানের দিকে রওনা হতে উদ্যত হলেন। এই সময় নূরউদ্দীন সোহরাব হোসেনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললো—আপনারা সুখী হন দোস্ত। আল্লাহতায়ালা আপনাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় করুন। কিন্তু আমি যে একা, আবার সেই একাই পড়ে গেলাম। হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের কার্যক্রমের খোঁজে এবার একাই বেরুতে হবে আমাকে আর যা সিদ্ধান্ত তা একাই আমাকে নিতে হবে।

নূরউদ্দীন ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো। সোহরাব হোসেন উৎসাহ দিয়ে বললো —আরে না- না, একা হবেন কেন? অল্প দিনের মধ্যেই আমিও আপনার কাছে চলে আসবো। হাজী সাহেবের কার্যক্রমে শরিক হওয়া-না-হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ চাহেতো আমরা এক সাথে নেবো।

নূরউদ্দীন ম্লান হেসে বললো—তা আর কি করে হবে দোস্ত? আপনার আব্বার কথা সবই তো শুনলাম। এরপর আর কি করে তা হয়?

ঃ কেন হবে না? এই মুহূর্তে আমি আপনার সাথে যেতে পারছিনে এই যা আফসোস। শুনলেনই তো, আমার আব্বাজান বর্তমানে কি করুণ হালে আছেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। পিতার এই নিদারুণ দুর্দিনে তাঁর প্রতি আমার তো একটা কর্তব্য আছে মস্তবড়। আপনি মাদারীপুরে চলে যান। আমি আগামীকালই আব্বাকে নিয়ে আমার বাড়ীতে চলে যাবো। সেখানকার বিশৃঙ্খলা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেয়ার পর, শাদি বলুন আর যা-ই বলুন, সাবিহা আরজুকে জলদি জলদি সেখানে নিয়ে যাবো। আব্বাজানের খেদমতে সাবিহাকে নিয়োগ করে দিতে পারলেই ব্যস্, আমি খালাস।

ঃ দোস্ত।

ঃ সবকিছু সারতে বড়জোর দেড়-দু' হপ্তা লাগবে। এরপরেই ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে পাশে পাবেন।

আবার একটু ক্লীষ্টহাসি হেসে নূরউদ্দীন বললো—পাশে পেলেও তো আপনাকে আমি সাথে নেবো না ইয়ার। সদ্য শাদি করা বিবিকে বিরাণ করে ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবার দেশান্তরী হবেন, এটা হতে দেবো কেন?

ঃ সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরী হবো কেন? সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখে আবার বিবির কাছে ফিরে আসবো। সিদ্ধান্ত না-বাচক হলে তো কথাই নেই। হাঁ-বাচক হলেও হাজী সাহেবের কার্যক্রম মামুলী আর প্রাথমিক অবস্থায় থাকলে, আমরা পরে গিয়ে শরিক হবো। এ সময়টা বিবিকে সঙ্গ দিয়ে কাটাবো।

ঃ আচ্ছা।

ঃ কিন্তু মার মার কাট কাট অবস্থা হলেও নয়া বিবি বলে বিবির আঁচল ধরে বসে থাকবো, সে জিহাদে আমি যাবো না, একি কোন কথা হলো?

ঃ সাব্বাস! এই তো চাই।

ঃ দোস্ত!

www.pathagar.com

নূরউদ্দীন এবার হৃষ্টচিত্তে বললো—যতদূর শুনেছি, হাজী সাহেবের কার্যক্রম আদৌ এখনও চরম পর্যায়ে উঠেনি। প্রাথমিক স্তরেই আছে। সময় চাইলে আপনি অনেক সময় পাবেন।

ঃ মারহাবা! তাহলে আর কথা কি!

সোহরাব হোসেনসহ তার আব্বারাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রইলেন শুধু বাহার খাঁ সাহেব ও নূরউদ্দীন। নূরউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে বাহার খাঁ সাহেব অতপর বাড়ীতে ফিরে এলেন।

জিন্দাহালে আর সহিসালামতে তাঁরা দু'জন ফিরে এসেছেন দেখেই খাঁ সাহেবের বাড়ীতে আনন্দের ঢল নামলো। সকলের বুক থেকে দুশ্চিন্তার পাথর সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। লড়াই-ফেরত ও পথশ্রান্ত এই ব্যক্তিদ্বয়ের খেদমতে বাড়ীর সবাই মন প্রাণ ঢেলে দিলেন।

রোকসানা ফিরদৌসের মৃতপ্রায় দেহে আবার প্রাণের বন্যা ছুটলো। আনন্দে খুশীতে মুক্তপ্রাণ কিশোরীর মতো সে বাড়ীর সর্বত্র ছুটে বেড়াতে লাগলো। মন সে স্থির করে ফেলেছে। আর সে শূন্যের উপর ঝুলবে না। সময় আর হাতছাড়া করবে না। তার ভাবীর মারফত এবার সে নূরউদ্দীনের কাছে সরাসরি প্রস্তাব পাঠাবে শাদির। নূরউদ্দীনকে সম্মত করার যথাসম্ভব চেষ্টা ভাবীবে দিয়ে করাবে। এস্পার ওস্পার—যা হয় একটা কিছু করেই সে ছাড়বে এবার। তার প্রতি নূরউদ্দীনের দুর্বলতা নারকেল-বাড়িয়ায় রওনা হওয়ার দিন আরো ভাল করে টের পেয়েছে রোকসানা। নূরউদ্দীন এ প্রস্তাব সাগ্রহেই গ্রহণ করবে—এ ব্যাপারে রোসকানা যথেষ্ট আশাবাদী। এ আশাতেই তার খুশীর মাত্রা আরো অধিক বেড়ে গেছে।

হায়রে আশা ছলনাময়ী। মাঝে একদিন কেটে গেল। এর পরেরদিনই রোকসানার দেদীপ্যমান আশার আলো দপ করে নিভে গেল। পাঠাই পাঠাই করতে করতে সে না পারলো তার ভাবীকে নূরউদ্দীনের কাছে পাঠাতে, না পারলো সে নিজে নূরউদ্দীনকে কোন কথা বলতে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সে শুনলো, নূরউদ্দীন তার নিজের বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে। আজই আর এই সকালেই। আর সে ইয়ারপুরে আসবে না। কালে ভদ্রে এলেও, তা ঐ কালে ভদ্রেই। কবে আর কোন বছর, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

নূরউদ্দীন এ সিদ্ধান্ত গত রাতেই নিয়েছে। বাহার খাঁ সাহেবের সাথে বসে অনেক খানি রাতের বেলা এ সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। রাতের আহারের পর নিরিবিলিতে বসে গল্প আলাপ করার কালে নূরউদ্দীন বিদায় নেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, বাহার খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ তাতে উষ্ণ সমর্থন দিয়েছেন। বলেছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ীর দিকে তোমার একবার যাওয়া খুবই প্রয়োজন। ছয় সাতটা বছর গত হয়ে গেল, এর মধ্যে একবারও তুমি ওদিকে যাওনি। এভাবে আর ভেসে বেড়াবে কতদিন? ঘর সংসারের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে তো কারো চিরদিন চলে না। ওদিকটাও ঠিক রাখা দরকার।

নূরউদ্দীন বলেছেন—জি, সে একটা প্রশ্ন তো আছেই। তা ছাড়া, এখন তো এখানে করার কিছু নেই। এভাবে শুধু শুধু বসে থাকি কতদিন?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। এই ফাঁকে গিয়ে একবার ঘুরে এসো। ঘর সংসারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার একটা কূলকিনারা করে এসো।

নূরউদ্দীন ম্লান কণ্ঠে বলেছে—এদিকে আসার তেমন প্রয়োজন তো আর দেখিনে। আবার ফিরে আসার ব্যাপারটা—

খাঁ সাহেব চমকে উঠে বলেছেন—সেকি! আর তুমি আসতে চাও না?

ঃ আসতে তো ইচ্ছে হয় বড়ই। কিন্তু আসার তো উপলক্ষ কিছু থাকা চাই। সেরেফ বেড়াতে আসার জন্যে আসার তো নিশ্চয়তা নেই কিছু।

ঃ না- না, তা বললে হবে না। অল্প দিনেই আবার তুমি ফিরে আসবে। আসতেই হবে এই হলো আমার কথা।

ঃ উস্তাদ।

ঃ তোমার সাথে আমার একটা মস্তবড় আলাপ আছে। গুরুত্বপূর্ণ আলাপ। কিন্তু প্রসঙ্গটা এই মূহূর্তে তুলতে আমি চাচ্ছিনে। পর পর দুই দুইটে পরাজয়ের গ্লানিতে মন তোমার অস্থির আছে এখন। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে ফিরে এসো। তাজা মনে বসে বসে সে আলাপ করবো তখন।

নূরউদ্দীন তবুও ইতস্তত করে বলেছে—এখন কি তার কোন আভাস দেয়া যায় না উস্তাদ?

এ প্রশ্নে বাহার খাঁ সাহেব থেমে গেছেন। কিছুক্ষণ দম ধরে বসে থাকার পর বলেছেন—ঠিক আছে। আমি আর একটু ভেবে চিন্তে দেখি, কাল যাওয়ার আগে সে আভাস তোমাকে দেয়া যায় কিনা।

বাহার খাঁ সাহেবের আলাপটা রোকসানাকে নিয়েই। রোকসানার শাদির প্রস্তাব নূরউদ্দীনের কাছে সরাসরি দিয়ে বসলে, ফলটা কি আসে—এই প্রসঙ্গ নিয়েই। কিন্তু নূরউদ্দীনও সরাসরি না করে বসে যদি, এই ভয়েই বাহার খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ কথা বলার সাহস পাননি। আরো একটু ভেবে দেখতে চেয়েছেন।

ভোর বেলাতেই বাহার খাঁ সাহেব নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবের মকানে ছুটে গেলেন। নিয়ামতুল্লাহ শাহ সাহেবের লোক এসেই ডেকে নিয়ে গেল তাঁকে। নূরউদ্দীনের সেই ফুফাতো ভগ্নিপতি জাইদুর রহমান জাহিদ গত রাতে শাহ সাহেবের মকানে এসে হাজির হয়েছেন। নূরউদ্দীনের আব্বার অনুরোধে নূরউদ্দীনকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন তিনি। তদুপরি, বাহার খাঁ সাহেবের সাথে তিনি কিছু কথা বলতে চান। শাহ সাহেবের মকানেই আলাপটা করতে তিনি আগ্রহী। একথা শুনেই বাহার খাঁ সাহেব দৌড় দিয়েছেন শাহ সাহেবের বাড়ীর দিকে।

ঘুম থেকে উঠেই নূরউদ্দীন বিদায়ের জন্যে তৈরি হতে লাগলো। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে থলেয় তুলতে লাগলো। নাস্তার পরেই বিদায় নেবে সে। বিদায়ের আগে বাহার খাঁ সাহেব সেই আভাসটা দেবেন কিনা, দিলে কিসের আভাস দেবেন—এ চিন্তায় বুক তার দুরু দুরু করতে লাগলো।

ঘুম থেকে উঠার পর সকাল বেলা এ খবর শুনেই আছড়ে পড়লো রোকসানা। সে উন্মাদিনী হয়ে গেল। আর সময় নেই। কোন কূলকিনারা না দেখে সে দৌড়ে এসে

www.pathagar.com

তার ভাবীকে আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরলো। নূরউদ্দীনের কাছে তার শাদির কথাটা ভাবী এবার সরাসরি তুলুক, এই শেষ চেষ্টাটা করুক, এ জন্যে সে মাথা কুটতে লাগলো।

ভাবী রাবিয়া বেগম তখন নূরউদ্দীনের নাস্তা তৈরী করছিলো। রোকসানার আবেদনটা যুক্তিহীন নয়, এ চেষ্টা তার অবশ্যই করা উচিত এবার—ভাবী এটা বুঝলো। নাস্তার পরেই একথা সে তুলবে বলে রোকসানাকে আশ্বাস দিলো।

নাস্তার পর্ব শেষ হলো। নাস্তার পরে কাপড় চোপড়েরর থলেটা প্রস্তুত করে রেখে নূরউদ্দীন এসে বৈঠকখানার বাহির বারান্দায় বসলো। বাহার খাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। সকালে এক লোকের সাথে বাহার খাঁ সাহেব বেরিয়ে গেছেন এই পর্যন্তই খবর আছে। কোথায় গেছেন, বাড়ীর কেউ তা জানে না।

নূরউদ্দীন চুপচাপ বসে রইলো। বিদায়ের আগে রোকসানাকে এক নজর দেখার বড়ই ইচ্ছে হলো। সেই ইরাদায় সে এসে বৈঠকখানার দরজার খানিকটা কাছাকাছি বসলো। রোকসানা এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ায় কিনা, দু' একটা কথা যাবার আগে বলে কিনা—এই আশায় সে উন্মুখ হয়ে রইলো।

একটু পরেই নূরউদ্দীন সচকিত হয়ে উঠলো। বৈঠকখানার মধ্যে সে একাধিক পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। দরজার পাল্লা একটুখানি ভেজিয়া দেয়া ছিল। পায়ের আওয়াজ সেখানে এসে থেমে গেল। ভেজানো পাল্লা আরো একটু ভেজিয়ে দেয়ার শব্দ হলো। নূরউদ্দীন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার আড়ালে এসে রাবিয়া বেগম দাঁড়ালো। রোকসানা ফিরদৌসও তার পেছনে এসে দাঁড়ালো। দরজার আড়াল থেকে কথা বললো রাবিয়া বেগম। গলা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললো—ভাই সাহেব, আমার একটা কথা ছিল।

রোকসানা নয়, তার ভাবী রাবিয়া বেগমের কণ্ঠ। নূরউদ্দীন থতমত করে বললো —জি আমাকে বলছেন?

রাবিয়া বেগম বললো—হ্যাঁ ভাই সাহেব। নিতান্তই প্রয়োজনে আপনার সাথে একটা জরুরী আলাপ করতে এসেছি।

ঃ জরুরী আলাপ!

ঃ হ্যাঁ। আপনি এখন কথাটা কিভাবে নেন আর এতে কি মনে করেন—এই ভেবেই সংকোচ বোধ করছি।

ঃ না- না, মনে করার কি আছে? বলুন—

ঃ কথাটা হলো, আপনি আপনার শাদির ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

নূরউদ্দীনের অন্তর শিহরিত হয়ে উঠলো। নিজেকে সে সামলে নিয়ে বললো —কি সিদ্ধান্ত মানে?

ঃ মানে, আপনি নাকি কোন এক মেয়েকে পছন্দ করে রেখেছেন আর সে মেয়ের মতিগতি নাকি অন্যরকম। আপনি কি আপনার সে মত পরিবর্তন করতে পারেন না?

ঃ ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।

www.pathagar.com

ঃ বলছি, ঐ মেয়ে ছাড়া আপনি কি আর অন্য কোন মেয়েকেই শাদি করতে রাজি নন?

নূরউদ্দীন দমে গেল। বিষণ্নকণ্ঠে বললো—একথা বলছেন কেন ভাবী সাহেবা?

ঃ কারণ, আপনি রাজী থাকলে একটা অন্য মেয়ের সাথে আপনার শাদির প্রস্তাব দিতাম।

নূরউদ্দীন আবার পলকখানেক চুপ করে রইলো। পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো—না ভাবী, তা আর সম্ভব নয়।

ঃ কেন নয়? ঐ মেয়ের মধ্যে আপনি কি এমন পেলেন যে, তাকে ছাড়া আর কারো কথাই ভাবতে আপনি পারেন না?

ঃ সে অনেক কথা ভাবী।

ঃ অনেক কথা কি কথা?

ঃ কথা মানে, ঐ মেয়ের জন্যেই আমি আমার এই জীবনটা শেষ করে দিয়েছি। ঐ মেয়ের জন্যে আমি আজ এই ছন্নছাড়া। তার চিন্তাতেই দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিলাম ভাবী, এখন আর অন্য চিন্তা নাই বা করলাম।

ঃ কিন্তু সে মেয়ে যদি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে বসে?

আরো অধিক ম্লানকণ্ঠে নূরউদ্দীন বললো প্রত্যাখ্যান নতুন করে করবে কি ভাবী! প্রত্যাখ্যান তো করেই রেখেছে আগে থেকেই। যতদূর জানি, আমাকে বা আর অন্য কাউকে নিয়েই সে ঘর করতে রাজী নয়। তার কোন্ এক পছন্দের জন আছে। সে আছে তারই আশায়। তবু তার শেষ সিদ্ধান্ত কি হয়, তা দেখার জন্যে অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

ঃ তবু তার অপেক্ষা করবেন আপনি? তার ধ্যানেই থাকবেন?

নূরউদ্দীন কাতর কণ্ঠে বললো—না থেকে করবো কি ভাবী সাহেবা? তার ধ্যানে আছি বলেই তো আমাকে এই ইয়ারপুরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তারই জন্যে এই ইয়ারপুরে এসে আমি পড়ে রয়েছি। প্রথম দিকে অনেক তালাশ করেও তাকে আমি পাইনি। তাই মনোবেদনায় অস্থির হয়ে মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে তাকে আমি ডেকেছি।

ঃ এই ইয়ারপুরে তালাশ করেছেন?

ঃ জি। সে যে এই ইয়ারপুরেরই মেয়ে। সে খবর জেনেই তো এখানে এসে খুঁজেছি। শেষ অবধি দেখলাম, আমার জানাটা ভুল নয়। এই ইয়ারপুরেই তার বাড়ী আর এই ইয়ারপুরেই সাক্ষ্যাত পেলাম তার।

ঃ সেকি! এই ইয়ারপুরেই সাক্ষ্যাত পেলেন?

ঃ জি। সাক্ষ্যাতটা পেলাম বটে, কিন্তু সেই সাক্ষ্যাত পাওয়াটুকুই সার হলো আমার। জানলাম, তার কোন এক গোপন জন আছে আর তাকেই সে মন দিয়ে বসে আছে।

রাবিয়া বেগম চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো—কি আশ্চর্য কথা! এই ইয়ারপুরেরই মেয়ে? কার মেয়ে? কোন্ বাড়ী তাদের?

www.pathagar.com

ঃ না ভাবী, সেটা বলা যাবে না।

ঃ কেন বলা যাবে না ?

ঃ আমাকে যে চায়না, আমি তার অপেক্ষায় আছি—এটা ফাঁশ হয়ে গেলে আমি মুখ দেখাবো কি করে ?

ঃ আমাকেও বলা যাবে না ?

ঃ ওরে বাপরে। মোটেই তা সম্ভব নয়।

ঃ সম্ভব নয়। আমি কি গিয়ে বলে দেবো তাদের ?

ঃ সে যাই হোক, কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

রাবিয়া বেগম না খোশ হলো। নাখোশ কণ্ঠে বললো—কি আজব কথা বলছেন! আমাকেও বিশ্বাস আপনি করেন না ? এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপনি। মুখ দেখানোর প্রশ্নই সে ক্ষেত্রে থাকছে না। তবুও আমাকে বলতে আপনার দ্বিধা ?

নূরউদ্দীন অসহায়কণ্ঠে বললো—ভাবী।

ঃ আপনাকে আমি ভাইয়ের মতো ভালবাসতাম। অথচ আপনি আমাকে এই সামান্য খবরটাও জানাতে অনিচ্ছুক! এতদিন এখানে থাকলেন, তবু আমাদের প্রতি কিছুমাত্র দরদ বা বিশ্বাস দীলে আপনার জন্মালো না ? আপনার এতটুকু শুভাকাঙ্খীও ভাবতে আমাদের পারলেন না ?

নূরউদ্দীন ফাঁপড়ে পড়ে গেল। আবার সে নিঃশ্বাস ফেলে বললো—বলতে তো আমার খুবই ইচ্ছে হয় ভাবী। এত ইচ্ছে হয় যে, চীৎকার করে বলি। কিন্তু—

ঃ কিন্তু ?

ঃ বললে যে আপনারাই আমাকে খারাপ চোখে দেখবেন, এই ভয়েই বলতে আমি পারছিনে।

রাবিয়া বেগম চমকে উঠে বললো—মানে ? মন শক্ত করে নূরউদ্দীন বললো—ঠিক আছে। চলেই যখন যাচ্ছি, বলেই যাই কথাটা। লুকিয়ে রেখে যেয়েও তো স্বস্তি কিছু পাবো না। তবে উস্তাদজীর কানে যেন কথাটা না যায়।

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ একথায় আপনারা নারাজ হবেন জরুর। আমার চরিত্রের উপর ঘৃণা জন্মাবে আপনাদের। আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন। তবু ঐ যে বললেন, আপনি আমাকে ভাইয়ের মতো ভালবাসেন ? সেই সুবাদে আমার তামাম কসুর মাফ করে দেবেন।

শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় রাবিয়া বেগম বললো—সেকি! একি বলছেন ? কে সে মেয়ে ? শিগ্‌গির বলুন, সে মেয়েটা কে ?

ঃ সে মেয়ে আপনাদেরই রোকসানা।

ঃ কি বললেন ?

ঃ আপনাদেরই রোকসানা ফিরদৌস।

www.pathagar.com

অপরিসীম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে রাবিয়া বেগম চীৎকার দিয়ে বললো —হায় আল্লাহ। এই ঘটনা ? এই ব্যাপার ? ওরে ভাই, রোকসানারও সেই গোপনজন তো আপনিই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ
শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম ঃ
ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ
গুলপট্টি, পোঃ+জেলা—নাটোর, ফোন—২৯০।

শিক্ষা ঃ
ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন। অতঃপর–আই. এ.; বি. এ. (অনার্স); এম. এ. (ইতিহাস); এম. এ. (ইংরেজী); বি. এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড্ (লণ্ডন)।

কর্মজীবন ঃ
প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ ঃ
প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাটকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য ঃ

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)
১। বখতিয়ারের তলোয়ার—প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ—প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়—প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক—প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ—প্রকাশিত
৬। রাজ বিহঙ্গ—প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী—প্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা—প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর—প্রকাশিত
১০। সূর্যাস্ত—প্রকাশিত
১১। পথহারা পাখী—প্রকাশিত
১২। বৈরী বসতি—প্রকাশিত
১৩। অন্তরে প্রান্তরে—যন্ত্রস্থ

উপন্যাস (সামাজিক)
১। শীত বসন্তের গীত—প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা—প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

নাটক
১। গাজী মজলের দল—প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ—প্রকাশিত
৩। বনমানুষের বাসা—প্রকাশিত
৪। রূপনগরের বন্দী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৫। ছবি—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

রম্য রচনা
১। ঘাসকাটা গল্প—প্রকাশিত
২। চার চাষের কেচ্ছা—যন্ত্রস্থ

রূপকথা
১। সুলতানার দেহরক্ষী—প্রকাশিত

কবিতা
১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)

www.pathagar.com